বাংলাদে ' স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে বিদ্যাসাগরের অবদান

বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে বিদ্যাসাগরের অবদান

ড. বেবী দত্ত

একসাথে
কলকাতা-৭০০ ০১৬
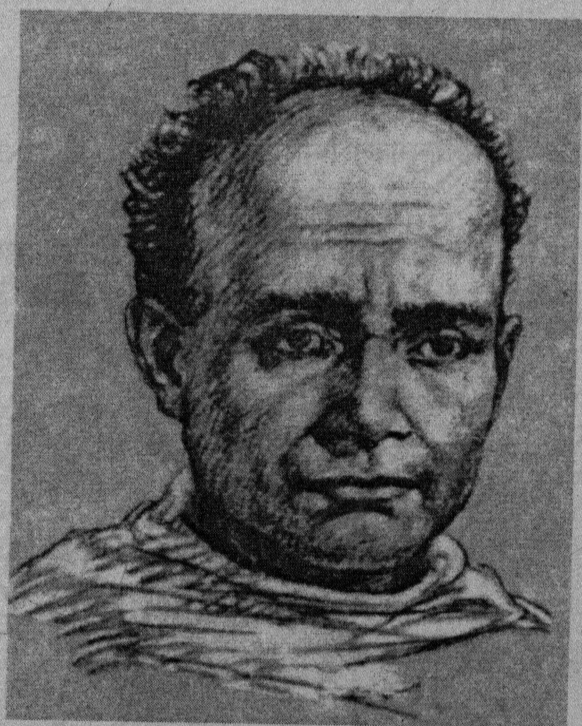
জন্ম-১৮২০ মৃত্যু-১৮৯১

উৎসর্গ :

স্বাধীনচেতা-চির প্রতিবাদিনী-শিক্ষানুরাগিনী "মাকে"।

মা গো,

আজ তুমি কোথায় জানি না—বইটা তুমি ছাপার হরফে দেখে যেতে পারলে না এই আফসোস থাকবে আমার সারা জীবন।

ভূমিকা

"……ধন্যরে দেশাচার! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগের দুর্ভেদ্য দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া কি একাধিপত্য করিতেছিস! … হা ধর্ম! তোমার মর্ম বুঝা ভার! কিসে তোমার রক্ষা হয়, আর কিসে তোমার লোপ হয়, তা তুমিই জান …. হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।" — ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

এভাবেই মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজের গায়ে তীব্র কশাঘাত করেছিলেন আর নিপীড়িত বঞ্চিত নারী সমাজেব প্রতি গভীর দরদে বিগলিত হয়েছিলেন, নব জাগরণের অন্যতম পুরোধা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ঊনবিংশ শতাব্দীর পরাধীন ভারতের নবজাগরণের ইতিহাস এগিয়ে এসেছে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের হাত ধরে। তদানীন্তন অবিভক্ত বাঙলা ছিল তার পুরোভাগে। এখানে নবজাগরণের পথিকৃৎ রামমোহন রায়ের 'আত্মীয় সভা'য় (১৮১৫ সাল) তৈরি হয়েছিল বাঙলার রিফরমেশনের কর্মসূচী, যার মধ্যে ছিল সর্বক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় 'ট্র্যাডিশান' ভেঙ্গে এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত। সমাজ সংস্কারের যে প্রথম সূচনা হয়েছিল রামমোহনের যুগে তার বিস্তৃত প্রসার ও পরিণতি লাভ করেছিল বিদ্যাসাগর-ডিরোজিও'ব সময়ে। এই সমাজ সংস্কারেব একটি প্রধান বিষয ছিল নারী সমাজের প্রতি অমানুষিক অন্যায অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। যার সূচনা হয় সতীদাহর মতো অমানুষিক বর্ব্বর প্রথার অবসানের মধ্য দিয়ে।

সে যুগে সমাজ সংস্কারকরা নারীদের সমস্যাটিকে দেখে ছিলেন নবজাগরণের আলোয় মানবিক ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে। তাই শুধু সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথাগুলির বিরুদ্ধে বা বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করার মতো প্রগতিশীল আইনকানুন প্রবর্তন করাব মধ্যেই তাঁদের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল না। নারী যাতে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বিকাশের সুযোগ-সুবিধা পায়, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মানুষ হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে সেদিকেও দৃষ্টি দিয়েছিলেন। আর যুগ যুগ ধরে সামাজিক অন্যায় অত্যাচার নিপীড়নের শিকার নারীদের চেতনা বিকাশের প্রাথমিক শর্তই হলো তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার। তাই এই দিকটিকেই বিদ্যাসাগর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কখনও ইংরেজ সরকারের সহযোগিতায়, কখনও বা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর একান্ত সাধনার কাজটি করে গেছেন। আজকের দিনে যখন পশ্চিমবাংলায় নারীদের সাক্ষরতার হার প্রায় ৭০ শতাংশে পৌঁছে গেছে তখন মানুষের পক্ষে কল্পনা করাও শক্ত যে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো উচিত, এ

কথাটি তখনকার দিনের মানুষকে বোঝাতে কি আপ্রাণ চেষ্টা করতে হয়েছিল। বিদ্যাসাগর যখন বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন তখন তিনি বিদ্যালয়ের গাড়ির দুই পাশে মনুসংহিতার শ্লোক "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ" কথাটি লিখে দেন। এভাবেই তিনি জনশিক্ষা ও স্ত্রী শিক্ষার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করে গেছেন।

অধ্যাপিকা ডঃ বেবী দত্ত একান্ত নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে বাঙলা দেশে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে বিদ্যাসাগরের অবদানের বিষয়টি অধ্যয়ন করেছেন। তাঁর মননশীল গভীর গবেষণার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন তদানীন্তন বঙ্গসমাজের ঐতিহাসিক পটভূমি। দেখিয়েছেন কিভাবে বিদ্যাসাগর সামাজিক বাধাবিঘ্ন প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের পথ প্রশস্ত করেছেন। এই একটি বিষয়কে নির্দিষ্ট করে তুলে ধরবার জন্য লেখিকা আমাদের কিছু উপরি পাওনাও দিয়েছেন যেমন 'সমকালীন অপরাপর চিন্তার পটভূমিতে বিদ্যাসাগর', 'বাঙালীর ভাষা ও সংস্কৃতির ভগীরথ' বিদ্যাসাগর। বিভিন্ন ধারার আলোচনার মধ্য দিয়ে লেখিকা সমসাময়িক কাল এবং বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্ম সাধনার একটি প্রামাণ্য চিত্র তুলে ধরেছেন। ডঃ বেবী দত্ত কঠিন শ্রমসাধ্য অধ্যয়নের মধ্যদিয়ে 'বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে বিদ্যাসাগরের অবদান। গবেষণা পত্রটি তৈরি করেছেন। রচনাটি ইতিপূর্বে 'একসাথে' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এখন পুস্তক আকারে প্রকাশিত হল। আশাকরি এই বইখানি সুখপাঠ্য তথ্য বহুল প্রামাণ্য দলিলের মর্যাদা লাভ করবে। শিক্ষাব্রতী ঐতিহাসিক সমাজসেবী সর্বস্তরের পাঠক সমাজের সমাদর লাভ করবে। স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং গবেষকদের কাছেও সহায়ক পুস্তক হিসাবে সমাদর লাভ করবে। বইখানির বহুল প্রচার প্রয়োজন এবং একান্ত কাম্য।

—

প্রাক্ কথা

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার মনন জগতে ঘটে গিয়েছিল এক অভূতপূর্ব বিপ্লব। শত শতাব্দীর ক্ষুরধার মনীষা যেন এই একটি শতকেই বাংলার মাটিতে পুনরাবির্ভূত হয়েছিল। রাজনীতি, সমাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত — প্রতিটি ক্ষেত্রে শতবার্ষিকী প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের প্রখর দ্যুতিতে ১৯শ শতকের বাংলাদেশ নিখিল বিশ্বকে আলোকিত করে তুলেছিল। বাংলার সেই ১৯শ শতকীয় সৌরমণ্ডলের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কটিই হলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বর্তমান যুগের নিরাপত্তার ঘেরাটোপে বসে সেদিনের সেই প্রায়ান্ধকার সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত মধ্যযুগীয় বর্বরতা-পাশবিকতার কথা চিন্তা করলে আধুনিক মন আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। বিশেষ করে নারীজাতির প্রতি সেই বর্বর-পাশবিকতার কথা আজকের মানুষ চিন্তাও কবতে পারে না।

নারী উৎপীড়ন-নারী-অবমাননার মাত্রার বিচারে কি ছিলনা সেদিন! সম্পত্তি আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শত শত সদ্য বিধবাকে "শাস্ত্র মতে সতীর সহমরণ" আখ্যা দিয়ে মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় পুড়িয়ে মারা, বালিকা বিধবাকে নির্জলা উপবাসী রাখা, সতী সাধ্বীর আবরণে ঢেকে সূর্যালোক বঞ্চিত চার দেওয়ালের অন্ধকূপে নারীকে বন্দী করে রাখা, শিক্ষার অধিকার-পিতার উত্তরাধিকার-সামাজিক ন্যায়ের অধিকার থেকে বঞ্চিত প্রতিবাদহীন বোবা পশুর জীবন যাপনে সেদিন নারীকে বাধ্য করা হয়েছিল। দেশের আইন তাদের পক্ষে নয়, সমাজ তাদের পক্ষে নয়। সমাজের চোখে সেদিনের নারী "নরকের দ্বার" অভিধায় ভূষিত ছিল। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের জন্মদাত্রী-পালয়িত্রী নারী ছিল যেন সমাজে ব্রাত্য। গঙ্গাযাত্রী অশীতিপর বৃদ্ধের সঙ্গে শিশুকন্যার বিবাহ দিয়ে পিতা বংশমর্যাদা রক্ষা করতো। স্বামীহীনা বালবিধবা যৌবনে উত্তীর্ণা হয়ে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে যদি কোন চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশ করে ফেলতো, তাহলে তাকে 'ভ্রষ্টা' আখ্যা দিয়ে সমাজ থেকে বিতাড়িত করা হত এবং গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পতিতাবৃত্তি পালনে বাধ্য করা হত। অশিক্ষা আর কুসংস্কারের অন্ধকারে সেদিনের বঙ্গীয় নারী তার ব্যক্তিসত্তার সবটুকুই হারিয়ে ফেলেছিল।

নব্যবঙ্গের পথিকৃৎ রাজা রামমোহনই নারী জাতির প্রতি সমাজের সেই অন্যায়-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ জানালেন। বন্ধ হ'ল সতীদাহ। রাজা রামমোহন প্রদর্শিত পথে হিন্দু কলেজের ডিরোজিওর ইয়ংবেঙ্গল দল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নারী

নির্যাতন-নারী অবমাননার বিরুদ্ধে এবং নারীশিক্ষার পক্ষে প্রচার করতে থাকেন। এরপর এলেন বিদ্যাসাগর। উদ্ধত যৌবনের উদ্দীপনায় ভরপুর হিন্দু কলেজের বিপরীতে অবস্থিত শান্ত-স্থির তপোবন সদৃশ সংস্কৃত কলেজের স্নাতক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন সমাজ সংস্কারের সম্মার্জনী হাতে নিয়ে। সেই সম্মার্জনীর আঘাতে আঘাতে একটি একটি করে সামাজিক কুপ্রথার শিকড়গুলি উপড়ে ফেলতে লাগলেন সমাজ দেহ থেকে। সেই সব সামাজিক কুপ্রথার দুষ্ট ক্ষত নিরাময় করে সমাজ দেহকে করে তুলতে চাইলেন সুসমঞ্জস্য-সুন্দর। দুঃসাহসিক বৈপ্লবিক মানসিকতার অধিকারী বিদ্যাসাগর অকুতোভয়ে প্রতিটি সংস্কারমূলক কাজ করে গিয়েছিলেন একক প্রচেষ্টায়। 'একলা চল' মন্ত্রে বিশ্বাসী বিদ্যাসাগর সেই কুলীশকঠোর সংস্কারবদ্ধ সমাজের বুকে বসে দিয়েছিলেন হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ। সমাজের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে গড়ে তুলেছিলেন দেশব্যাপী আন্দোলন। নিরক্ষরতার অন্ধকারে ডুবে থাকা বঙ্গনারীকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে স্থাপন করেছিলেন বহু সংখ্যক বালিকা বিদ্যালয়। "বাল্যবিবাহের দোষ" নিয়ে করেছিলেন নির্ভীক খোলামেলা আলোচনা। অসহায়া নারীর ভদ্রভাবে জীবন অতিবাহিত করার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর মহৎ কীর্ত্তি "হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফান্ড"। ভেঙ্গে দিয়েছিলেন সংস্কৃত কলেজের রক্ষণশীলতার অচলায়তন। জাত-পাত নির্বিশেষে সকলের শিক্ষার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে খুলে দিয়েছিলেন সংস্কৃত কলেজের দরজা সর্বশ্রেণী"র শিক্ষার্থীর জন্য, অবরোধের মধ্যে থেকে "অন্তঃপুর শিক্ষা প্রণালী"র দ্বারা পাঠ গ্রহণ নয়, ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদেরও প্রকাশ্য রাজপথ বেয়ে প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষালাভের অধিকার তিনি দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, বালিকাবিদ্যালয়ের পাঠ্য সূচীতেও তিনি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন। সেই সময় উগ্র আধুনিকতাবাদী ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেন যখন বালিকা বিদ্যালয়ের পাঠ্য সূচীতে গৃহকর্ম, সূচীশিল্প ইত্যাদি পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করেন তাঁর 'অন্তঃপুর শিক্ষা প্রণালী'তে এবং বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত প্রভৃতি বিষয়গুলি মেয়েদের পক্ষে অপ্রযোজনীয় ও কঠিন বলে সেগুলি পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত না করার সিদ্ধান্ত নেন, বিদ্যাসাগর কিন্তু তখন বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে কেশব সেন বর্ণিত মেয়েদের পক্ষে ঐ "অপ্রয়োজনীয়-কঠিন" বিষয়গুলিই অন্তর্ভুক্ত করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের বাসে করে বই হাতে মেয়েদের স্কুলে যেতে দেখে সেদিন রক্ষণশীল সমাজের অন্যতম প্রতিনিধি কবি ঈশ্বর গুপ্ত মশাই ব্যঙ্গ-কবিতা লিখেছিলেন--

> "যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ী মেরে কেতাব হাতে নিচ্চে যবে
> ... ... আর কিছু দিন থাকরে ভাই। পাবেই পাবে দেখতে পাবে।
> আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে"।

অনাগত বিধাতা সেই ব্যঙ্গ কবির ভবিষ্যৎবাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে, -শুধু 'বগী' নয় মেয়েরা আজ জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্বত্রই বিচরণ করছে, আকাশযানও হাঁকাচ্ছে। এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পটভূমি রচনার প্রধান শিল্পী হলেন পণ্ডিত

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর — আজীবন শিক্ষক-সংস্কারক-মহাবিপ্লবী বিদ্যাসাগর। সে কথা মনে রেখেই এই মহাসংস্কারক-নারী জাতির প্রতি পরম স্নেহশীল-শুভাকাঙ্খী যুগন্ধর পুরুষটির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠি। বিশেষ করে ১৯শ শতকের বাংলাদেশের নারী সমাজ সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-ভাবনা-সর্বপ্রকার বিরোধিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিরক্ষরতার অতলান্ত অন্ধকার থেকে নারী জীবনকে শিক্ষার আলোক বৃত্তের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য অক্লান্ত প্রয়াস কোন একজন ব্যক্তিকে নয়-সর্বকালের মানুষকেই বিস্ময়াহত করতে বাধ্য। বর্তমান লেখিকাও নিজেকে সর্বকালের সেইসব বিস্ময়াহত মানুষদেরই একজন বলে মনে করে। সেদিনের সামাজিক অচলায়তনের বাঁধ ভেঙে স্ত্রী শিক্ষার যে ধারা তিনি প্রবাহিত করার প্রয়াসী হয়েছিলেন সেই ধারা আজ সহস্রধারা হয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। প্রবহমান সেই ধারায় আজ একবিংশ শতকের আমরা অবগাহন করার সুযোগ পেয়েছি প্রধানতঃ সেই মানুষটির জন্যই। মাতৃঋণ-পিতৃঋণ-অপরিশোধ্য; তবু পরবর্তী প্রজন্ম পূর্বসূরির ঋণ কিছুটা হলেও পরিশোধ করার চেষ্টা করে-ঠিক ঋণ পরিশোধ করা নয়— "তোমার কাছে আমরা ঋণী" এটা স্বীকার করার জন্য। আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু সেই ঋণ স্বীকারেরই প্রতিলিপি মাত্র।

পুস্তকটির প্রকাশনার ব্যাপারে সর্বাগ্রে বলতে হয় কনকদির (পশ্চিমবঙ্গের নারী মুক্তি আন্দোলনের পুরোধা নেত্রী শ্রদ্ধেয়া কনক মুখোপাধ্যায়) কথা। বস্তুত তাঁর উৎসাহেই মহিলা মাসিক পত্র 'একসাথে' পত্রিকায় আমার গবেষণা পত্রটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ঐ সময়ই কনকদি আমায় বলেছিলেন ধারাবাহিকটি শেষ হয়ে গেলে প্রবন্ধটি যেন পুস্তকাকারে বের করি এবং সেজন্য তিনি আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন। সত্যি কথা বলতে কনকদি পাশে না থাকলে হয়ত বইটি আমার পক্ষে বের করা সম্ভবই হত না।

"বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান" প্রসঙ্গে গবেষণা করতে গিয়ে আমি যাঁর কাছে সবচেয়ে বেশী ঋণী তিনি হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও নির্দেশক স্বর্গতঃ অধ্যাপক জ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। মাস্টার মশাই আজ আমাদের মধ্যে জীবিত থাকলে তাঁর নির্দেশিত আমার এই গবেষণা পত্রটির গ্রন্থরূপ দেখলে নিশ্চয়ই অত্যন্ত খুশি হতেন। বস্তুতঃ একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে তাঁর পরামর্শ, উপদেশ, নির্দেশনা ও সাহায্য না পেলে আমার এই গবেষণা সফল হওয়া হয়ত সম্ভব হত না।

আরও কিছু মানুষের কাছে আমি ঋণবদ্ধ, তাঁরা হলেন—

উত্তরপাড়া-জয়কৃষ্ণ পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক—শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চৌধুরী

শিয়াখালা-উত্তরবাহিনী পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক—শ্রীগোবিন্দরক্ষিত চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক—শ্রীমতি অরুণা চট্টোপাধ্যায়

বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের গ্রন্থাগারিক—শ্রীমতি রীতা চন্দ

জাতীয় মহাফেজ-খানার গ্রন্থাগারিক—শ্রী এম. এন. বিশ্বাস

বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শিয়াখালা-বেণীমাধব মডেল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক—শ্রীসমরেন্দ্রনাথ কোলে
শিয়াখালা-সরলা বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিদ্যাসাগরের বীরসিংহের বাড়ীর তত্ত্বাবধায়ক—শ্রীসনৎকুমার সিংহরায়
বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা ও
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আত্মীয়—শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী
বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেন্টারের অন্যান্য সংগঠক ও কর্মী—শ্রীপার্থসারথী চট্টোপাধ্যায়
—শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

প্রমুখ সহৃদয় জনের স্বতস্ফূর্ত সহায়তা আমার এই গবেষণা কার্যটিকে তথ্য সমৃদ্ধ ও সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছে। একই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার সহকর্মী ড· সুবর্ণা চৌধুরী ও তাঁর স্বামী বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেন্টারের অন্যতম উৎসাহী সংগঠক অধ্যক্ষ শ্রীসত্যব্রত চৌধুরী মহাশয়কে আমার এই কাজে নিজেদের অজান্তেই প্রভূত সহাযতাদানের জন্য।

উপযুক্ত বইপত্র পরিশ্রম সহকারে সংগ্রহ করে দিয়ে এবং অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাদির সম্ভাব্য প্রাপ্তিস্থানের নির্দেশ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করে রেখেছেন—'বীরা' হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত অপূর্বকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং বিদ্যাসাগর মহিলা কলেজের প্রাক্তন ও বর্তমান গ্রন্থাগারিকদ্বয় যথাক্রমে শ্রীমতি বীণা নন্দী এবং শ্রীমতি মমতা দাশগুপ্ত।

সর্বশেষে আমার আন্তরিক ঋণ স্বীকার করছি—বীরসিংহ, শিয়াখালা, গোবরডাঙ্গা, বারাসত, উত্তর পাড়ার সেই সব শিক্ষানুরাগী ও সাধারণ গ্রামীণ মানুষগুলির কাছে। গ্রীষ্মের নিদাঘ তপ্ত দ্বিপ্রহরে পর্যটন ক্লান্ত আমি যে সহৃদয় আতিথেয়তা তাঁদের কাছে পেয়েছি, সেই সব অপরিচিত অথচ সহৃদয়তার পথ বেয়ে অত্যন্ত কাছে এসে পড়া মানুষগুলি আমাকে আজীবন অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করে রাখবেন।

বেবী দত্ত

সূচিপত্র

পটভূমিকা

বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অবদান কতখানি তা খুঁজে বের করাই বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় মহিলা সমাজের অগ্রগতি প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নটরাজন বলেছেন, — "শতবর্ষ পূর্বে মৃত কোন ব্যক্তি যদি আজকের যুগে প্রাণ ফিরে পান, তাহলে সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পরিবর্তনটি তাঁকে সচকিত করবে, তা'হল ভারতীয সমাজে নারীর ভূমিকার অভূতপূর্ব বৈপ্লবিক রূপান্তর।" কিন্তু শ্রীযুক্ত নটরাজনের এই অভিমতের সঙ্গে আমবা পুরোপুরি একমত হতে পারি না। কারণ শতবর্ষ পরে বর্তমান ভারতের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতের সামনে দাঁড়িয়ে সেই "বৈপ্লবিক রূপান্তরের" সাথে সাথেই আমরা দেখেছি "দেওরালার সতী হত্যা", শাহবানু মামলা, ভারতের বিভিন্ন স্থানে উপজাতি নারী লাঞ্ছনা, সর্বাধুনিক রাজধানী শহরগুলিতে নারী লাঞ্ছনা, পণপ্রথার দায়ে বধূহত্যা, পণের দায় থেকে অভিভাবকদের রক্ষা করতে কিশোরীদের আত্মহনন এবং শতকরা ১৫-২৫ ভাগ মাত্র স্ত্রী শিক্ষার প্রসার। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভারতীয় সমাজে নারীর ভূমিকার সার্বিক বৈপ্লবিক রূপান্তর যদি সত্যই ঘটতো তাহলে উল্লিখিত ঘটনাগুলোর কোনোটাই বর্তমান সমাজে ঘটতো না। ভারতীয় জনগণের অর্ধেক সংখ্যক নারীর তুলনায় মুষ্টিমেয় যে কজন নারীর মধ্যে তথাকথিত "বৈপ্লবিক রূপান্তর" দেখে উল্লিখিত মন্তব্য করা হয়েছে তাদের সংখ্যা সমুদ্রের পাশে গোষ্পদ তুল্য। সুতরাং মুষ্টিমেয়কে দিয়ে সমষ্টির বিচার হয় না। এবং মুষ্টিমেয়কে দিয়ে সমগ্র সমাজের সার্বিক মূল্যায়নও সঠিক বলে গ্রাহ্য করা যায় না।

আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক সভ্যতার অগ্রগতির চাপে ভারতীয় সমাজে আধুনিকতার প্রসার ঘটছে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে পশ্চাৎবর্তিতাকেও সমাজ অতিক্রম করতে যে পারছে না এটাও ঘটনা। শিক্ষার ক্ষেত্রে আজও আমাদের সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যাগত উন্নতি হয়নি। আবার সংখ্যাগত উন্নতি যতখানি হয়েছে সেই অনুপাতে বা তাব সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নারীর আত্মিক উন্নতিও ঘটেনি। কারণ সমাজে নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই মধ্যযুগীয় মানসিকতার রেশ প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে আজও অব্যাহত রয়েছে. এবং এ ব্যাপারে পুরুষদের তুলনায় মেয়েরাই বেশি অগ্রণী একথা অপ্রিয় হলেও সত্য। আর সত্য বলেই আধুনিক শহরে শিক্ষিত পরিবারে দেনা-পাওনার যূপকাষ্ঠে দেবযানী বণিকদের আজও বলি দেওয়া হয় এবং সেই বলি দেওয়ার জন্য যে খাঁড়া ব্যবহার করা হয়, সেই খাঁড়া পুরুষদের

হাতে তুলে দেয় পরিবারের মেয়েরাই। কাজেই একদিকে নটরাজনের অভিমত যতখানি সত্য (মুষ্টিমেয়ের ক্ষেত্রে), অন্যদিকে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাও ঠিক ততখানি তো বটেই, কোন কোন ক্ষেত্রে আরও অনেক বেশিভাবেই সত্য।

ভারতীয় সমাজ জীবনের এই স্ববিরোধিতাই স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই স্ববিরোধিতাকে অতিক্রম করতে না পারলে স্ত্রী শিক্ষার যথার্থ অগ্রগতি কোনমতেই সম্ভবপর নয়। বাংলাদেশ যেহেতু ভারতের অঙ্গরাজ্য সেহেতু সর্বভারতীয় ক্ষেত্রের প্রতিফলনই ঘটেছে বাংলাদেশে (স্বাধীনতাপূর্ব) তথা পশ্চিমবঙ্গে (স্বাধীনতা পরবর্তী)।

সত্য কথা বলতে কি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় থেকে আজ পর্যন্ত স্ত্রী শিক্ষার যদি যথার্থ প্রসার হতো তাহলে সমাজ জীবনে এই স্ববিরোধিতা দেখা যেত না। কারণ একমাত্র শিক্ষার যথার্থ প্রসারই পারে সমাজ জীবনের এই স্ববিরোধিতা দূর করতে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর পর কেটে গেছে একশত সাতটি বছর, শতবর্ষ অতিক্রান্ত। সুতরাং তদানীন্তন বাংলাদেশের নারী শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রবর্তী ভূমিকা কতখানি ছিল সে সম্পর্কে মূল্যায়নের সময় অবশ্যই এসেছে।

নারী শিক্ষার বিষয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষ ছিল সমৃদ্ধ ঐশ্বর্যশালী। গার্গী-মৈত্রেয়ী-খনা প্রমুখ একাধিক উচ্চশিক্ষিতা প্রাচীন ভারতীয় নারী সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ আমরা প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে পাই। সুতরাং মেনে নেওয়া যেতে পারে যে সে যুগে নারী শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে মারাত্মক বিধিনিষেধ ছিল না। গার্গী-মৈত্রেয়ী-বিশ্ববারা, ঘোষা-অপালা প্রমুখ ঋষিকারা ছিলেন ব্রহ্মবাদিনী, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে গার্গী ব্রহ্মা সম্পর্কে নানাপ্রকার প্রশ্নোত্তরে যাজ্ঞবল্ক্যকে বিপর্যস্তও করেছিলেন। মহানির্বাণতন্ত্রে উল্লিখিত "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নত:" — এই শ্লোকটিতে প্রমাণিত হয় সে যুগে পুরুষের সঙ্গে নারীরও শিক্ষালাভে অধিকার ছিল।

কিন্তু মেয়েদের অবস্থা চিরকাল একইরকম রইল না। প্রাচীনযুগের শেষ দিক থেকেই এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। প্রাচীন যুগের শেষ পর্বে যখন বর্ণাশ্রম প্রথার নানা চোরাগলিতে সমাজ আবদ্ধ হয়ে পড়ল এবং শাস্ত্রকারদের নানা (তথাকথিত ধর্মীয়) বাঁধনে মানুষের জীবনকে ছকে ফেলা হলো, সমাজের প্রাচীন কাঠামোকে কোনরকমে টিকিয়ে রাখবার চেষ্টা হলো, তখন থেকেই নারী-স্বাধীনতার ক্রমিক অবনতি শুরু হয়েছে। এ ব্যাপারে সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থাও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। একদা যখন যৌথ সমাজে সম্পত্তির যৌথ অধিকার স্বীকৃত ছিল, তখন সমাজে ও পরিবারে নারীর স্থান নির্ধারণে যে মানদণ্ড ব্যবহৃত হতো, সম্পূর্ণ পুরুষ প্রধান সমাজে সম্পত্তির উত্তরাধিকার সূত্রের নানা টানাপোড়েনের ফলে নারীর সেই স্থান ও ব্যক্তিত্ব ক্রমেই অবলুপ্ত হয়। উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর অংশ ক্রমেই কমে যাচ্ছিল, যদিও গৃহকর্মে নারীর পরিশ্রম ও দায়িত্ব যথেষ্টই ছিল, তবু তাকে ভার্যা অর্থাৎ অন্যের দ্বারা ভরণীয়া, স্বামীর অন্নে প্রতিপালিত এই সংজ্ঞা দেওয়া

হলো। সম্পত্তিতে গোষ্ঠীগত সত্বাধিকার থেকে ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো। উৎপাদনে উদ্বৃত্ত ধন মুষ্টিমেয় কিছু লোকের মধ্যে বিভক্ত হলো। নিচের দিকের মানুষের শ্রমশক্তিকে ব্যবহার করে, শোষণ করে পাওয়া এই ধনের উপর থেকে দখলদারী চলে যাওয়ার আশঙ্কায় নারীকে করা হলো অন্তঃপুরের চার দেওয়ালের মধ্যে অবরুদ্ধ। গোষ্ঠীযুগে নারীর যে ধরনের স্বাধীনতা ছিল, তাতে স্ত্রী বা সন্তানের পরিচয় একটি পুরুষের সঙ্গে এমন একান্ত ও অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল না। সে যুগ পেরিয়ে এসে ব্যক্তিগত মালিকানার দিনে সম্পত্তি যখন একান্ত ও নিশ্চিতভাবে নিজেরই সন্তানের জন্য রেখে যাবার উগ্র বাসনা জাগল, তখন যাতে ঔরসজাত সন্তানটিকে নিশ্চিন্তভাবে চিহ্নিত করতে পারা যায় তাই স্ত্রীকে নিজের অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ করে রাখার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া স্ত্রীও ততদিনে সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে, তাই তার উপর ব্যক্তিগত মালিকানা জাহির করাও দরকার হয়েছিল। তারও একটা কারণ ছিল, — পুরুষের যথেচ্ছ পরনারী সম্ভোগের অধিকার তখন সমাজ মেনে নিয়েছে। সুতরাং এই জীবনে অভ্যস্ত পুরুষ স্বভাবতই তার একান্ত ভোগ্য পত্নীটিকেও সেইরকম সন্দেহের দৃষ্টিতেই দেখবে। তাই তার সম্বন্ধে পাহারা বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে পৌঁছল যখন নারী হলো কয়েদী এবং পুরুষ হলো প্রহরী। একদা যখন সহমরণ ঘটতো কালে ভদ্রে ক্রমে ক্রমে সেই সহমরণ ব্যাপক আকার ধারণ করে। সহমরণ প্রথার সেই ব্যাপকতা দেখে মধ্যযুগে মোগল সম্রাট আকবরকেও এই প্রথার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা ভাবতে হয়েছিল। সুতরাং বিষয়টি কেবল প্রাচীনযুগ মধ্যযুগের নয়। আমরা যুগ বিভাজন করি সমাজ জীবনের গতি-প্রকৃতির ভিত্তিতে। সেই অর্থেই যদিও নারী শিক্ষার অবনমন ঘটেছে মাত্রাতিরিক্তভাবে মধ্যযুগে, কিন্তু এর সূচনা হয়েছিল প্রাচীনযুগের শেষ পর্ব থেকেই। "অথর্ববেদের" সময় থেকেই সহমরণের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় প্রাচীন সাহিত্যে। অথর্ববেদে ঃ "দেখলাম জীবিত নারীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মৃতের বধূ হতে", "এই নারী পতিলোকে যাচ্ছে, এ প্রাচীন রীতি অনুসরণ করছে" — ইত্যাদি ধরনের উল্লেখ পাওয়া যায়। নারীর শিক্ষার অধিকার ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল। শিক্ষিতা নারীর প্রসঙ্গে "তৈত্তিরীয় আরণ্যকে" বলা হয়েছে, "স্ত্রিয়ঃ সতীঃ তা উ যে পুং সঃ আহুঃ" অর্থাৎ নারী হয়েও তারা পুরুষ। তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে — "সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে মাটিতে রাখা হয়, শিশুপুত্রকে তুলে ধরা হয়।"

'গৃহিনী-সচিব-সখা' — নারীর সম্পর্কে মহাকবির এই স্বীকৃতি ভারতীয় সমাজে সম্ভবত কোনদিনই ছিল না। বরং "পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্যা"-র ভূমিকা গ্রহণ করতেই তাকে বাধ্য করা হয়েছিল। সমাজে নারীর এই অবমূল্যায়নের ধারা অব্যাহত রইল পরবর্তী সমগ্র মধ্যযুগ অবধি। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সমাজে 'মানুষ' বলে নারীর কোন স্বীকৃতিই ছিল না।

মধ্যযুগের অস্থির রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ক্ষেত্রেও অস্থিরতা দেখা দিল এবং তার অবশ্যম্ভাবী প্রতিফলন ঘটেছিল শিক্ষাক্ষেত্রেও।

বারবার বিদেশী হানার সাথে সাথে ভারতের প্রাচীন সনাতন ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম রূপে নতুন ইসলাম ধর্মের প্রবেশও ঘটে ভারতে। নতুন ধর্মের আগ্রাসী আক্রমণের হাত থেকে সনাতন ধর্মকে রক্ষা করার জন্য সামাজিকক্ষেত্রে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপিত হলো। তথাকথিত ধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করার নামে ভারতীয় নারীকে বন্দী করা হলো অন্তঃপুরের চার দেওয়ালের মধ্যে। নারী হারালো তার সমস্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকার। পুরুষের অন্তঃপুরে কতকগুলি জীবন্ত পুতুলে পর্যবসিত হলো তার অস্তিত্ব। এখানে-ওখানে দু-একটি ব্যতিক্রম ভিন্ন সমগ্র ভারতীয় নারী সমাজের সমৃদ্ধিশালী প্রাচীন ঐতিহ্য স্রোত পুরোপুরি রুদ্ধ হয়ে গেল।

ইতিহাসের এই যুগের ধীরে ধীরে অবসান ঘটে ভারতে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সূচনার পর থেকে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তি জয়লাভ করে। ফলশ্রুতি বাংলাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন কায়েম। বাংলাদেশে বিদেশী বণিকদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বিদেশী মিশনারি শিক্ষাবিদও এলেন একই জাহাজে চেপে। একদিকে যেমন শুরু হলো এদেশে বিদেশী শাসনকে সুদৃঢ় করার প্রয়াস, অপরদিকে তেমনি বিদেশী মিশনারি শিক্ষাবিদ্‌গণ প্রয়াস চালাতে লাগলেন সেদিনের অনগ্রসর বাঙালী সমাজের তথাকথিত উন্নয়ন সাধনের। সামাজিক উন্নয়নের কাজের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়েছিল সেদিনের অনগ্রসর বাংলাদেশের ততোধিক অনগ্রসর নারী সমাজের উন্নতি বিধানের প্রচেষ্টাও। যদিও এই বিদেশী প্রচেষ্টার পিছনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল খ্রীষ্টধর্ম প্রচার এবং বিদেশী শাসনকে সুদৃঢ় করার মনোভাব, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এই প্রয়াস মানবিক আন্তরিকতার সঙ্গেও পালিত হচ্ছিল।

সেদিনের সেই বিদেশী মিশনারি শিক্ষাবিদ্‌গণ বাঙালী মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে ১৮২২ সনের ১১ই মার্চ 'দি ক্যালকাটা জার্নালে' প্রকাশিত স্ত্রী শিক্ষা সংক্রান্ত বিবরণীতে। 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' নামে একটি খ্রীষ্টান মহিলা সমিতি নন্দন বাগান (লিভারপুর স্কুল), গৌরীবেড়ে (বার্মিংহাম স্কুল), জানবাজার (সালেম স্কুল), চিৎপুর প্রভৃতি পুরোন কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে কতকগুলি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে মিস্ কুক ভারতে আসেন এবং একবছরের মধ্যেই আটটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন কলকাতা শহরে। সেগুলি হলো ঠনঠনিয়া স্কুল (২৫-১-১৮২২); মির্জাপুর স্কুল (১৬-১-১৮২২); প্রতিবেশী স্কুল (১৮-২-১৮২২); শোভাবাজার স্কুল (২৫-৩-১৮২২); কৃষ্ণরাজার স্কুল (২-৪-১৮২২); মল্লিকবাজার স্কুল (৩-৫-১৮২২); কুমোরটুলি স্কুল (১৮-৫-১৮২২) এবং শ্যামবাজার স্কুল। এই স্কুলগুলিতে ছাত্রী সংখ্যা ছিল মোট ২১৭জন এবং গড় উপস্থিতি ছিল ২০০ জন। শ্যামবাজার অঞ্চলের স্কুলটি এক মুসলমান মহিলার উৎসাহে প্রায় ১৮টি বালিকা নিয়ে খোলা হয়। তাঁর অসীম উৎসাহের জন্য বালিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে পরে ৪৫ জন হয়।

১৯ শতক এক আশ্চর্য শতক, বিশেষ করে তদানীন্তন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে।

সেইসময় দেশজুড়ে শুরু হয়েছিল যেন এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ তৈরি হয়েছিল সেই বিপুল কর্মযজ্ঞের পটভূমিতে। বিরাট সেই যজ্ঞে আহুতি দিয়েছিলেন সেদিনের কত শত মনীষা।

চৈতন্যযুগের মহাজাগরণের পর হঠাৎই যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল সেদিনের বাংলাদেশ। তদানীন্তন সমগ্র বাংলাদেশের বুকের উপর চেপে বসেছিল তামস রাত্রির অন্ধকার। ১৯ শতকে সেই মোহ নিদ্রা ভাঙ্গাতে আবির্ভূত হলেন রাজা রামমোহন রায়। সংস্কারের রুদ্ধদ্বারে সজোরে ঘা মারলেন তিনি। ভেঙে পড়তে লাগলো অচলায়তনের রুদ্ধ কবাটগুলি। মুক্ত বাতাসের ঝাপটায় জাতির ঘুম ভাঙতে লাগলো। পশ্চিমেব নবজাগরণের বার্তা শোনালেন তিনি বাঙালীকে। সেই বার্তা শুনে চমকিত হলো বাঙালী জাতি। বিস্মিত হয়ে দেখলো যে, সে যখন বসে আছে মধ্যযুগীয় অন্ধ কুসংস্কার ধ্যান-ধারণাকে আশ্রয় করে, অন্য পৃথিবীতে তখন যুগান্তর ঘটে গেছে।

ইংরেজ এদেশে ভেদনীতির সাহায্যে রাজত্ব কায়েম করেছিল, ভেদনীতির সাহায্যেই তাদের রাজত্বকে স্থায়িত্ব দিতে চেয়েছিল। সেজন্যই এদেশে সৃষ্টি করেছিল এক জমিদারশ্রেণী, আর সেই সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষার দ্বারা তৈরি করেছিল এক বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। কিন্তু ইংরেজ সৃষ্ট সেই বুদ্ধিজীবীশ্রেণী একদিকে যেমন ইংরেজ সাম্রাজ্যকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছিল, অন্যদিকে তেমনি ইউরোপের নবজাগরণের সংবাদ সেইসব বুদ্ধিজীবীদের একাংশকে অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল। সেই অনুপ্রেরণা দিয়ে সেদিনের বাংলাদেশকে তাঁরা জাগাতে চাইলেন। এই নবোদ্ভূত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী থেকেই আবির্ভূত হয়েছিলেন রাজা রামমোহন। কিন্তু মুষ্টিমেয় বাঙালী নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেও সাধারণ জনমানস কিন্তু মধ্যযুগীয় সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারেনি। জাতিচ্যুত, গোত্রচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় সঙ্কুচিত হয়ে রইল তারা।

বিদ্যাসাগর যখন এলেন, তখনও জনমানস সংশয়িত। নিজেদের আধুনিক ভাবতে বা এ যুগের পথিকৃৎদেব আপনজন বলে মানতে পারছে না। ইংরাজী শিক্ষালাভ করলে ছেলে ব্রাহ্ম কিংবা খ্রীষ্টান হয়ে যাবে — এই আশঙ্কায় প্রাচীন মূল্যবোধে আবিষ্ট মানুষ ইংরাজী শিক্ষার প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছিল। সাধারণ জনমানস রক্ষণশীল আদর্শেরই অনুসারী ছিল। কারণ বহুদিনের সংস্কারকে উত্তীর্ণ হওয়ার মত মানসিক শক্তিলাভ তখনও তাদের হয়নি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ঈশ্বরচন্দ্রকে চিনতে বা তাঁকে আপন করে নিতে সাধারণ মানুষের দেরি হলো না। জনগণ দেখলো তাঁর মধ্যে নেই ইংরাজী শিক্ষার অহমিকা যা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দেয়। নেই ধনগৌরব বা বংশগৌরবের আভিজাত্য। তারা দেখলো তাদের চিরচেনা পল্লী ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগরকে। তিনি শাস্ত্র আলোচনা করেন, কিন্তু সে আলোচনায় পুরাতন শাস্ত্র বিধান নতুন ব্যাখ্যা লাভ করে। যে শিক্ষা এতকাল ছিল উচ্চবিত্ত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ সেই শিক্ষাকে তিনি ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস করলেন জনসাধারণের মধ্যে (গ্রাম-গ্রামান্তরে 'বাংলা স্কুল' প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে) — দরিদ্র গ্রামবাসী আর চিব বঞ্চিত নারী সমাজের মধ্যে। ১৩।৬।২০০১

সংক্ষিপ্ত জীবনী

বাংলাদেশে (স্বাধীনতাপূর্ব) স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে আমরা যাঁর অবদান নিয়ে আলোচনা করছি তাঁর জীবন কাহিনীটি জেনে নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি।

বাংলা ১২২৭ সালের আশ্বিন মাসে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহগ্রামে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়। পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ পুত্র ঠাকুরদাসকে নবজাতকের সংবাদ জানাতে গিয়ে বলেছিলেন বাড়িতে একটা এঁড়ে বাছুর জন্মেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় পরবর্তীকালে নিজেই বলেছেন, "জন্ম সময়ে, পিতামহদেব পরিহাস করিয়া আমায় এঁড়ে বাছুর বলিয়া ছিলেন : জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনা অনুসারে বৃষ রাশিতে আমার জন্ম হইয়াছিল, আর সময়ে সময়ে কার্য দ্বারাও, এঁড়ে গোরুর পূর্বোক্ত লক্ষণ, (বাবাজি আমার এঁড়ে গোরু অপেক্ষাও এক গুঁইয়া হইয়া উঠিতেছেন'—ঠাকুরদাসের উক্তি), আমার আচরণে বিলক্ষণ আবির্ভূত হইত।"

নিজের শৈশবের কথা বলতে গিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বলেছেন পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ তাঁর জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতার অপমানসূচক ব্যবহারে ব্যথিত হয়ে দেশত্যাগী হন। দুই পুত্র ও চার কন্যা নিয়ে পিতামহী দুর্গাদেবী শ্বশুরবাড়িতে লাঞ্ছনা-নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে পিত্রালয়ে চলে যান। কিন্তু সেখানেও দুর্গাদেবী সুখ পেলেন না। ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার নির্যাতনে অস্থির হয়ে সন্তান সহ দুর্গাদেবীকে পিতৃগৃহ ত্যাগ করতে হয়। পিতা উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত নিজ বাটীর অনতিদূরে দুর্গাদেবীর জন্য একটি কুটীর নির্মাণ করে দিলে দুর্গাদেবী পুত্র-কন্যা নিয়ে সেখানেই থাকতে লাগলেন। ঐ সময়ে টেকুয়া ও চরকায় সুতো কেটে, সেই সুতো বেচে অনেক নিঃসহায় স্ত্রীলোক নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতেন। দুর্গাদেবীও সেই বৃত্তি অবলম্বন করে অতিশয় কষ্টে দিন কাটাতে লাগলেন। এই সময়ে ঠাকুরদাস ১৪/১৫ বছরের হলে মায়ের অনুমতি নিয়ে উপার্জনের চেষ্টায় কলকাতায় গেলেন। কলকাতায় নিরতিশয় দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে ঠাকুরদাস প্রথমে দু'টাকা বেতনে একটি কাজ পেলেন। বেতনের দু'টি টাকাই তিনি জননী দুর্গাদেবীকে পাঠিয়ে দিতেন নিজের থাকা-খাওয়ার অসুবিধা হওয়া সত্ত্বেও। এরপর বেতন বৃদ্ধি পেয়ে প্রথমে পাঁচটাকা, তারপর আটটাকা, পরিশেষে দশ টাকা হয়। তাঁর যখন পাঁচ টাকা বেতন হয়, তখনই পিতা রামজয় দেশে ফিরে অসেন। তারপর ঠাকুরদাসের বেতন যখন আট টাকা হয় তখনই তর্কভূষণ মহাশয় রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতীদেবীর সঙ্গে ঠাকুরদাসের বিবাহ দেন। ঠাকুরদাস আর ভগবতীদেবীরই জ্যেষ্ঠ সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

গ্রামের কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় পাঠ সমাপন করে আট-নয় বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র পিতা ঠাকুরদাসের সঙ্গে কলকাতায় আসেন। বীরসিংহ থেকে কলকাতায় আসার পথে মাইলস্টোনের উপরে লেখা ইংরাজী সংখ্যা দেখে সেগুলি চিনে নেন। কলকাতায় এসে ১৮২৯ সালের ১লা জুন ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজে প্রায় সাড়ে বারো বছর অধ্যয়নের পর ১৮৪১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র কলেজ থেকে একটি এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকদের নিকট থেকে একটি মোট দুটি প্রশংসাপত্র এবং 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। সংস্কৃত কলেজে পাঠের সময় প্রায় প্রতি শ্রেণীতেই পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে প্রচুর পুস্তক ও নগদ অর্থ পুরস্কার পেতেন। প্রথমে ৫ টাকা হারে, পরে ৮ টাকা হারে বৃত্তিও পেয়েছিলেন। ১৮৩৯ সালে ঈশ্বরচন্দ্র 'হিন্দু ল' কমিটির পরীক্ষায় প্রশংসাপত্রও পান।

১৮৪১ সাল থেকে ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত মাসিক ৫০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগে প্রধান পণ্ডিতের পদে কাজ করেন। এই পদে থাকাকালীনই ১৮৪৩ সালে মাসিক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধ নির্বাচনী কমিটির সভ্য হন। এরপর ১৮৪৬ সালের ৬ই আগস্ট থেকে সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। এই সময় ১৮৪৭ সালে মদনমোহন তর্কালংকারের সহযোগিতায় 'সংস্কৃত প্রেস' ও প্রেস ডিপোজিটরী' প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বছরই সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে ইস্তফা দেন। কারণ সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন সম্পাদক রসময় দত্তের সঙ্গে মতবিরোধ। ১৮৪৯ সালে মাসিক ৮০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান কেরানি ও কোষাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। পরের বছর ১৮৫০ সালে 'সর্বশুভকরী পত্রিকা' প্রকাশ করেন এবং প্রথম সংখ্যাতেই 'বাল্যবিবাহের দোষ' নামে সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ লেখেন। ঐ বছরই শেষের দিকে মাসিক ৯০ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন এবং কিছুদিন পরেই সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন-সংক্রান্ত রিপোর্ট শিক্ষা পরিষদে পেশ করেন। ১৮৫০ সাল থেকে ১৮৯১ সালের জুলাই মাসে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন ছিল ঘটনাবহুল।

বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক রূপে ঐ বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য নিরলস পরিশ্রম, অব্রাহ্মণ ও জাতি নির্বিশেষে হিন্দু সন্তান মাত্রের জন্য সংস্কৃত কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া, সংস্কৃত কলেজের ইংরাজী ভাষাকে অবশ্য পাঠ্যবিষয় করা, বোর্ড অব একজামিনার্সের সদস্যপদ ও বিশ্ববিদ্যালয় গঠন কমিটির সদস্য পদলাভ, দক্ষিণবঙ্গের বিদ্যালয় সমূহের বিশেষ পরিদর্শকের পদলাভ, বাংলা বিদ্যালয় সংক্রান্ত সুপারিশ সরকারের কাছে প্রেরণ, বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' মনোনীত, বিধবা বিবাহ আন্দোলন, বহু বিবাহ নিরোধ আন্দোলন, বিধবা বিবাহ আইন পাশেব অনতিকাল পর থেকে বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠান, বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বালিকা বিদ্যালয়

স্থাপন, বালিকা বিদ্যালয়গুলির জন্য সরকারী অর্থ সাহায্য সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের সঙ্গে মতবিরোধ, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদত্যাগ, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সহযোগিতায় 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা প্রকাশ, মুর্শিদাবাদের কান্দিতে ইংরাজী বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন, বোধোদয়, বর্ণপরিচয়, শকুন্তলা, সীতার বনবাস প্রকাশ, তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ, বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রকাশ, কলকাতা ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের সেক্রেটারি পদলাভ, 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র পরিচালনভার গ্রহণ, ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের পরিদর্শক নিযুক্ত, লন্ডনের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির 'অনারারি মেম্বার' নির্বাচিত, কলকাতা ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনের নাম পাল্টে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন নামকরণ, দুর্ভিক্ষে সেবাকার্যে 'দয়ার সাগর' উপাধিলাভ, মধুসূদনকে ফ্রান্সে ১৫০০ টাকা প্রেরণ, আত্মীয়দের সঙ্গে মনোমালিন্যের ফলে চিরদিনের মতো বীরসিংহ গ্রাম ত্যাগ, ভারতীয় বিজ্ঞান সভায় ১০০০ টাকা দান, পুত্র নারায়ণের বিধবা বিবাহ, বহু বিবাহ সংক্রান্ত পুস্তক প্রকাশ, 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফান্ড' প্রতিষ্ঠা, মেট্রোপলিটন কলেজ স্থাপন, 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি' ফান্ডের ট্রাস্টি পদ ত্যাগ। সি আই ই খেতাব লাভ, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' মনোনীত, বীরসিংহে ভগবতী বিদ্যালয় স্থাপন, 'সহবাস সম্পত্তি আইন' সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে সুচিন্তিত পরামর্শ দান।

সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করে বেরিয়ে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যে সুদীর্ঘ কর্ম বহুল জীবন শুরু হয় তাঁর,—মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিরলস সেই জীবনে অবসর বলতে বিশেষ কিছুই ছিল না। এতকাজের পরও আছে তাঁর সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী অনুবাদ সহ বিশাল রচনা সম্ভার। যার মধ্যে পাঠ্যপুস্তকের এক বিরাট অংশ আছে। কতবড় কর্মবীর হলে একজন মানুষ তাঁর একজীবনে এতগুলো কাজ করতে পারেন—বিদ্যাসাগরই তার একমাত্র দৃষ্টান্ত বললে অত্যুক্তি করা হয় না।

বিদ্যাসাগরের সুদীর্ঘ সেই কর্মজীবন অনুসরণ করলে বিস্মিত হতে হয়। বীরসিংহগ্রামের সেই দারিদ্র্য জীর্ণ সংসারে জন্মগ্রহণ করে,—প্রবল দারিদ্র্যের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া থেকে শুরু করে তীব্র গতিতে সেদিনের বঙ্গ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমে থাকা কুসংস্কারের জঞ্জাল সংস্কারের সম্মার্জনী দিয়ে তুলে ফেলতে চেয়েছিলেন। সমাজসংস্কারক, শিক্ষাসংস্কারক, ভাষাসংস্কারক—কি না তিনি করেছেন। আভিজাত্যের গজদন্তমিনারের উপর থেকে তিনি সমাজের মানুষকে দেখেননি, দেখেছেন অনেক কাছ থেকে—একেবারে তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে। তাই সাধারণ মানুষের মর্মবেদনাকে আপন মর্ম বেদনার সঙ্গে মিলিয়ে ফেলতে পেরেছিলেন সহজেই। সেজন্য কোন কৃত্রিম প্রচেষ্টা তাঁকে করতে হয়নি। মনে হয় সেজন্যই তাঁর যে কোনরকমের সংস্কারেরই গতি ছিল এত তীব্র যে, সেদিনের উচ্চবিত্ত অভিজাতশ্রেণীর যাঁরা তাঁকে সমর্থন করেছিলেন, তারা তাঁর গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পেরে অর্ধপথেই যাত্রাভঙ্গ করেছিলেন। উগ্রপন্থী ইয়ং বেঙ্গল দলের প্রায় সকলেই ছিলেন ধনীর সন্তান, সমাজসংস্কার ছিল তাঁদের কাছে অনেকটা অবকাশ রঞ্জনের মতো ব্যাপার। তাই তাঁদের সমাজসংস্কারমূলক সদিচ্ছাগুলি অধিকাংশক্ষেত্রেই ছিল 'কথা'

সর্বস্ব। কিন্তু মেহনতী মানুষ বিদ্যাসাগর কথার চেয়ে কাজকেই বেশি মূল্য দিতেন। সেজন্য তাঁর নিজের লেখা 'আত্মজীবনী' মূলক কোন রচনা নেই, যেটুকু 'জীবন চরিত' লিখে গেছেন, তাতে নিজের সম্বন্ধে কিছু বলার চেয়ে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের কথাই আছে বেশি পরিমাণ। যেটুকু নিজের কথা আছে তা থেকে তাঁর শৈশবের এঁড়ে বাছুরের গোঁ, আর মাইলস্টোন দেখে ইংরাজী সংখ্যা চেনাটুকুই আমরা জানতে পারি। মনে হয় ইচ্ছে করেই তিনি নিজের কথা কিছু লিখে যাননি। তবে বিদ্যাসাগর নিজের অজান্তেই তাঁর শৈশবের স্মৃতি মন্থন করতে গিয়ে রাইমণির প্রসঙ্গ তুলে নিজে তিনি নারী জাতির প্রতি কতখানি কৃতজ্ঞ, কেন তিনি স্ত্রীজাতির প্রতি বিশেষ পক্ষপাতী সে সম্পর্কে সামান্য কিছু আভাস দিয়ে ফেলেছেন। তাঁর শৈশবে 'এঁড়ে বাছুরের গোঁ'—সম্পর্কে বিবরণ দিতে গিয়ে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে হলেও নিজের চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং আদর্শ নিষ্ঠা ও কার্যে একাগ্রতা সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করেছেন। ভবিষ্যতের পরিণত 'বিদ্যাসাগরের' হঠাৎ আভাসটুকুও ধরা পড়ে আট বছরের ঈশ্বরচন্দ্র যখন একবার দেখেই কয়েকঘন্টার মধ্যে সমস্ত ইংরাজী সংখ্যাগুলো মাইলস্টোনের সাহায্যে শিখে নেন। তবুও পরিপূর্ণভাবে তাঁকে জানার জন্য ঐ 'জীবনচরিত' (স্বরচিত)টুকু কোন মতেই যথেষ্ট নয়। তাঁকে জানতে গেলে তাঁর সারা জীবনের কর্মসাধনাকেই আমাদের অনুধাবন করতে হবে। তাঁর কাজের মধ্যে থেকেই তুলে আনতে হবে মানুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে। মধুসূদনের সেই 'First man of us' কিংবা "The Greatest Bengali' কে। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে, কর্মজীবন সমগ্রজীবন নয়। মানুষ বিদ্যাসাগর তাঁর কীর্তির চেয়েও মহৎ-তাঁর অনমনীয় চরিত্র শক্তিতে, তাঁর মানব প্রেমে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : "বহমান কালগঙ্গার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিল ছিল, এইজন্যই বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক।"

বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনকে এই বহমান কালগঙ্গার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে তাঁর আধুনিকতা অনুভব করতে হবে। সেখানে একদিকে সাক্ষ্য বিদ্যাসাগরের সমসাময়িকদের লেখা ও কথা, বিদ্যাসাগরের জীবনী সমূহ, অন্যদিকে বিদ্যাসাগরের নিজস্ব দান-জীবন সংগ্রামে তাঁর দাখিল করা প্রতিদিনের প্রমাণপত্র। বিদ্যাসাগরের আপন পরিচয় তাঁর কর্মে ও সংগ্রামে, তাঁর শিক্ষানীতির ব্যাখ্যায়, তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তক সমূহে, তাঁর সামাজিকসংস্কার প্রয়াসে, সমাজসংস্কারমূলক বিভিন্ন লেখায়, ভাব ও ভাষাসমৃদ্ধ গাম্ভীর্যপূর্ণ বাংলা রচনায়, তাঁর জীবনী রচনার প্রয়াস সম্পূর্ণ হতে পারে বিদ্যাসাগরের নিজের সাক্ষ্যে,—তাঁর রচনায়, লিখিত মন্তব্যে, পত্রে এবং তাঁর হাস্য—পরিহাস সমৃদ্ধ আলাপচারিতায়।

বাস্তব কর্মক্ষেত্রে বাঙালী চরিত্রে অলসতা —আরামপ্রিয়তা বিদ্যাসাগরের মতো একাগ্রচিত্ত ও আত্মপ্রত্যয়শীল ব্যক্তির কাছে ছিল চক্ষুশূল। তাই প্রায়ক্ষেত্রেই তিনি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কর্তৃত্ব নিজহাতে নিয়ে নিতেন কতকটা বাধ্য হয়েই।

জাতীয় শিক্ষার প্রথম ব্যাখ্যান আমরা তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি। জাতীয় শিক্ষার

রূপ কি, বাহন কি, বাস্তবক্ষেত্রে শিক্ষার ভাষানীতি কি—বিদ্যাসাগরই তা প্রথম ব্যাখ্যা করেন। এই শিক্ষানীতি জাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষাপ্রসারের নীতিও। যদিও বিদ্যাসাগর তখনো (১৮৪৯) শিক্ষার সর্বজনীন বিস্তারের কথা ভাবেননি বা সে সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করেননি এবং সেজন্য তাঁকে সীমাবদ্ধতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় ; কিন্তু সুযোগ পেতেই (১৮৫৪-৫৮) ঝড়ের গতিতে তিনি গ্রামে গ্রামে আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হন। এটা যে সর্বরকমেই জাতীয় শিক্ষার বিস্তার প্রচেষ্টা তা আজ আর কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। আর আমরা এও জানি যে, সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী সরকার সেজন্যই তার বিরোধিতা না করে পারেনি। আমরা এও জানি বিদ্যাসাগরের শিক্ষাবিস্তারের নীতি সেদিনের ১৯ শতকের "ভদ্রলোক" শ্রেণীও অনুমোদন করেনি।

নির্দেশিকা

প্রথম অধ্যায় (নির্দেশিকা)

১। প্রাচীন ভারত :সমাজ ও সাহিত্য সুকুমারী ভট্টাচার্য : পৃঃ ৪৪

২। প্রাচীন ভারত : ঐ ঐ পৃঃ ৩৯-৪০

৩। প্রাচীন ভারত : ঐ ঐ পৃঃ ৩১

৪। Women's Education in Eastern India-
Jogesh Chandra Bangal-Page 9-10,20

৫। দ্রষ্টব্য : বিদ্যাসাগরের শিক্ষা চিন্তা 'Notes on the Sanskrit College' ব্যালান্টাইনের রিপোর্ট সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মতামত—(বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (১ম খণ্ড) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা ৪র্থ অধ্যায়ে (পৃঃ ৭৫-৭৭) করা হয়েছে।

২য় অধ্যায় (নির্দেশিকা)

১। আত্মচরিত (স্বরচিত) প্রথম পরিচ্ছেদ, ৩য় অনুচ্ছেদ, ৬ষ্ঠ-১০ম পংক্তি।

২। ঐ ঐ ঐ ৯ম অনুচ্ছেদ, ১ম-২য় পংক্তি।

৩। বিদ্যাসাগর চরিত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৬৯।

বিচার্য বিষয়ের আলোচনা

বাংলাদেশে মিশনারিদের শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা শুরু হয় শ্রীরামপুর মিশনকে কেন্দ্র করে। এই উপলক্ষে তাঁরা তদানীন্তন বাংলাদেশের মেয়েদের জন্য বেশ কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। (এই বালিকা বিদ্যালয়গুলির উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে)। এগুলো স্থাপিত হওয়ার পূর্বে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত আরও দু'-একটি বালিকা বিদ্যালয়ের কথা জানা যায়। যেমন ১৭৬০ সালে স্থাপিত "হেজ" — এর বালিকা বিদ্যালয়। সম্ভবত তদানীন্তন বাংলাদেশে এটি প্রথম বালিকা বিদ্যালয়। এরপর ১৭৬৮ সালে শ্রীমতী বোল্ট নামে আর এক বিদেশী মহিলাও একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। শ্রীমতী ডুরেলের 'সেমিনারী' স্থাপিত হয় ১৭৭৯ সালে।[১] ১৮১৮ সালে চুঁচুড়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় রেভারেন্ড মে'র বালিকা বিদ্যালয়। রেভাঃ মে প্রতিষ্ঠিত এই বালিকা বিদ্যালয়টি স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে এক ব্যাপক উদ্যমের সূচনা করে। ১৮১৯ সালে কেরী সাহেব শ্রীরামপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮২০ সালে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, Calcutta Female Juveniles Society প্রায় দশটি বালিকা বিদ্যালয় চালাচ্ছেন। এইসব বিদ্যালয়ে লেখা পড়া, প্রাথমিক গণিত, ইতিহাস, ভূগোল এবং সূচীকর্মকেও পাঠ্যক্রমে গ্রহণ করা হয়। ১৮২৪ সালে গঠিত Ladies' Society for Native Female Education-এর মারফত পরোক্ষে কিছু সরকারী সাহায্যও আসে।[২]

একদিকে নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য যেমন চলছিল মিশনারি প্রয়াস, অপরদিকে তেমনি ভারতীয় তথা বাঙালী মণীষাও এব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। রাজা রামমোহন "প্রবর্তক-নিবর্তক সম্বাদ" (১৮১৮-'১৯) পুস্তিকায় স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার স্বপক্ষে তাঁর মতামত প্রকাশ করেন। সমাজে মেয়েদের প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি তা তিনি বুঝেছিলেন গভীরভাবে। তিনি লিখেছেন, "………. স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন ? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়ঃ আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন ?"[৩] রামমোহনের উত্তরসুরি, 'ইয়ং বেঙ্গল' রাও নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উচ্চকণ্ঠে বলছিলেন এবং তা নিয়ে সরব প্রচারেও নেমেছিলেন। এ সম্পর্কে সে যুগের প্রসিদ্ধ ইয়ং বেঙ্গল রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৪০ সালে বরোদার ক্যাপ্টেন জেমসন "দেশীয় মহিলাদের শিক্ষা"র

উপর সর্বোৎকৃষ্ট রচনার জন্য দুশো টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। কৃষ্ণমোহনের রচনাটি (Native Female Education) সর্বোৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয় এবং তিনি দুশো টাকা পুরস্কার পান।[৪] ১৮৪২ সালে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন প্রসিদ্ধ ইয়ং বেঙ্গল রামগোপাল ঘোষ। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক পুরস্কার পান যথাক্রমে মধুসূদন দত্ত ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়।[৫] বারাসতের প্যারীচরণ সরকার, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ইয়ং বেঙ্গল নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। ইয়ং বেঙ্গলের প্রতিনিধিরা পশ্চিমী শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়ে স্ত্রী শিক্ষার প্রকৃত সামাজিক তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন, এবং তাঁরা স্ত্রী শিক্ষা প্রসার প্রচেষ্টাকে সামাজিক আন্দোলনের রূপ দেন (অবশ্য শুধুই পত্র-পত্রিকায় লেখা-লেখির মাধ্যমে)।

নব্য বঙ্গের অগ্রপথিক রামমোহন চেয়েছিলেন নারী শিক্ষার বিস্তার, নারীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা, নারী নির্যাতন রোধ, নারী মুক্তি। তাঁর উত্তরসুরিগণও তাই বলতে চেয়েছিলেন নব্যতর পশ্চিমী আধুনিকতার পথে। পাশাপাশি আর একটি স্রোতও প্রবাহিত হচ্ছিল, সেই সময়ের বাংলাদেশের সামাজিক ক্ষেত্রে। স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে কোন পথ অবলম্বন করা হবে-তাই নিয়ে চলছিল পারস্পরিক মতবিরোধ। তদানীন্তন বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল উপর তলাতেও স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপলব্ধি ঘটছিল। এই রক্ষণশীল দলের নেতা ছিলেন শোভা বাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর। রাজা রাধাকান্তদেব স্ত্রী শিক্ষার সমর্থক ছিলেন নিঃসন্দেহে, তবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রাচীনপন্থী। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি রাজা রামমোহনের বিরোধিতা করেছেন সতীদাহ প্রথা রোধ করার বিষয়কে কেন্দ্র করে। শুধু তাই নয়, অদ্ভুত স্ববিরোধিতা ছিল রাজা রাধাকান্ত দেবের মধ্যে। একদিকে যেমন তিনি চিকিৎসা বিদ্যা শেখার জন্য হিন্দু ছাত্রদের শবব্যবচ্ছেদ করা সমর্থন করেছেন, উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ড যাত্রা সমর্থন করেছেন অর্থ সাহায্য করে, মাতৃভাষার মাধ্যমে কৃষি ও শিল্প বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "যে শিক্ষা পদ্ধতি হাল কুড়াল ও তাঁত থেকে যুব শক্তিকে সরিয়ে কেবল কেরানি সৃষ্টি করে, তা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী"।[৬] সেই রাধাকান্ত দেবই আবার সতীদাহ প্রথা রোধ করার বিরুদ্ধে সমাজে আন্দোলন তুলে সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। সহস্রাধিক স্বাক্ষর সম্বলিত প্রতিবাদপত্র ইংল্যান্ডের রাজদরবারে পাঠিয়েছেন, বহু বিবাহ প্রথা নিরোধক আন্দোলনের সক্রিয় বিরোধিতা করে বহু বিবাহ প্রথা আইন করে যাতে বন্ধ না করা হয় সেজন্য সরকারের কাছে আবেদনপত্র পাঠিয়েছেন। এ বিষয়ে —

"Rajah Radhakanto Deb Bahadur K.C.S.I – Brife account of his life and character" (Edited by his son Rajah Rajendra Narayan Deb Bahadur).

গ্রন্থে বলা হয়েছে —

"though naturally a humaneman, his humanity was cramped by a mistaken perjuduice for the institution of "suttee", when lord Bentinck passed his celcbrated edict for the abolition of the revolting rite, Radhakanto moved the "Dharma Shabha" to petition Her Majestys Govt. at Home for the repeal of the same .... great was his astonishement, greater still his indignation, when, on examining the provisions of the law, he found that native christian converts, always his 'tetenoir', were entitled to succeed to their inheritance when their fathers died intestate. He went up to her Majesty's govt. for its abrogation .... in 1856, the Association of Friends for the Promotion of social improvement submitted to the legislative councial a well-reasoned petition for the enactement of a law for the suppression of the evils of polygamy. Radhakanto Deb thought it proper to head a counter movement, and get up a counter petition. When he took action in these matters, he no doubt belived that he was acting according to the dictates of his own conscience, but was in reality exercising a retrogressive influence on society".

এই স্ববিরোধিতার জন্য স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের একজন প্রধান সমর্থক হয়েও তিনি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে স্ত্রী শিক্ষার উপযোগিতাকে স্বীকার করতে পারেননি। আমাদের দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে গৃহ শিক্ষার গণ্ডীর মধ্যে নীতিগত ভাবে তিনি স্ত্রী শিক্ষাকে সমর্থন করেছেন। প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে মেয়েদের পঠন-পাঠনের বিরোধী ছিলেন তিনি। তাঁর শোভাবাজার রাজবাটীতে স্কুল সোসাইটির ছাত্রদের যে বার্ষিক ও ত্রৈমাসিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো, তাতে ছাত্রদের সঙ্গে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির ছাত্রীরাও পরীক্ষা দিতে আসতো এবং ছাত্রদের মতো তাদেরও গুণানুসারে পারিতোষিক দেওয়া হতো। [৮] বেথুন সাহেবকে লেখা একটি চিঠিতে রাধাকান্ত দেব স্ত্রী শিক্ষার জন্য ত্রিশ বৎসর যাবৎ তিনি যা করেছেন তার এক ধারাবাহিক বিবরণ দেন। সেই চিঠিতে তিনি আরও লেখেন যে "বর্তমানে আপনি যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হয়েছেন, আমি এতকাল উপদেশ ও নিজের কাজের দ্বারা দেশবাসীকে জানাতে চেয়েছি যে, আমি স্ত্রী শিক্ষার একজন প্রধান সমর্থক। জাতির নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক সুখ বৃদ্ধির পক্ষে স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক তাহা এখন আর ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে হইবে না। .... ১৮১৯ সালে আমি পাদ্রী পিয়ার্সকে লিখে জানিয়েছিলাম যে, বিবাহের আগে মেয়েদের আমরা ঘরেই বাংলা লেখা পড়া শেখাই, তাই কোন সভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা বাইরের বিদ্যালয়ে লেখা-পড়া করতে যাবে না। এরপর আমি বরাবরই একথা বলে এসেছি। নীতির দিক থেকে স্ত্রী শিক্ষার বিরোধিতা আমি করিনি। তবে প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয়ের সার্থকতা সম্বন্ধে আমার মনে আগা গোড়াই সন্দেহ ছিল।"[৯] বেথুন সাহেব যখন 'ফিমেল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন, ঠিক তার পনেরো দিন পরে রাধাকান্ত দেব তাঁর নিজের রাজবাটীতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[১০]

১৮৪৯ সালে কলকাতা শহরে বেথুন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দু'বছর আগে ১৮৪৭ সালে বাংলাদেশের স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে আর একটি বিশেষ

ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। সেই যুগান্তকারী বিশেষ ঘটনাটি হলো বারাসতে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। বিশেষভাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় উদ্যোগী হয়ে প্যারীচরণ সরকার মহাশয় ও কালীকৃষ্ণ মিত্র বারাসতে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। অবশ্য সেজন্য তাঁদের যথেষ্ট বিরোধিতারও মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

১৮৪৭ সালে প্যারীচরণ সরকার স্থানীয় মানুষ কালীকৃষ্ণ মিত্র ও তদীয় ভ্রাতা ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ মিত্রের সহায়তায় বারাসতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ সময়ে বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ কোন আয়োজনই ছিল না। স্কুল বুক সোসাইটি বা ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি যে বালিকা বিদ্যালয়গুলি স্থাপন করেছিলেন (পূর্বে এগুলি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সেগুলি খুব বেশি সাফল্য লাভ করেনি। সংস্কার বিরোধী হিন্দু সমাজ খোলা মনে ঐসব মিশনারি পরিচালিত বালিকা শিক্ষালয়গুলিকে মেনে নিতে পারেনি। কারণ ঐ বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিদেশী সাহেবদের প্রেরণায় এবং ঐ বিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারও ছিল তাদের একটা উদ্দেশ্য। সুতরাং সাধারণ জনমানসে এগুলি সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে বালিকা বিদ্যালয়গুলির কোনটিই বেশি দিন স্থায়ী হতে পারেনি। সুতরাং বারাসতের বালিকা বিদ্যালয়টিকেই বঙ্গবাসীর উদ্যোগে বাংলাদেশের প্রথম বালিকা বিদ্যালয় বলা যায় — যে বিদ্যালয় বালিকাদের সাধারণ শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সম্পূর্ণ বেসরকারী স্থানীয় মানুষের উদ্যমে।

বারাসত ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাহেবদের বিশ্রাম কেন্দ্র একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বিদ্যালয়টি প্রথমে তিনজন মাত্র ছাত্রী নিয়ে খোলা হয়। নবীনকৃষ্ণের কন্যা কুন্তী বালা (প্রকৃত নাম স্বর্ণলতা) ছিলেন ঐ প্রথম তিনজন ছাত্রীর অন্যতমা। সে যুগে মেয়েদের শিক্ষালাভের বিষয়ে সামাজিক কুসংস্কার অত্যন্ত প্রবল ছিল। দু'বছর পরে কলকাতায় বেথুন সাহেব যখন তাঁর বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন সেই সময় শহরের রক্ষণশীল মহলে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। গুপ্ত কবি ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর 'সংবাদ প্রভাকরে' এ সম্পর্কে ব্যঙ্গকরে কবিতা লেখেন,

"যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ী মেরে কেতাব হাতে নিচ্চে যবে,

এ বি শিখে, বিবি সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে ;

আর কিছু দিন থাকরে ভাই। পাবেই পাবে দেখতে পাবে, আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।"

"রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজে' শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়তি যত্নতঃ" — মহানির্বানতন্ত্রের এই বচনালঙ্কৃত নব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের গাড়ি যখন রাজপথে বাহির হইত, তখন লোকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিত ও নানা কথা কহিত, তখন লোকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিত ও নানা কথা কহিত, এবং সুকুমার মতি শিশু বালিকাদিগের উদ্দেশ্যে কত অভদ্র কথাই কহিত।"[১১] সুতরাং কলকাতার মতো জায়গায় যেখানে অধিক সংখ্যক আধুনিক পশ্চিমী শিক্ষায়

শিক্ষিতমানুষের বাস, ভারতের সেই রাজধানী শহরেই যখন স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের বিরুদ্ধে জনমত এত প্রবল ছিল, সেখানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অধ্যুষিত বারাসতে আরও দু'বছর আগে ঐ 'দেশাচার বিরুদ্ধ' (বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা) কাজের জন্য কতখানি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছিল তা' সহজেই অনুমেয়। প্যারীচরণ, কালীকৃষ্ণ, নবীনকৃষ্ণ এবং ঐ বালিকা বিদ্যালয়ের অন্যান্য শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিদের বারাসতে সমাজচ্যুত হতে হয়েছিল। এমনকি বারাসত বিদ্যালয়ের তৎকালীন দ্বিতীয় শিক্ষক হরিদাসবাবুও প্রধান শিক্ষক প্যারীচরণের বিপক্ষ দলে যোগ দিয়েছিলেন। স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে কুসংস্কার এত প্রবল ছিল যে জনৈক সভ্রান্ত ইংরাজ কর্মচারী সস্ত্রীক ঐ বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনে এসে একটি দুগ্ধপোষ্য বালিকার চিবুকে হাত দিয়ে আদর করতে জাতিনাশের আশঙ্কায় বারাসতবাসীরা 'ঘোটমঙ্গল' বসিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় প্যারীচরণ ও তাঁর সুহৃদবর্গকে দেশাচার ও হিন্দুধর্ম বিরোধী সিদ্ধান্ত করে স্থানীয় এক জমিদার ডাকাত দিয়ে তাঁদের হত্যা করার চেষ্টা পর্যন্ত করেছিলেন। তাঁদের হত্যা করার জন্য পুরস্কার পর্যন্ত ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্যারীচরণ ও তাঁর বন্ধুদের নিবৃত্ত করা যায়নি। কালীকৃষ্ণ মিত্র নিজে পড়াতেন। উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা বিদ্যালয় পরিচালকদের নানাভাবে উৎসাহ দিতেন। ক্রমে ঐ বালিকা বিদ্যালয় বারাসতের জনমানসে সহানুভূতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার জেমস কলভিন ও বড়লাটের মন্ত্রণা সভার আইন সদস্য স্যার এডওয়ার্ড রায়ান ঐ বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে যেতেন এবং ছাত্রীদের পারিতোষিক দান করতেন। বেথুন সাহেব ছিলেন প্যারীচরণ সরকার ও কালীকৃষ্ণ মিত্রের বিশেষ বন্ধু। তিনি প্রায়ই বারাসতের ঐ বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনে যেতেন। ১৮৪৯ সালে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি সরকারের' এডুকেশন বোর্ডের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। ট্রেভর সাহেবের ফ্রি স্কুল ও বালিকা বিদ্যালয়-উভয়ের ব্যয় নির্বাহ করা তাঁদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। ব্যয় নির্বাহ করতেন স্থানীয় জনসাধারণ। ফলে বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতি ঠিক মতো করা সম্ভব হচ্ছিল না। সুতরাং সমিতি আবেদন করেন যে, সরকার যদি ঐ ফ্রি স্কুলটির ৬০ জন ছাত্রকে বিনা বেতনে সরকারী বিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ দেন, ফ্রি স্কুল বন্ধ করে বালিকা বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নতিতে কর্তৃপক্ষ মনোযোগ দিতে পারেন। আবেদন মঞ্জুর করে সরকার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কেবল উৎসাহিত করেননি, দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও এই জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগ্রহ প্রকাশ করেন। বারাসতের দৃষ্টান্তে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নিবাধই দত্তপুকুর, বাঁশবেড়িয়া প্রভৃতি নিকটবর্তী অঞ্চলে।[১২] এ সম্পর্কে ১৮৪৯-৫০ সালে ডি. পি. আই. রিপোর্টে বলা হয়, "Female Education : In connection with this subject the Council have much gratification in placing on record the fact that a Native Female School has been established at Baraset by certain educated and philanthropic gentlemen of the district. The circumstances which organised it are so creditable to the parties concerned as in the opinion of council, it merits being published for general

information. "A Female school was thereupon founded and organised under the management of Babu Kalikrishna Mittra, Babu Caliprosad Banerjea, Babu Peary Charan Sircar, Babu Kedarnath Mukherjea, Babu Sookmoy Banerjea, Babu Nabin Chandra Mittra, Babu Greesh Chandra Roy, Babu Doorga Charan Chatterjea. "Although the committee has met with much opposition as might have been expected the Council believe that the School is gradually becoming fixed on a solid basis and that it will prove a great blessing to the inhabitants of Baraset and the adjoing villages." The council have been informed that similar Schools have been formed at Neebodhia, Bansbaria, and some other villages, but no official communication has been yet made to the council by the managers of them.

"Much caution, temper, forbearance and prodence are necessary in conduct of such institutions, and the council trust that the example set by these gentlemen noted above will shortly be followed by their educated brethren in other places." (Report on public Instruction, Bengal for 1849-1850 pages4-5)

"অনেকে বলেন যে বারাসতের বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া এবং ইহার পরিচালকগণের সংস্পর্শে আসিযাই মহানুভব বীটন সাহেবের মনে কলিকাতায় তাঁহার চিরস্মরণীয় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিবার বাসনা উদ্দীপিত হয়।"[১৩]

বারাসত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চাকরি ছেড়ে দিয়ে বারাসত থেকে প্যারীচরণ সরকার মহাশয় চলে আসার পর তাঁর বন্ধুরা কয়েক বছর ঐ বালিকা বিদ্যালযটি পরিচালনা করেন। বিদ্যালয়টি বসতো কালীকৃষ্ণ মিত্রের বাটীতে তারপর সম্ভবত এ বিষয়ে উপযুক্ত উদ্যমের অভাবেই বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যায়। অনেক পরে আবার বারাসতবাসীদের উৎসাহে যে বালিকা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় সেটি বসতো স্থানীয় 'ট্রেভর হলে।' এটিই বর্তমান কালীকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়। ১৮৭৯ সনে বারাসত অ্যাসোসিয়েশন বিদ্যালয়টির পরিচালন ভার গ্রহণ করে। ক্রমশ বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থান সঙ্কুলান করা কঠিন হয়ে পড়ে। তখন অ্যাসোসিয়েশন বর্তমান বিদ্যালয় ভবনের জমিটি দান করে। বিদ্যালয়ের জন্য আলাদা কমিটি গঠিত হলেও, অ্যাসোসিয়েশনের মনোনীত সদস্যের স্থায়ী পদ নির্দিষ্ট করা আছে। প্রাথমিক বিভাগটি অবশ্য এখনও ট্রেভর হলে বসে। অ্যাসোসিয়েশনের পুরনো ভবনটি ভগ্ন প্রায় হওয়ায় ১৯৩৪ সালে জেলা শাসক নবগোপাল দাসের চেষ্টায় সংস্কার করা হয়।[১৪]

"Women's education in Eastern India" গ্রন্থে বারাসতের এই বালিকা বিদ্যালয়টি সম্বন্ধে যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন — "The Barasat Girl's School was remodelled on the pattern of the Bethune School and some new girl's School were started at Neebudhia Sooksagar and Uttarpara. But there were local oppositions. Some people of Barasat even put the organisers of the Barasat School to indignities. The mischief mongers took advantage of this fact and construct it as governmental antipathy to them."[১৫] ব্রাহ্ম

ধারা পুষ্ট আধুনিক যুগের মানুষ কালীকৃষ্ণ দত্ত নিবাধই গ্রামে ১৮৪৮ সনে বারাসত বালিকা বিদ্যালয়ের দৃষ্টান্তে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কালীকৃষ্ণ দত্তের আহ্বানে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় একাধিকবার ঐ বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনে এসেছিলেন।[১৬]

শিবনাথ শাস্ত্রীর পিতা কলকাতার সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন। তাঁদের প্রভাবে শিবনাথ শাস্ত্রীর পিতা উদার মতাবলম্বী হয়েছিলেন। তিনি শাস্ত্রী মহাশয়ের জননীকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, ফলে সেই সময়ের তুলনায় গোলোকমণি দেবী (শিবনাথ শাস্ত্রীর জননী) অনেক লেখাপড়া জানতেন এবং শৈশবে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর মায়ের কাছেই পাঠশালার পড়া তৈরি করতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সংস্পর্শে এসে শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতার মনে স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছিল। সেজন্য ছুটিতে বাড়ি এলেই শিবনাথের মাতার শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত হতেন। ছুটির শেষে কলেজে ফিরে যাবার সময় তাঁকে পড়ার জন্য বই দিয়ে যেতেন ও শিবনাথ জননী উৎসাহ সহকাবে সেগুলি পড়তেন। বিনা সাহায্যে যতদূর পারতেন নিজে নিজে পড়তেন, কখনো কখনো পাড়ার ছেলেদের ডেকে সন্দেহভঞ্জন করে নিতেন। স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য শিবনাথ শাস্ত্রীর পিতাকে জ্ঞাতি বর্গের কাছে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল।[১৭] শুধু তাই নয়, গ্রামে যখন ব্রাহ্ম যুবকগণ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের ভগিনীরা সেই বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন করতে থাকেন। কিন্তু গ্রামের ব্রাহ্ম বিদ্বেষী জমিদার বাবুরা বাড়ি বাড়ি লোক পাঠিয়ে বালিকা বিদ্যালযে মেয়ে পাঠাতে নিষেধ করেন। মেয়ে পাঠালে এক ঘরে করার হুমকিও দিয়েছিলেন। জমিদারের নিষেধ অন্যেরা শুনলেও শাস্ত্রী মহাশয়ের মাতা-পিতা শুনলেন না। বিদ্যাসাগরের আদর্শ-অনুসারী হরানন্দ ভট্টাচার্য (শিবনাথ পিতা) জমিদারের আদেশে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, "কি এত বড় আস্পর্ধার কথা? আমার ছেলে মেয়ে পড়াব কিনা, তার হুকুম অন্যে দিবে?' যদি কাহারও মেয়ে স্কুলে না যায়, 'আমার মেয়ে যাবে?' দেখি কে কি করে!" এই বলে তিনি মেয়েদের নিয়ে স্কুলে গিয়ে পণ্ডিতকে বললেন, "কেবল আমার মেয়ে আসবে ও তুমি আসবে, স্কুল একদিনের জন্যও বন্ধ করো না!" বাস্তবিক কিছুদিন শাস্ত্রী মহাশয়ের ভগিনীদ্বয় ও পণ্ডিত মহাশয়কে নিয়ে বালিকা বিদ্যালয়টি চলেছিল।[১৮]

সুতরাং সেই সময়ে বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থীগণ স্ব স্ব পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। চরম রক্ষণশীল গোষ্ঠী সনাতন পন্থায় স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করার সাথে সাথে চরম উদারপন্থীদের কঠোর সমালোচনা যেমন করতে লাগলেন, তেমনি তাঁদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের পাঠানোরও বিরোধিতা করতে লাগলেন। আবার উদারপন্থীরাও নিরস্ত না হয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে নেমে পড়লেন। অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত 'বিদ্যাদর্শন'

পত্রিকা স্ত্রী শিক্ষার উদ্দেশ্যে সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করতে আহ্বান জানাতে লাগলেন।

"বিদ্যাদর্শন লিখেছেন, "আমরা সকল উপায়াপেক্ষা এ বিষয়ের জন্য একতার প্রতিই অধিক নির্ভর করিতে পারি এবং স্ত্রী বিদ্যার উন্নতিকল্পে দেশহিতৈষী জনসমূহের যুক্ত সাহায্য ভিন্ন অন্য কিছুই শুভকর বোধ করি না, অতএব আমরা একান্তরূপে অনুরোধ করিতেছি দয়াশীল মহাশয়ের। ঐক্য বাক্যে একত্র হইয়া এতদ্দেশীয় স্ত্রী বিদ্যার উন্নতি নিমিত্ত একটি সভা স্থাপন করুন, এবং দৃঢ়রূপে তৎ সমাজের কার্যবিষয় মনোযোগী হউন"।[৯] এই পটভূমিতেই আবির্ভূত হলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর— সেদিনের বাংলাদেশের প্রাচীন জীবনবোধের সঙ্গে আধুনিক জীবনবোধের সমন্বয় সেতুরূপে। বাংলাদেশের সমাজ জীবন তখন রীতিমত আন্দোলিত হচ্ছে। রাজা রামমোহনের সতীদাহ নিরোধক বিল পাস হয়ে গেছে। বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, বহু বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক বিষয়গুলো নিয়ে উদারপন্থী মহলে আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে, আর তাই নিয়ে বাঙালীর অন্তঃপুরে উঠেছে প্রচণ্ড আলোড়ন। এইসব আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন রামমোহনের উত্তরসুরিবৃন্দ। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর এই আন্দোলনে শামিল হন।

তদানীন্তন বাংলাদেশে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, ব্যাপকতা, পদ্ধতি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেমন হবে তা নিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন। তিনি বুঝেছিলেন মেয়েদের শিক্ষা না দিলে তাদের মুক্তি ঘটবে না। অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে থেকে সেদিনের বাঙালী নারী সমাজ আপন ব্যক্তিসত্তা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিল। অজ্ঞানতার অন্ধকারে তাদের দৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল রুদ্ধ। নারীই হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল নারীর সবচাইতে বড় শত্রু। এর প্রমাণ পাওয়া যায় সেদিনের পটভূমিকায় রচিত এ কালের বিভিন্ন সাহিত্য কৃতিতে। উদাহরণস্বরূপ আশাপূর্ণ দেবী রচিত "প্রথম প্রতিশ্রুতি" উপন্যাসের উল্লেখ বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। উপন্যাসের নায়িকা সত্যবতী নিজের চেষ্টায় লিখতে পড়তে শিখেছিল বলে বাড়ির মেয়েদের কাছে তাকে কম হেনস্তা ভোগ করতে হয়নি। এই অজ্ঞানতার তামস থেকে জ্ঞানের আলোয় যে নারী সমাজের উত্তরণ ঘটাতে হবে—এ সত্য সমগ্র অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন বিদ্যাসগর মহাশয়। আপন অন্তরের এই সত্য উপলব্ধিকে বাস্তবায়িত করার জন্য সেদিনের বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর চিন্তাধারা এবং সনাতন পন্থী চিন্তাধারার সঙ্গে সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন। ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান সমাজ শুধু নয়, সনাতনপন্থী হিন্দু সমাজকেও তিনি স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের বিস্তৃত ক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করার জন্য নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। আসন্ন নবযুগের পদধ্বনি যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর শুনতে পেয়েছিলেন বলেই নারী শিক্ষাকে গৃহ— পরিবেশে আবদ্ধ রাখলে যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চেতনার সমৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হবে মেয়েরা—এই বাস্তব সত্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। সেই সঙ্গে এও বুঝেছিলেন যে, নারী শিক্ষাকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখলে শিক্ষার স্বাভাবিক যুগোপযোগী গতি স্রোত অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে, সর্বসাধারণের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়বে

না। বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন পরিবারের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠবে বিভিন্ন রুচির শিক্ষার এক বিশৃঙ্খলধারা, —শিক্ষা হবে অসম্পূর্ণ। তাই তিনি নারীশিক্ষাকে অন্তঃপুরের গণ্ডী থেকে সাধারণের মধ্যে টেনে আনার প্রচেষ্টা করেছিলেন, নারী শিক্ষাকে একটা সুসংগঠিত রূপ দিতে চেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত রাজা রাধাকান্তদেবের উল্লেখ আবারও করা যায়। রাধাকান্তদেব মেয়েদের অন্তঃপুরের মধ্যেই শিক্ষালাভের কথা বলেছিলেন। বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার কয়েক দিনের মধ্যেই নিজ বাটীতে তিনি একটা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এ সম্পর্কে "সম্বাদ ভাস্কর" লেখেন, "কলিকাতা নগরে বালিকাদের শিক্ষার নিমিত্ত দ্বিতীয় বিদ্যালয়। আমরা শ্রবণ করিলাম শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুর তাঁহার বাটীতে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার্থে এক পাঠশালা সংস্থাপন করিয়াছেন। সংস্কৃত কলেজের একজন ছাত্র ভদ্র বালিকাগণকে ইংরাজী, বাংলা উভয় ভাষায় শিক্ষাদান করিতেছেন।[১০]

অগ্রগামী ব্রাহ্ম নেতা কেশব সেন স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের জন্য মেয়েদের মহিলা শিক্ষিকার সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার কথা বলেছিলেন ; এজন্য তিনি অন্তঃপুর শিক্ষা প্রণালীর কর্মসূচী গ্রহণ করেন।[১১] কেশব সেন মহাশয় স্ত্রী শিক্ষার সমর্থক হয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি অনুযায়ী মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার বিরোধী ছিলেন। জ্যামিতি, লজিক, মেটাফিজিস্ক ইত্যাদি বিষয়গুলি মেয়েদের শিক্ষা—পাঠ্যক্রমে রেখে বা তাদের পড়িয়ে কোনো লাভ নেই বলে তিনি মনে করতেন।[১২]

মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে সেই সময় এই ধরনের বিভিন্নমুখী সংস্কার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। পর্দাপ্রথা, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, স্ত্রী শিক্ষা বৈধব্যের কারণ বলে বিশ্বাস—ইত্যাদি নানা কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল সেদিনের বাঙালী সমাজ। সেই সময়ে বাংলাদেশে তিনটি সামাজিক শক্তি কাজ করছিল, একটি সনাতন পন্থা, দ্বিতীয়টি উগ্র আধুনিকতাবাদ, এবং তৃতীয়টি হলো প্রাচীন পন্থা ও উগ্র আধুনিকতার মধ্যবর্তী একটি শক্তি। এই তিনটি শক্তির সঙ্গে কখনো সহযোগিতা, কখনো বা বিরোধিতার মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরকে অগ্রসর হতে হয়েছে। সহযোগিতা এবং বিরোধিতা, গ্রহণ এবং বর্জন—এই নীতি অবলম্বন করেই তিনি নিজের চলার পথ তৈরি করেছেন।

বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েই দেখেছিলেন সামাজিক প্রতিবন্ধকতার বিস্তৃতি কতখানি। বিধবাবিবাহকে শাস্ত্রানুমোদিত প্রমাণ করার চেষ্টা করা মাত্র সমগ্র বাংলাদেশে বিরোধিতার আগুন জ্বলে ওঠে। এই অগ্নিগর্ভ পরিবেশেই তিনি বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হলেন। সেই সময় স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যে কয়েকটি প্রধান অন্তরায় ছিল সেগুলি সম্পর্কে ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত "সোমপ্রকাশ" পত্রিকার একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয়েছে : 'স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত এখন অনেক কৃত বিদ্য ব্যক্তি যত্ন পাইতেছেন, কিন্তু যে কয়েকটি প্রতিবন্ধক থাকাতে তাঁহারা আশানুরূপ ফললাভে কৃতকার্য হইতে পারিতেছেন না তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে'—

১। এদেশের পুরুষেরা অদ্যাপিও ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই। সুতরাং যাঁহারা এদেশীয় অবলাগণের হর্তা-কর্তা বিধাতা তাঁহারা যখন স্বয়ংসিদ্ধ হইতে পারিলেন না, তখন অন্যকে কেমন করিয়া সিদ্ধ করিবেন?

২। বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকাতে বালিকারা অধিকদিন বিদ্যালয়ে থাকিযা শিক্ষা পায় না। সুতরাং অল্প বিদ্যা সবিশেষে ফলোপধায়িনী হয় না।

৩। অল্প বেতনের লোক দ্বারা শিক্ষা কার্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় না, দুর্ভাগ্য বালিকাগণের অদৃষ্টে প্রায় তাহাই ঘটিয়া উঠে। ইহা সামান্য প্রতিবন্ধক নয়।

৪। অল্প মাত্র শিখিতে শিখিতে বালিকাদিগকে শ্বশুরালয়ে গমন করিতে হয়। সেখানে গিয়া গৃহকর্মে এমনি ব্যাপৃত হইতে হয় যে, পূর্বে যে কিছু শিক্ষালাভ হয় তাহা বিস্মৃতি সাগরে মগ্ন হইয়া যায়। বিশেষতঃ এদেশে জাত্যাভিমান ও বিবাহ প্রণালীগত দোষ থাকাতে প্রায় অনেকেই উপযুক্ত পাত্রের হস্তগত হয় না, সুতরাং তৎকালে আলোচনার অভাবে তাহার বিবাহের পূর্বে যে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা হয়, তাহা বৃথা হইয়া যায়।

৫। অনেকে ইউরোপীয় স্ত্রীগণকে বিদ্যাবতী দেখিয়া এ দেশীয় স্ত্রীগণের প্রতি ঘৃণা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাদিগের ইহা মনে করা উচিত ··· সমাজেরগুণে অনেক বিষয়ে সুবিধা আছে, এখানে সে সকল সুবিধা নাই, জাত্যভিমান প্রবল থাকাতে সেসকল সুবিধা হইবারও অনেক বিলম্ব আছে। এক্ষণে যাঁহারা বালিকাদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা সমবেত হইয়া ক্রমে ক্রমে পূর্বোক্ত কয়েকটি প্রতিবন্ধকের উন্মুলনের উপায় অনুসন্ধান করুন।[২৩]

"সোম প্রকাশ" পত্রিকায় প্রকাশিত স্ত্রী শিক্ষা ক্ষেত্রের এই পাঁচটি অন্তরায়ের মধ্যে দ্বিতীয় অর্থাৎ বাল্য বিবাহ এবং চতুর্থটি অর্থাৎ শৈশবে শেখা বিদ্যা বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে মেয়েরা চর্চার অভাবে ভুলে যায়, জাতিভেদ (বর্ণভেদ) প্রথার জন্য সাধারণত উপযুক্ত পাত্রে মেয়েদের বিবাহ হয় না, সুতরাং বিবাহের আগে তাদের যেটুকু শিক্ষা হয় তা 'বৃথা হয়ে যায়, এই দুটিকে প্রবল সামাজিক অন্তরায় বলে চিহ্নিত করা যায়। বস্তুত বাল্য বিবাহ এবং জাতিভেদ (বর্ণভেদ) প্রথা স্ত্রী শিক্ষার অগ্রগতিব পথে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে সময়ে বাংলাদেশের বহু শিক্ষিত মানুষও যাঁরা পশ্চিমী শিক্ষার আলোকে নিজেদের আলোকিত বলে মনে করতেন, তাঁদের মধ্যেও অনেকে মেয়েদের প্রকাশ্যভাবে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে শিক্ষালাভের বিরোধী ছিলেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন কাশীপ্রসাদ ঘোষ। তিনি তাঁর "হিন্দু ইন্টেলিজেন্সিয়া" নামক ইংরাজী পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষার প্রসার আন্দোলনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে প্রবন্ধ লেখেন।[২৪] অপরদিকে রক্ষণশীল গোষ্ঠীর নেতা রাজা রাধাকান্ত দেবও প্রকাশ্যভাবে বিদ্যালয়ে উপস্থিতির মাধ্যমে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের সমর্থক ছিলেন না। সেই সময়ের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাও স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে অথবা বিপক্ষে যোগ দিয়ে এ প্রসঙ্গে নানাজনের নানা মতামত প্রকাশ করতে থাকে। ১২৩৮ সালের ১২ই আষাঢ় (২৫ জুন, ১৮৩১) স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের বিরুদ্ধে

'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। (প্রয়োজনবোধে সেটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো)— "স্ত্রী লোকের লেখাপড়া করওনোর প্রয়োজন কি ? যদি বল তাহারদের লিখন পঠন শিক্ষা বিনা কি তাবৎ জ্ঞান জন্মিতে পারে না। উত্তর। সে প্রকৃত বটে কিন্তু এমনি কোন পুং বর্জিত দেশ বিশ্ব নির্মাতা নির্মাণ করেন নাই যে যেখানে পাটোয়ারিগিরি ও মুহুরিগিরি ও নাজীরী ও জমিদারী ও জমাদারী ও আমীরী নারী বিনা সম্পন্ন না হওনের সম্ভাবনা হয় ... তবে যদি নারীর দিগকে সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাস করান যায় তবে এই প্রয়াস ফলবান হইতে পারে। কিন্তু সে অতি দুর্ঘট যেহেতুক ব্যাকরণ ও কাব্যলঙ্কার ও সাংখ্য পাতঞ্জলাদি ষড়দর্শন যাহা প্রায় ইদানীন্তন পুরুষের অসাধ্য তাহা যে স্ত্রীর বাধ্য হইবেক ইহা বোধ্য হয় না। সমাচার দর্পণ-২৩ জুলাই, ১৮৩১ (৮ শ্রাবণ, ১২৩৮) ; স্ত্রী বিদ্যাভাস। চন্দ্রিকা ও প্রভাকর—"বিশেষত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় লেখেন যে মনুষ্য হইয়া অর্ধাঙ্গ স্ত্রীকে যে পশুভাবে রাখা এ কোন্ ধর্ম। উত্তর ইহাই তাবদ্ বিশিষ্ট হিন্দু জাতির কুলধর্ম তবে যে বিবাহিতা স্ত্রীকে পশুভাব হইতে মোচন করা সে কেবল বীর ভাবাপন্ন বাবুদিগের কর্ম। অপর লেখেন যে এখনকার রানী ভবানী, হঠি বিদ্যালঙ্কার, শ্যামাসুন্দরী ব্রাহ্মণী ইহারাও দর্শন বিদ্যাতে অতি সুখ্যাতি পাইয়াছেন। উত্তর — শ্রুতি স্মৃতিও দর্শন অধ্যয়নে স্ত্রী জাতির আদৌ অধিকার নাই"। ...

স্ত্রী শিক্ষার পক্ষেও যেসব লেখা প্রকাশিত হয় সেগুলিও কিছু অংশ প্রয়োজনবোধে উদ্ধৃত করা হলো : সমাচার দর্পণ (২০ আগস্ট ১৮৩১, ৫ ভাদ্র, ১২৩৮) : ... "প্রথমত চন্দ্রিকা প্রকাশক যে উত্তর লিখিয়াছেন তাহাতে কোনো প্রামাণিকী কথা না লিখিয়া কেবল সহস্র বৎসর পর্যন্ত উপদেশ করিলেও হিন্দুরা স্ত্রীর দিগকে বিদ্যাভ্যাস করাইবেক না এমত লিখিয়া মহাশয় সহস্র বৎসর জীবিত থাকিয়া প্রার্থনা করুন ইত্যাদি কতকগুলিন রাগান্ধের ন্যায় লিখিয়াছেন সে কথার অনুত্তরই উত্তর। ... প্রভাকর প্রকাশক মহাশয়ও কোনো প্রমাণ না দিয়া কেবল উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় কতকগুলিন বকিয়াছেন অর্থাৎ কেবল আমার দিগের রীতি নাই, করিব না, এইমাত্র আমরা করিব না, বলিলে কে কি করে অপর মহাশয়দ্বয় লেখেন যে রানী ভবানী প্রভৃতি যে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন সে অকর্তব্য কর্ম করিয়াছিলেন এমত বলা যায় হায় বলিহারি যাই উক্ত মহারাণী প্রভৃতির নিকট বুঝি এতদ্রূপ বিবেচক না থাকাতেই এমত অকর্তব্য কর্ম হইয়াছে। ... ... অতএব আমার বুদ্ধিতে হিন্দুর স্ত্রীর দিগকে হিন্দু শাস্ত্রাভ্যাস করণেতে কিছু মাত্র দোষ দেখি না বরং না করানো অনুচিত। ... কস্য চিৎ হিন্দু দর্পণ পাঠকস্য, তাং ২৫ জুলাই মাসস্য।"[২৫]

জ্ঞানান্বেষণ-John Bull, January 4,1832.

"... ... And as to those who say that women receive education they will themselves go to wickedness. Let them consider that in the houses of nearby all respectable people there are dances and songs of which all the women are hearers, whilst in those performances there is not a word of sound instruction, but merely accounts of all the vreminalities of men and

women. Yet the females of noble birth have not been corrupted by hearing such things, and it would be strange if they become adulterous by the acquisitions of beneficial knowledge."

"স্ত্রীলোক দিগের অধিকার-১৬ ডিসেম্বর, ১৮৩৭ (৩, পৌষ, ১২৪৪)" ... যদ্যপি কেহ ইহা কহেন যে স্ত্রীলোকের দিগের পৃথিবীস্থ লোকেদের সহিত আলাপ কুশল না থাকিলে তাঁহারদের অত্যল্প কুকর্ম করিবার সম্ভাবনা হয় কিন্তু আমরা একথায় বিশ্বাস করি না ... কিন্তু যদ্যপি আমরা অনুমান করি যে বিদ্যা দ্বারা মনের দৃঢ়তা ও মতের বিচক্ষণতা এবং ন্যায় অন্যায়ের যথার্থ বোধ জন্মে তদ্বারা আমারদিগের সুখ্যাতি ও অখ্যাতি হয় ইহা জানিয়া শুনিয়া আমরা স্ত্রীলোকের দিগকে এ বিষয়ে বঞ্চিত করিয়া রাখি তবে এজন্য আমরা দোষী আছি। কয়েকজন স্ত্রীলোক আমার দিগের ইতিহাসের মধ্যে আছে যাহারা বিদ্যা দ্বারা দাসত্বাবস্থা হইতে মুক্ত হইয়াছিল। ... আমরা স্পষ্ট কহিতেছি বিদ্যা দ্বারা কখন মন্দ ফল জন্মে না ও ইহাতে কদাচ পরস্পরের বিচ্ছেদ করে না... ।"[২৬]

এই পরিবেশের মধ্যেই ১৮৫৪ সালে উডের দলিল প্রকাশিত হওয়ায় স্ত্রী শিক্ষার পক্ষে কোম্পানির ডিরেক্টরগণ প্রকাশ্যে তাঁদের সমর্থন জানালেন এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিলেন যেন বালিকা বিদ্যালয়গুলিকেও প্রয়োজনীয় সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে ঐ দলিলে বলা হয় :

"The importance of female education in India cannot be over rated; and we have observed with pleasure the evidence which is now afforded of an increased desire on the Part of many of the natives of India to give a good education to their daughters. By this means a far greater proportional impulse is imparted to the educational and moral tone of the people than by the education of men. We have already observed that School for females are included among those to which grant in aid may be given; and we cannot refrain from expressing our cordial sympathy with the efforts which are being made in this direction. Our governor general in Council has declared in a communication to the govt. of Bengal, that the govt. ought to give to the native female education in India its frank and cordial support; and in this we heartily concar and we especially approve of the bestowal of marks of honour upon such native gentlemen as Rao Bahadur Maganbhai Karramchand who donated Rs. 20,000 to the foundation of two native female schools in Ahmedabad, as by such means our desire for the extension of female education becomes generally known."[২৭]

হ্যালিডে তখন ছোটলাট। ১৮৫৩ সালে বাংলার প্রথম ছোটলাট হিসেবে হ্যালিডে বাংলা শিক্ষার প্রসারে মনোযোগ দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁর প্রধান সমর্থক, পরামর্শদাতা ও সহায়ক। ১৮৫৭ সালের প্রথমদিক থেকে উডের দলিলের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে হ্যালিডে বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের কাজে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই সময় দক্ষিণবঙ্গের বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক প্রাট সাহেবের

কাছে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য গ্রামবাসীদের তরফ থেকে তিনটি আবেদনপত্র এসে পৌঁছায়। প্রথম দুটি হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপাল থানার দারহাট্টা গ্রাম এবং সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত গোপালনগর গ্রাম থেকে আসে, এবং তৃতীয়টি আসে বর্ধমান জেলার নারো গ্রাম থেকে। প্রাট সাহেব ঐ তিনটি আবেদনপত্রই ছোটলাটের কাছে পাঠিয়ে দেন। ছোটলাট দরখাস্ত তিনটি মঞ্জুর করেন।[২৮] ইতিমধ্যে হ্যালিডে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ আলোচনার জন্য বিদ্যাসাগরকেই উপযুক্ত মনে করে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। বিদ্যাসাগর তখন বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। কারণ ১৮৫০ সাল থেকেই তিনি বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজেও বিদ্যাসাগর প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। সুতরাং তাঁর উপদেশের মূল্য যে কতখানি সে সম্পর্কে হ্যালিডে অবহিত ছিলেন। আর কর্মবীর বিদ্যাসাগরও কাজটা যে কত কঠিন তা জেনেও অবিচলিত আত্মবিশ্বাস নিয়ে নতুন কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

মেয়েদের বিদ্যালয়গুলিও সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবে না জেনে তিনি আরও বেশি উৎসাহিত হয়েছিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি ডি পি আই কে জানালেন যে বর্ধমান জেলার জৌগ্রামে তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় খুলতে পেরেছেন (৩০-৫-১৮৫৭)। ডিরেক্টর এই বিদ্যালয়টির জন্য মাসিক ৩২ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করলেন (দ্রষ্টব্য : বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ-বিনয় ঘোষ, পৃঃ ২২৩)।

স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে বাংলা সরকারের মনোভাব বিশেষ অনুকূল বলে মনে হয়েছিল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের, আর এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই তিনি নিজ এলাকাভুক্ত (দক্ষিণবঙ্গের বিদ্যালয় সমূহের বিশেষ পরিদর্শক হিসাবে) জেলাগুলিতে দ্রুতগতিতে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেন। ১৮৫৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৮৫৮ সালের মে মাস পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় হুগলীতে ২০টি, বর্ধমানে ১১টি, মেদিনীপুরে ৩টি এবং নদীয়ায় ১টি অর্থাৎ মোট ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ বিদ্যালয়গুলির জন্য মাসিক খরচ হতো মোট ৮৪৫ টাকা। ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১৩৪৮।[২৯] কিন্তু সরকারী আনুকূল্য সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের বিশ্বাস সত্য হলো না। ১৮৫৮ সালের ৭ই মে বাংলার ছোটলাটের চিঠির জবাবে ভারত সরকার জানালেন যে, বালিকা বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে সরকারী সাহায্যের শর্তাবলী পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না। স্থানীয় লোকের সাহায্য যদি যথেষ্ট পরিমাণে না পাওয়া যায় তাহলে এরকম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করাই ভাল (দ্রষ্টব্য : ভারত সরকারের চিঠি, ৫ম অধ্যায়, পৃঃ ১১৪-১১৫)। ভারত সরকারের এই আদেশে বিদ্যাসাগর হতাশ হয়েছিলেন ঠিকই, তবে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েননি। ১৮৫৮ সালের ৩রা ডিসেম্বর তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ করেন। অনেকের মতে তাঁর ঐ পদত্যাগের কারণ হয়তো তাঁর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলির সম্পর্কে অর্থ সাহায্য সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে বিরোধের

পরিণতি (হুগলী জেলার ইতিহাস-সুধীরকুমার মিত্র বিদ্যাবিনোদ-পৃঃ ২৬২)। আর্থিক অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একেবারে নিরাশ হয়ে পড়েননি। বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার জন্য তিনি একটি নারী শিক্ষা ভাণ্ডার স্থাপন করেন। সেই স্ত্রী-শিক্ষাভাণ্ডারে' পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, স্যার সিসিল বীড়ঁন প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তি এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নিয়মিত চাঁদা দিতেন। পরিচিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে এইভাবে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করে তিনি সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকেই স্ব-প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। এই ঘটনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রথমে সরকারী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেলেও শেষ পর্যন্ত সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি। কিন্তু তাই বলে তাঁর আরব্ধ কাজ ফেলে রাখেননি। তদানীন্তন বাংলাদেশের স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক মানুষের কাছে তিনি সাহায্যের জন্য যে আবেদন করেন, তাঁর সেই আবেদনের অনুকূল সাড়াও তিনি পেয়েছিলেন অন্ততঃ কিছু সংখ্যক মানুষের কাছ থেকে। সরকারী দাক্ষিণ্যের আশায় বসে না থেকে বেসরকারী সাহায্যের সহায়তায় তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে বাঁচিয়ে রাখার যে চেষ্টা করেছিলেন তাতে কিয়দংশে সফলও হয়েছিলেন। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন মানুষ তাঁর 'নারী শিক্ষাভাণ্ডার'-এর উদ্দেশ্য সাধনে এগিয়ে এসেছিলেন। এ প্রসঙ্গে প্রমাণ স্বরূপ কিছু চিঠিপত্রের উল্লেখ করা যায় —

১। স্যার ব্র্যাটল ফ্রিয়ার কে লেখা বিদ্যাসাগরের চিঠি :

"Calcutta, 11th October 1863.

"The Hon'ble Sir Bratle Frere, My Dear Sir, ... you will no doubt be glad to hear that the Mufussil Female Schools, to the support of which you so kindly contributed, are progressing satisfactorily. Female education has begun to be gradually appreciated by the people of districts contiguous to Calcutta, and /Schools are being opened from time to time". I remain,
"With great respect and esteem,

"Yours' sincerely, (sd) Isvar Chandra Sarma"

(দ্রষ্টব্য : Subal Chandra Mitra-Isvar Chandra Vidyasagar - A Story of his life and work, page-419-420)

২। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লেখা স্যার সিসিল বীড্নের চিঠি :

"My dear Pandit ...... I enclose a cheque for Rs. 165 on account of my subscription to your Female School Fund for April, May and June 1863; Yours very truly (sd) C. Beadon (দ্রষ্টব্য : ঐ, পৃঃ ৪১৯)

৩। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লেখা মিঃ রাবানের চিঠি:

Darjeeling August 17th, 1866.

Pandit Isvara Chandra Sarma, "My dear Sir, I have now the pleasure to enclose a cheque for Rs. 330 on account of Sir Cecil Beadon's Subscription to the Female School fund for the half year of 1866. This would have

been sent before, but the cheque book was accidentally left behind. Believe me, 'Yours' very truly, H. Rabau".

(দ্রষ্টব্য : ঐ পৃঃ ৪২০)

বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলির সম্পর্কে সরকারী সাহায্য সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সমকালীন পত্র-পত্রিকাতেও অনেক লেখালেখি হয়েছিল। এমনই একটি পত্রিকা 'সোমপ্রকাশ'। 'সোমপ্রকাশের' সম্পাদকীয়তে লেখা হয়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলাদেশের ভূতপূর্ব লেফ্‌টেনান্ট গভর্নর হেলিডে সাহেবের অনুমতি লইয়া বর্ধমান, হুগলী প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। হেলিডে সাহেব অগ্রে এ বিষয়ে সুপ্রিম গভর্নমেন্টের মত জিজ্ঞাসা করেন নাই। এই হেতু উক্ত বিদ্যালয় সকলের নিয়োজিত লোকদিগের বেতন দান কাল উপস্থিত হইলে তুমুল গোলযোগ উপস্থিত হয়। সুপ্রিম গবর্নমেন্টের ও ইংলন্ডীয় কর্তৃপক্ষের মত গ্রহণ নিরপেক্ষ হইয়া নতুন বিষয়ে ব্যয়দানের ক্ষমতা নাই। সুতরাং তাঁহারাও বালিকাবিদ্যালয়ের স্থায়িতা বিষয়ে মত প্রদান করিতে পারিলেন না : ...স্বদেশের হিতানুষ্ঠান প্রসঙ্গ হইলে বিদ্যাসাগরেরও কিছু জ্ঞান গম্য থাকে না। রীতিমত কাজ হইল কিনা, তিনিও তাহা বিবেচনা করিলেন না। তাড়াতাড়ি কয়েকটা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বসিলেন। বোধহয় এমন স্থলে কাহারও সংশয় জন্মে না। লেফ্‌টেনান্ট গভর্নমেন্ট যখন আদেশ করিতেছেন, তখন তদ্বিষযে সন্দেহ হইবার সম্ভাবনা কি ? যাহা হউক, বিদ্যাসাগরের মনে এতদিন এই আশা ছিল, ইংলন্ডীয় কর্তৃপক্ষ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের স্থায়িতা সম্পাদনের সদুপায় করিয়া দিবেন। এক্ষণে সে আশা উন্মুলিত হইল। তিনি এই সমাচার শুনিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইবেন সন্দেহ নাই।[৩০] 'সোমপ্রকাশে'র সঙ্গে আমরাও একমত যে, সত্যই "স্বদেশের হিতানুষ্ঠান প্রসঙ্গ হইলে বিদ্যাসাগরেরও কিছু জ্ঞান গম্য থাকে না।", এবং "অতিশয় ক্ষুব্ধ ও যে হয়েছিলেন এবিষযেও কোন সন্দেহ নেই। তবে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন ইংলন্ডীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে। সিপাহী বিদ্রোহ জনিত পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্যই হোক, কিম্বা অধীনস্থ উপনিবেশের মানুষের মধ্যে দ্রুতগতিতে শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টাকে সুনজরে না দেখার জন্যই হোক্—প্রজা সাধারণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ইংলন্ডের কর্তৃপক্ষ ভঙ্গ করেছিলেন,—এই সত্য ভঙ্গটাই হয়ত আজীবন নিষ্ঠাশীল, সত্যনিষ্ঠ, আদর্শবান ঈশ্বরচন্দ্রকে বেশি আঘাত করেছিল। বহু মানুষ তাঁর সেই একনিষ্ঠ বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাঁকে ঠকিয়েছিল, কিন্তু নিজে তিনি কখনো কাউকে কোন ব্যাপারেই ফাঁকি দেননি, বা কাউকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননি, সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে অসুবিধা হওয়া সত্বেও। এ সম্পর্কে ১৮৬২ সালের ৯ই জুন হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখেছে,

"...The energetic Vidyasaghur alone established some forty three Female Schools and kindred spirits were working in equal earnest. But the refusal of aid strangled Vidyasaghur's institutions at their very birth ...His immense personal influence and good repute only enabled him after unremitting struggle to keep on the Nine Surviving schools by private subscriptions but will he dare to revive his forty three schools under the present rule of

half subscriptions and half grant? And if it were enquired as to who his supporters were, it would be found we believe that most of them were Calcutta men, either officials or Wealthy Natives"...But every man in the country not a Vidyasagar."[৩১]

পত্র পত্রিকায় এইসব লেখালেখি থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে সেইসময় বিদ্যাসাগর নিঃসঙ্গ একক যাত্রী ছিলেন না। তাঁর প্রচেষ্টাকে সেদিনের জনমানস যে সমর্থন জানিয়েছিল — তারই প্রতিফলন ঘটেছে ঐ সব পত্র-পত্রিকাগুলোতে। বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সম্বন্ধে যে প্রচ্ছন্ন প্রশংসা প্রতিফলিত হয়েছে ঐ পত্রিকাগুলোতে তাকে সেদিনের জনমতের অভিব্যক্তি বলেই আমরা ধরে নিতে পারি, কারণ সংবাদপত্র কিংবা পত্র-পত্রিকাকে জনমতের বাহন বলেই সর্বত্র মনে করা হয়।

সেদিনের বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সমাজের মানুষ মেয়েদের আধুনিক শিক্ষা দিতে ভয় পেতেন। কারণ তাঁরা মনে করতেন আধুনিক শিক্ষার মধ্যে ধর্মান্তরকরণের প্রচেষ্টা নিহিত আছে। সেই সময়ে বা তার আগে মিশনারীরা এদেশের মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তার মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা অপেক্ষা খৃষ্টধর্ম প্রচারের মনোভাবটাই সুস্পষ্ট ছিল। প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর ইংরাজী 'রিফর্মার' পত্রিকায় মিসেস উইলসনের কেন্দ্রীয় বালিকা বিদ্যালয় সম্বন্ধে লেখেন : The pupiles of this institution consist for the most part of the lowest classes. Who are not permitted to frequent the houses of the respectable natives. For these women it will be difficult to find access to the respeclable females, particularly when it is known that their education consists chiefly of the knowledge of the new Testament and the Religious facts. Prejudice of caste and the stronger prejudice which the generality of natives continue to entertain against christianity, are at present likely to raise an insurmountable barrier against the success of their endeavours".[৩২]

প্যারীচরণ সরকারের চরিতকার নরকৃষ্ণ ঘোষ এ সম্বন্ধে লিখেছেন, "...পাঠকের যেন স্মরণ থাকে যে, সে সময়ে স্ত্রী লোক লেখা পড়া শিখিলে বিধবা হয়, জাতি যায় প্রভৃতি কুসংস্কার বঙ্গীয় পল্লীবাসীগণের অন্তরে বদ্ধমূল ছিল।"[৩৩] সুতরাং সেদিনের সামাজিক মনোভাব স্ত্রী জাতির শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষভাবে কেমন ছিল তা' সহজেই অনুমান করা যায়। মিশনারিগণ বিদেশী এবং তাঁরা আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে খৃষ্টধর্মেরই যে প্রচার করছেন—এ ধারণা তখন সমাজের অধিকাংশ মানুষের মনেই বদ্ধমূল ছিল। কাজেই ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত এ দেশীয়রা যখন সেই আধুনিক শিক্ষারই প্রসার ঘটাতে উদ্যোগী হলেন, বিশেষভাবে মেয়েদের মধ্যে, তখন বাধা আসাই স্বাভাবিক ছিল। সাধারণ উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা এই ধরনের ধর্মীয় শিক্ষালাভ করলে সনাতন হিন্দুধর্ম বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা আছে—তাঁদের এই ভয় অমূলক ছিল না। বাস্তব ক্ষেত্রে মিশনারিগণের শিক্ষা প্রচারের মূলে ছিল

ধর্মান্তকরণ প্রচেষ্টা। এ প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন, "...' ১৮৩৪ সালে অ্যাডামের রিপোর্টে কলিকাতা ব্যতীত শ্রীরামপুর, বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া, কৃষ্ণনগর, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, চট্টোগ্রাম, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম প্রভৃতি স্থানে ১৯টি বালিকা বিদ্যালয় ও প্রায় ৪৫০টি বালিকার উল্লেখ দেখা যায় ; ঐ সকল বিদ্যালয়ের অনেকগুলি লেডিস্ সোসাইটির সভ্য মহোদয়গণের উৎসাহে স্থাপিত বলিয়া উল্লিখিত হয়। কিন্তু এই সকল বালিকা বিদ্যালয়ের অধিকাংশ খ্রীষ্টীয় মহিলাদিগের স্থাপিত ও খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচার কার্যের অঙ্গীভূত ছিল।'[৩৪] সেদিনের বাংলাদেশের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত অধিকাংশ যুবকই ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন, এ প্রমাণ ঐতিহাসিক। যেমন —মহেশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপীনাথ নন্দী, মাধবচন্দ্র মল্লিক, মধুসূদন দত্ত, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস[৩৫] প্রমুখ হিন্দু কলেজের বহু ছাত্র সেদিন হিন্দু ধর্মত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। একটা যেন সামাজিক সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন। পরিবারের অভিভাবকগণ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কলকাতা শহরে তখন কতজন ছাত্র হিন্দু কলেজেও অন্যান্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখত, এবং তার মধ্যে আনুমানিক কতজন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল তার প্রমাণ তখনকার সংবাদপত্র থেকে পাওয়া যায়। ১৮৩১ সালের ৫ মে 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকায় লেখা হয়েছে, "শ্রী শ্রীযুক্ত ইংলন্ডাধিপতির অধীন এ প্রদেশে অর্থাৎ সুবে বাংলা বিহার উড়িষ্যার মধ্যে যত মনুষ্য আছে ইহার মধ্যে হিন্দু ৯ (নয়) কোটি লোক হইবেক। তন্মধ্যে কলিকাতা নগরে তাহার সহস্রাংশের একাংশ হইবেন। ইহাতে ৪/৫ পাঁচ শত বালক হিন্দু কলেজ এবং অন্যান্য ও মিশিনারি দিগের পাঠশালায় ইংরাজী বিদ্যাভ্যাস করিতেছে, এই বালকগুলির মধ্যে ৩০/৪০ জন হইবেক নাস্তিক হইয়াছে... " অর্থাৎ শতকরা সাত—আট জন। সংখ্যা খুব অল্প নয়। পারিবারিক ও সমাজ জীবনে উদ্বেগ সৃষ্টি করার পক্ষে যথেষ্ট। কলকাতার প্রায় প্রতি পরিবারে (হিন্দু মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত) তখন এই ধর্মান্তরের সমস্যা নিয়ে চর্চা হয়েছে। ঐ বছরই (১৮৩১) ৯ মে সমাচার চন্দ্রিকা লিখেছেন "এক্ষণে এতন্নগরে হিন্দুদিগের ঘরে ঘরে অন্য কোন চর্চাপেক্ষা যে কয়েকজন নাস্তিক হইয়াছে ইহার দিগের কথোপকথনে অধিক কালক্ষেপণ হয় বিশেষত ভাগ্যবন্ত লোকের বৈঠকখানায় প্রায় প্রতিদিন এই কথা হইয়া থাকে। কেহ কহেন মহাশয় কি কাল হইল ধর্ম-কর্ম আর থাকে না। কেহ কহেন কালের দোষ কেন দেও এই কলিকাল কি সর্বদেশ সর্ব জাতির উপর নহে কেননা এমন বুঝা যায় না যে অমুক ইংরেজ হিন্দু হইতে বাঞ্ছা করিয়াছেন এবং হিন্দু কি মুসলমানের ন্যায় পোশাক-পরিচ্ছদকরণ পূর্বক আপনি সুখবোধ করেন অথবা যিনি যিনি বাঙ্গলা পার্সি ইত্যাদি এতদ্দেশীয় লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা পরস্পর এতদ্দেশীয় ভাষায় কথোপকথোন করেন কি পত্রাদি লেখেন...।'[৩৬] এ থেকে বোঝা যায় যে, সেদিন কলকাতা শহরের মধ্য ও উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের আলোচনা সভা বা বৈঠকখানায় প্রধান আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইংরাজী শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে নাস্তিকতা

ও খৃষ্টধর্মের প্রতি অনুরাগের সমস্যা। দেশের সঙ্কট কাল উপস্থিত বলে যে তাঁরা আশঙ্কাগ্রস্ত হয়েছিলেন তার আভাসও যেন পাওয়া যায় সংবাদে। ফলে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি কলকাতার হিন্দু সমাজের মনোভাব স্বাভাবিক কারণেই বিরূপ হয়ে উঠেছিল। বিদ্যাসাগর সেটা জানতেন, কারণ তিনি নিজেই ছিলেন সেই যুগের মানুষ। বেথুন সাহেবের মতো তিনিও বুঝেছিলেন বাঙালী ভদ্র ঘরের ও উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে না দিলে বাংলাদেশে স্ত্রীর শিক্ষার প্রসার কোনমতেই সম্ভব নয়। কারণ সমাজ রথের রশি রয়েছে মূলতঃ এই দুই শ্রেণীরই হাতে। সেজন্যই বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা দিবসে বেথুন সাহেব তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে বলেছিলেন. ...

"It was of course essential to great and permanent success that all the puplis of my new school should belong to families of respectablity ; ...I ought not to conclude without saying one word on the nature of the studies that are to be pursued here It is well understood by you all that the plan which has been uniformly followed in the govt. schools, of not meddling with the religion of your children, is to be strictly followed here... As far as literature, therefore, is concerned, we shall make Bengali the foundation, and resort to English only for some of those subsidiary advantages, and when we know that the communication of such knowledge is not in opposition to the wishes of the parents."[৩৭]

বেথুন বিদ্যালয়ের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে উত্তর পাড়া, বারাসত, নিবাধই, সুখসাগর, যশোহর প্রভৃতি স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে। তবে নিবাধই বালিকা বিদ্যালয়টি অবশ্য ১৮৪৯ সালের ৭ই মে প্রতিষ্ঠিত বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের একবছর আগে ১৮৪৮ সালের ৭ই মে শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ দত্তের উদ্যোগে মাত্র ৮টি ছাত্রী নিয়ে নীলকমল ঘোষের পূজামণ্ডপে স্থাপিত হয়। ছাত্রীদের নাম ছিল অক্ষয়কুমারী চট্টোপাধ্যায়, জগৎতারা বসু, কালীতারা ঘোষ, মঙ্গলা মুখোপাধ্যায়, সর্বাণী মুখোপাধ্যায়, কুমুদিনী মুখোপাধ্যায়, ব্রজেশ্বরী বসু।[৩৮]

নির্দেশিকা

১। দ্রষ্টব্য : আধুনিক ভারতে শিক্ষা বিবর্তন অধ্যাপক জ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৮

২। দ্রষ্টব্য . ঐ, পৃঃ ৫৫

৩। দ্রষ্টব্য : প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ—রামমোহন রচনাবলী, পৃঃ ২০২, ২য় অনুচ্ছেদ। (হরফ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ · শুভ নববর্ষ ১৩৮০, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৭৩)

৪। দ্রষ্টব্য : A Biographical Sketch of the Rev K M. Banerjee by Ramchandra Ghosh . 46, Para-2nd.

৫। দ্রষ্টব্য : General Report on Public Instruction in the Lower Provιences of the Bengal Presidency for 1842-1848.

৬। দ্রষ্টব্য :রাজা রাধাকান্তদেব সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান (সাহিত্য সংসদ, এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে প্রাপ্ত)

৭। দ্রষ্টব্য ·Raja Radhakanta Deb Bahadur K. C. I- Brief account of his life and Character Edited by his son Raja Rajendra Narayan Deb Bahadur, Page-S-10.

৮। দ্রষ্টব্য · বঙ্গদেশ ইংরেজী শিক্ষা : বাঙালীর শিক্ষাচিন্তা—সুখময় সেনগুপ্ত, পৃঃ ৪৫

৯। দ্রষ্টব্য · বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ—বিনয় ঘোষ, পৃঃ ২১৫

১০। দ্রষ্টব্য : Bethun School and College centenary volume, Page-14.

১১। দ্রষ্টব্য : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ৩৪৫

১২। দ্রষ্টব্য : Report on Public Instruction in Bengal for 1849-1850, Page-4-5

১৩। দ্রষ্টব্য : প্যারীচরণ সরকারের জীবনী—শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

১৪। দ্রষ্টব্য : উত্তর চব্বিশ পরগনার ইতিবৃত্ত—কমল চৌধুরী, পৃঃ ৪৪-৫১

১৫। দ্রষ্টব্য Women's Education in Eastern India –Jogesh Chandra Bagal, page-83

১৬। দ্রষ্টব্য · উত্তর চব্বিশ পরগনার ইতিবৃত্ত—কমল চৌধুরী, পৃঃ ৪৪-৫১

১৭। দ্রষ্টব্য . আত্মচরিত : শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ২১৩ (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

১৮। দ্রষ্টব্য : আত্মচরিত—শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ৪২।

১৯। দ্রষ্টব্য : "বিদ্যাদর্শন" পত্রিকা (অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত) অগ্রহায়ণ, ১৭৬৪ অব্দ।

২০। দ্রষ্টব্য বঙ্গদেশে ইংরাজী শিক্ষা : বাঙালীর শিক্ষাচিন্তা—সুখময় সেনগুপ্ত, পৃঃ ৪৬

২১। দ্রষ্টব্য · Bethun, School and College centenary volume, Page-132

২২। দ্রষ্টব্য . আত্মচরিত—শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ৮৮

২৩। দ্রষ্টব্য সোমপ্রকাশ পত্রিকা (স্ত্রী বিদ্যাশিক্ষা) ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৪-২৭ সংখ্যা (সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র–বিনয় ঘোষ)।

২৪। দ্রষ্টব্য . বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ—বিনয় ঘোষ, পৃঃ ২২০

২৫। দ্রষ্টব্য · সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২য় খণ্ড)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১০-১৪

২৬। দ্রষ্টব্য . Selections from "jnannesan", 34, 62-63

২৭। দ্রষ্টব্য : The Despatch of 1854-Charless Wood (Quoted from History of Educations in India-By Nurullah and Naik, Page-123).

২৮। দ্রষ্টব্য : হুগলী জেলার ইতিহাস—সুধীর কুমার মিত্র বিদ্যাবিনোদ, পৃঃ ২৫৯-২৬১

২৯। দ্রষ্টব্য : Report of Pundit Ishwar Chandra Surma, Special Inspector of Schools. South Bengal for 1857-1858 (Report on Public Instructions In Bengal 1857-1858 , উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাঠাগারের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

৩০। দ্রষ্টব্য : সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র—বিনয় ঘোষ (সোমপ্রকাশ শিক্ষা বালিকা বিদ্যালয়—১৭ শ্রাবণ, ১২৬৬, ৩৮ সংখ্যা, সম্পাদকীয়)।

৩০। দ্রষ্টব্য : করুণাসাগর বিদ্যাসাগর—ইন্দ্র মিত্র, পৃঃ ২৪১-২৪২

৩১। দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ—বিনয় ঘোষ, পৃঃ ২১৪

৩৩। দ্রষ্টব্য · প্যারীচরণ সরকার (জীবনবৃত্ত), পৃঃ ৬৩-৬৪

৩৪। দ্রষ্টব্য রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ৩৫৩

৩৫। দ্রষ্টব্য রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ৩০৪-৩২৭, ৪৪৬-৪৫০

৩৬। দ্রষ্টব্য : বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ—বিনয় ঘোষ, পৃঃ ১০৫-১০৬

৩৭। দ্রষ্টব্য History of the Bethune School and College (Bethune School and College centenaary volume, Page-109, 111)

৩৮। দ্রষ্টব্য . নিবাধুই বালিকা বিদ্যালয় (১৮৪৮-১৯৭৩) শতোত্তর পঞ্চবিংশতিতম উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থে উক্ত বিদ্যালয় সম্পাদক অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত, 'একশত পঁচিশ বছরের ইতিহাস' হতে উদ্ধৃত, পৃঃ ১।

নারী শিক্ষার উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংগ্রাম পদ্ধতি

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাংলাদেশের নারী-শিক্ষা প্রসার আন্দোলনের নেতৃত্বের পুরোভাগে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সমকালীন সমাজের গতিপ্রকৃতি বিচার বিশ্লেষণ করে তিনি নারী শিক্ষা প্রসার আন্দোলনকে পরিচালিত করেছিলেন। বিদ্যাসাগর একদিকে যেমন বুঝেছিলেন যে সেই সময়ের বাংলাদেশের সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী পরিবারের মেয়েদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষাকে ছড়িয়ে না দিলে নারী শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা ব্যাহত হবে, তেমনি সেই সঙ্গে এও বুঝেছিলেন যে, সমাজের বিত্তহীন দরিদ্র গ্রামবাসীদের মধ্যেও স্ত্রী শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে চেতনা জাগাতে হবে। তাই তিনি উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মেয়েরা অধিক সংখ্যায় যাতে সাধারণ শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী হয় সেই চেষ্টা যেমন করেছিলেন (বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠায় বেথুন সাহেবকে সর্বান্তকরণে সাহায্যে করা থেকে শুরু করে ঐ স্কুলে অবৈতনিক সম্পাদকরূপে কাজ করার সময় পর্যন্ত), তেমনি পল্লী অঞ্চলে অধিক সংখ্যক বালিকা বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শুধু প্রতিষ্ঠা করা নয় ঐ বিদ্যালয়গুলি যাতে ভালো ভাবে চলে, গ্রামবাসীরা যাতে বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে মনোযোগী ও উৎসাহী হয় সেই চেষ্টাও করেছিলেন। পল্লী অঞ্চলে বিদ্যালয়গুলিতে যে সব ছাত্রীরা পড়তো আসতো তাদের সামাজিক অবস্থান কি রকম ছিল এখন আর তা জানা যায় না। কারণ যেসব অঞ্চলে তিনি বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেইসব অঞ্চলে সন্ধান নিয়ে জানা গেছে সেইসব বিদ্যালয়গুলির কোনটিরই অস্তিত্বই আজ আর নেই। সেই সময়কার পল্লী অঞ্চলের সামাজিক অবস্থাও আজ প্রায় পুরোপুরি পাল্টে গেছে। সেইসময় যে সব অঞ্চল ছিল বর্ধিষ্ণু আজ তা ক্ষয়িষ্ণু, যেসব গ্রাম ছিল তথাকথিত উচ্চবর্ণ অথবা নিম্নবর্ণ অধ্যুষিত আজ তা মিশ্রবর্ণ অধ্যুষিত, (আবার উল্টোও আছে)। আর গ্রামের কৃষিজীবীশ্রেণীই শুধু আর এখন গ্রামে থাকেন না, নানাধরনের আধুনিক ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্র ধরেও বিভিন্নশ্রেণীর মানুষ আজ গ্রামবাসী হয়েছেন। দেশবিভাগের ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতির জন্যও বিভিন্ন জীবিকার বহুমানুষ আজ বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তে বসতি স্থাপন করেছেন। সুতরাং সেইসময় ঠিক কোন্ ধরনের সামাজিক অবস্থান থেকে ছাত্রীরা বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণ করতে আসতো এখন আর তা "সঠিকভাবে" বলা সম্ভব নয়। তবে সরকারী শিক্ষাবিভাগে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন তার কিছু অংশ উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে করি।

".......Iam happy to be able to state that I have not only made the people

sympathize in the good cause, but that they have come forward with alacrity and sent their daughters to the new schools.......I am confident that I would have been able to establish similar schools in almost every village in the Districts under me.......Thus a change may be said to have come over the spirit of the times, and this may be Reckoned as a new era in the history of Education in Bengal.

তাঁর এই রিপোর্ট থেকেই বোঝা যায় যে, গ্রামগুলির সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যেই নব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির সম্বন্ধে উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল এবং সবশ্রেণীর পরিবার থেকেই মেয়েদের ঐসব বিদ্যালয়ে পাঠানো হত শিক্ষাগ্রহণের জন্য।

সেই সময়ে বাংলাদেশের সনাতন পন্থী রক্ষণশীল সমাজের মানুষ কিন্তু মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে কঠোর মনোভাব অবলম্বন করেছিলেন। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে তাঁরা বিধি নিষেধ আরোপ করেছিলেন যে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে অকাল বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হবে। গৃহ হবে সনাতন আদর্শচ্যুত। সেদিনের বাংলাদেশে যা কিছু সংস্কার আন্দোলন হয়েছে, সেসব কিছুরই বিরোধিতা করেছেন তাঁরা ভারতীয় শাস্ত্র পুরাণের দোহাই দিয়ে। স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারেও তাঁরা একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। "মনু"র উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে। পুত্রস্তু স্থবিরেভাবে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্রমহতি।" — অর্থাৎ বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর ও বার্ধক্যে পুত্রের অধীন হয়ে থাকাই নারীর পরমধর্ম, নারীর স্বাতন্ত্র্য কোন সময়েই উচিত নয়। পৃথিবীর সর্বত্রই, বিশেষ করে সেই সময়ে মানুষ থমকে গেছে ধর্মীয় অনুশাসনের সামনে। সুতরাং শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের দোহাই দিয়ে রক্ষণশীল সমাজ সেদিনের বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার প্রচেষ্টাকে বাধা দিয়ে রেখেছিলেন। ইতোমধ্যে পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিয়েছে। দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিদেশী শাসন। নবযুগ প্রবর্তক রামমোহন পশ্চিমী সভ্যতার বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন বাঙালী মানসে, দ্বারকানাথ ঠাকুর 'কালাপানি' পার হয়ে বিলাত যাত্রা করেছেন। রামমোহন এবং তাঁর উত্তরসুরি ইয়ং বেঙ্গল দল স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নানা প্রচার চালাচ্ছে, ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি ও লেডিস সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ নিয়েছে। রক্ষণশীল সমাজের নেতা রাজা রাধাকান্ত দেবও স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু তিনি অন্তঃপুরে শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, অর্থাৎ প্রকাশ্যভাবে বিদ্যালয়ে না গিয়ে মেয়েরা ঘরে বসেই কিছু বাংলা লেখাপড়া শিখবে — এই ছিল তাঁর মনোভাব। সেজন্য তিনি নিজের বাড়িতেই স্ত্রী শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন বেথুন ফিমেল স্কুলে প্রতিষ্ঠার কয়েকদিনের মধ্যেই।

নবযুগের কর্ণধার বিদ্যাসাগর স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ ও রক্ষণশীল মনোভাবের সেই বেড়াজালকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছিলেন। মনুর দোহাই মেনে রক্ষণশীল সমাজ যখন 'পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্যাই একমাত্র শাস্ত্রীয় বিধি বলে নারী মুক্তির বিরোধিতা করেছেন, বিদ্যাসাগর তখন তার জবাব দিয়েছেন বেথুন স্কুলের গাড়ির গায়ের দু'পাশে "কন্যাপোবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ" —

মহানির্বাণতন্ত্রের এই শ্লোকটি খোদিত করে দিয়ে। কারণ তিনি স্ত্রী শিক্ষা বিরোধীদের এবং সাধারণ জনগণকেও বোঝাতে চেয়েছিলেন যে স্ত্রী শিক্ষা শাস্ত্রসম্মত ও সদাচারানুমোদিত।

স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয় ভারতীয় সনাতন ভাবধারাকে অতিক্রম করে উগ্র পশ্চিমী আধুনিকতার শিক্ষায় মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলতে যে চাননি তার প্রমাণ আমরা পাই তাঁর শিক্ষাদর্শ আলোচনা করলেই। সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন সংক্রান্ত বিষয়ে 'Notes on the Sansktit College' নামে যে খসড়াটি তিনি রচনা করেন, তার মধ্যেই শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনা সুস্পষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তাতে তিনি বলেছেন "যাঁরা এ দেশে শিক্ষা তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছেন তাঁদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত সুসমৃদ্ধ বাংলাসাহিত্য সৃষ্টি: যাঁরা ইউরোপীয় জ্ঞান সম্ভার থেকে জ্ঞান বিজ্ঞানের উপকরণ সংগ্রহ করতে সক্ষম নন এবং সেগুলিকে ভাবগম্ভীর প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম, তাঁরা এই সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না, যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষিত নন, তাঁরা সুসংবদ্ধ প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় রচনা সৃষ্টি করতে পাববেন না। সেইজন্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদেরও ইংরাজী ভাযায় ও সাহিত্যে সুশিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন, অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, যারা কেবল ইংরাজী বিদ্যায় পারদর্শী, তাঁবা সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাংলা ভাষায় কিছু প্রকাশ করতে পারেন না। তাঁরা এত বেশি ইংরাজী ভাবাপন্ন যে তাঁদের যদি অবসর সময়ে খানিকটা সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলেও মনে হয় তাদের পক্ষে বর্তমান অবস্থায় প্রাঞ্জল ও পরিচ্ছন্ন বাংলা ভাষায় তাঁদের মনের কোন ভাবই প্রকাশ করতে পারবেন না ; অতএব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা যদি ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত হতে পারে তাহলে একমাত্র তারাই সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের সুদক্ষ ও শক্তিশালী রচয়িতা হতে পারবে ; একথা ঠিক যে, হিন্দু দর্শনের অনেক মতামত আধুনিক যুগের প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে খাপ খায় না, কিন্তু তাহলেও প্রত্যেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের এই দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত। .....(তবে পাশ্চাত্য দর্শন পড়া চাই) ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দুই দর্শনেই সম্যক জ্ঞান থাকলে আমাদের দর্শনের ভ্রান্তি ও অসারতা কোথায় তা বোঝা সহজ হবে। ..... আমার ধারণা, সর্বমতের দর্শন পাঠ করবার সুযোগ দিলে ছাত্রদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত গড়ে উঠবে। তার সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শন সপ্নন্ধে জ্ঞান থাকলে, দুই দর্শনের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য কোথায় তাও তারা বুঝতে পারবে ; এই শিক্ষার আর একটি সুবিধা হল এই যে, পাশ্চাত্য দর্শনের ভাবধারা আমাদের বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে হলে (into native dress) যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা জানা দরকার, তা পণ্ডিতদের আয়ত্বে থাকবে।" অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন সহজবোধ্য ভাষায় সুসমৃদ্ধ বাংলা ভাষা সৃষ্টি, বাস্তবের সঙ্গে যার বিরোধ তেমন দর্শনের সার্থকতা নেই, হিন্দু দর্শন অন্যান্য দর্শনের সঙ্গে পাঠ্য হলে শিক্ষার্থীর বিচার বুদ্ধি ভুল পথে পরিচালিত হওয়ার আশঙ্কা কমবে, বাস্তব জীবনের নিরিখে নিজস্ব যুক্তি বিচার বোধ প্রয়োগ করতে শিখবে। ব্যালেন্টাইনের রিপোর্টের যে

সমালোচনা বিদ্যাসাগর করেছিলেন, তার মধ্যেও শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে, — তিনি ব্যালেন্টাইনের প্রস্তাবের উত্তরে লিখলেন, "কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে সাংখ্য ও বেদান্ত না পড়িয়ে উপায় নেই। .... বেদান্ত সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, এ সম্বন্ধে এখন আর কোন মতদ্বৈধ নেই। ...... সংস্কৃতে যখন এগুলি শেখাতে হবে, এদের প্রভাব কাটিয়ে তুলতে প্রতিষেধক রূপে ইংরাজীতে ছাত্রদের যথার্থ দর্শন পড়ানো দরকার। বার্কলের Inquiry সে ধরনের যথার্থ পাশ্চাত্য দর্শন নয়— ইউরোপেও এখন আর তা (বার্কলে) খাঁটি দর্শন বলে বিবেচিত হয় না। কাজেই, এতে, কোনক্রমেই সে কাজ (প্রতিষেধকের) চলবে না .... সংস্কৃত ও ইংরাজী দু'ভাষার বিজ্ঞান ও সাহিত্য পড়ে যে যথার্থরূপে ধারণা করেছে, তার কাছে সত্য-সত্যই। সত্য দু'রকম — এ ধারণা অসম্পূর্ণ প্রত্যয়ের ফল।" তিনি বলেছেন ভারতীয় পণ্ডিতদের গোঁড়ামি আরব খলিফাদের গোঁড়ামির চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। বাংলার তৎকালীন অবস্থার উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর বলেছেন — "বাংলাদেশে যেখানে শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে সেখানেই পণ্ডিতদের প্রভাব কমে আসছে। দেখা যাচ্ছে, বাংলার অধিবাসীরা শিক্ষালাভের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র। .....জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার আমাদের প্রথম প্রয়োজন। আমাদের কতকগুলি বাংলা স্কুল স্থাপন করতে হবে, এইসব স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে। শিক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যভার গ্রহণ করতে পারে এমন একদল মানুষ তৈরি করতে হবে- তাহলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। শিক্ষকদের এইসব গুণ থাকবে— মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ দখল, প্রয়োজনীয় বহুবিধ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান এবং দেশের প্রচলিত কুসংস্কার থেকেও তাঁরা মুক্ত থাকবেন। এই ধরনের একশ্রেণীর শিক্ষক গড়ে তোলাই আমার জীবনের লক্ষ্য-আমার উদ্দেশ্য আমার সংকল্প। এরজন্য আমাদের সংস্কৃত কলেজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করতে চাই। সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা তাদের লেখাপড়া কাজ শেষ করবার পর, আমার বিশ্বাস এই শ্রেণীরই শিক্ষিত লোক বলে দেশের মধ্যে পরিচিত হবে। এ আশা আমার মিথ্যা কল্পনা নয়। সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররাই যে বাংলাভাষার আদর্শ শিক্ষক হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আশার কথা, সম্প্রতি তাদের চিন্তাধারায় এমন পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি যে, আমার ধারণা, অদুর ভবিষ্যতে এই বিদ্যালয়ের প্রত্যেক সুশিক্ষিত ছাত্র দেশবাসীর মধ্যে প্রচলিত সমস্ত রকম কুসংস্কার থেকে মুক্ত হবে।" অর্থাৎ জ্ঞান বিদ্যার ক্ষেত্রে তিনি কোন দেশীয় অথবা ভৌগোলিক সীমারেখা মানতে চাননি। তাই প্রাচ্যবিদ্ ও পাশ্চাত্যবিদ্ কোন পণ্ডিতের মতামতই তিনি বিনা বিচারে গ্রাহ্য করেননি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার সমন্বয়ে সৃষ্ট যে প্রকৃত জ্ঞান— তাই তিনি দিতে চেয়েছিলেন দেশবাসীকে। স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রেও সেই আদর্শকে যে তিনি মেনে চলবেন এটাই স্বাভাবিক।

সে যুগে মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে রক্ষণশীলদের বিরোধিতা করার অন্যতম কারণ ছিল এই যে, সেই সময় শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রধানত চলেছিল মিশনারিদের

ধর্মপ্রচার প্রচেষ্টা। শিক্ষাদানের মধ্যে দিয়ে অন্তঃপুরে খ্রীষ্টধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটানোই ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। মিশনারি মহিলা সমিতি পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে প্রাথমিক পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ পাঠেরও ব্যবস্থা ছিল। সাধারণ পরিবারের মেয়েদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করা, তাদের খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অনুরাগী করে তোলা সেদিনের বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই মেনে নিতে পারছিলেন না। তাছাড়া পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজের উগ্র পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুকরণ সেদিনের বাংলাদেশের সমাজজীবনে ভাঙন ধরিয়েছিল। সেইজন্য বিশেষ করে সনাতন রক্ষণশীল মহল স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁরা কিছুতেই চাইছিলেন না মেয়েদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার হোক কিংবা প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে গিয়ে মেয়েরা লেখাপড়া শিখুক। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেটা বুঝেছিলেন, কারণ সেই যুগ-মানসিকতার মধ্যেই তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন।

সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর আইন প্রণয়নের ব্যাপারটাকে যেমন অত্যাবশ্যক বলে মনে করতেন, তেমনই শাস্ত্রীয়বচন উদ্ধৃতিকেও সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। কারণ স্বদেশের মানুষের মানসিকতা সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি জানতেন দেশের মানুষ আইনের শাসনকে যেমন মান্য করে, তিনি জানতেন দেশের মানুষ আইনের শাসনকে যেমন মান্য করে, তেমনি শাস্ত্রীয় বচনকে শ্রদ্ধা করে। একজন মানবতাবাদী ও প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হিসাবেই তাঁর মনে হয়েছিল নাবীর পূর্ণমর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত দেশ তথা জাতির কল্যাণ হওয়া সম্ভব নয়। "মধ্যযুগে চিন্তার মূল কেন্দ্র ছিল ধর্ম, এবং তার শাখা-প্রশাখা ছিল মানুষ ও সমাজ। নবযুগের চিন্তার মূল কেন্দ্র হল মানুষ, ধর্ম মানুষেরই জীবনের শাখা হল। নবযুগের সংস্কারকগণ-মানুষ ও সমাজকে কেন্দ্র করে সংস্কার কর্মে অগ্রসর হলেন। যুক্তি, বুদ্ধি ও মানবতাবাদী চিন্তা তাঁদের সমাজ সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার হয়েছিল। কিন্তু মানুষের মনে তার প্রভাব বিস্তার করার জন্য সেইসব মানবতাবাদী সমাজ সংস্কারকদেরও প্রাচীন শাস্ত্রের উদ্বৃতির প্রয়োজন হয়েছিল। বিশুদ্ধ যুক্তি ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করে সাধারণ মানুষ তখনও মানবমুখী চিন্তায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। তখনও শাস্ত্রীয় দোহাই দিয়ে ধীরে ধীরে মানুষকে যুক্তি-বুদ্ধি নির্ভর করা আবশ্যক ছিল। এইজন্যই রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মত নবযুগের সংস্কারকগণ যুক্তিবাদী হয়েও প্রাচীন শাস্ত্র অনুসন্ধান করে সেকালের মুনি-ঋষিদের বচন নিজেদের যুক্তির সমর্থনে প্রয়োগ করেছিলেন। আবার অপরপক্ষে এটাও তাঁরা ভাল করেই জানতেন যে, যুগ প্রচলিত সংস্কারকে শাস্ত্রীয় বিধানের সাহায্যে অতিক্রম করা গেলেও সমাজ ও রাষ্ট্রের আইনের সমর্থন ভিন্ন তা কোনমতেই কার্যকর করা সম্ভব হবে না। বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বিশেষ করে বিদ্যাসাগর এটা ভাল করে বুঝেছিলেন। বিধবা বিবাহকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সেজন্য তিনি যুক্তি-বিচার বিশ্লেষণ-মানবিক আবেদন ইত্যাদি প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নের কথাও ভেবেছিলেন এবং কার্যক্ষেত্রে তা সম্ভবও করেছিলেন। তিনি

বুঝেছিলেন, বাদানুবাদ, আলোচনা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো মানুষের মনকে নতুন কিছু গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত করে দিতে পারে, কিন্তু তাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় আইনের। সেজন্যই তিনি বিধবা বিবাহকে আইনসঙ্গত বলে বিধিবদ্ধ করার জন্য ১৮৭ জন ব্যক্তির স্বাক্ষর সহ একটি আবেদনপত্র সরকারের কাছে দাখিল করেন (৪ঠা অক্টোবর, ১৮৫৫)। জনমত সংগ্রহেব উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছ থেকে ঐ স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। আবেদনের সঙ্গে তিনি এই পত্রটি দিয়েছিলেন :

To W.Morgan.Esquire.Clerk to the Hon'ble the lagislative Council of India, "Sir. on behalf of the petitioiners. I have the honour to forward here with the petition of certain Hindoo inhabitants of the Province of Bengal which I beg to request you will do me the favour to lay before the Honble council at their next sitting." I have the honour to be Sir. your most obedient servant. Sd/- Ishwar Chandra Sharma." Calcutta Sanskiir College. the 4th October.1855.

আবেদন পত্রের মর্ম ছিল, "যদিও বহু প্রচলিত দেশাচার মতে হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ বস্তু বলে সর্বজন স্বীকৃত বিষয়, তথাপি আবেদনকারীগণের বিশ্বাস যে, এই নিষ্ঠুর প্রথা কেবল অশাস্ত্রীয় নয়, এতে সামাজিক বহু অকল্যাণেরও সৃষ্টি হয়। যদিও তাঁরা সামাজিক বাধা অগ্রাহ্য করে বিধবা বিবাহ প্রচলনে প্রস্তুত হয়েছেন, কিন্তু বিধবা বিবাহ আইন অনুসারে সিদ্ধ বলে বিধান না হলে এই বিবাহ জাত সন্তান অবৈধ বলে গণ্য হবে। সুতরাং বিধবা বিবাহের সমস্ত বাধা দূর করবার জন্য এই বিবাহকে বৈধ বলে স্বীকার করে আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজন হয়েছে।" সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর সংস্কার কার্যের ক্ষেত্রে যে সবদিক ভেবেচিন্তে অগ্রসর হতেন তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাই বলে কেউ যদি মনে করেন যে, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে তিনি স্বদেশেব কোনরকম সংস্কার কার্যে হাত দিতেন না,— তাহলে সেটা বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তাঁদের ভুল ধারণা। সে প্রমাণ যেমন আছে তাঁর বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ নিরোধ প্রচেষ্টার মধ্যে, তেমনি আছে তাঁর স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার প্রচেষ্টার মধ্যেও।

১৮৫০ সালে বেথুন সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর সাগ্রহে বেথুন বালিকা বিদ্যালয়েব অবৈতনিক সম্পাদকরূপে ঐ বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্বগ্রহণ করেন (ডিসেম্বর ১৮৫০) শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" গ্রন্থে ও প্রসঙ্গে লিখেছেন"১৮৪৯ সালের মে মাসে বেথুন সাহেব যখন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি ও তাঁহার বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার বেথুনের পৃষ্ঠপোষক হইয়া দেশে স্ত্রী শিক্ষা প্রচলন কার্যে আপনাদের দেহমন প্রাণ সমর্পণ করেন।" বেথুন সাহেবের এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তোলাব জন্য পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁর দুই মেয়ে ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে প্রথমেই ঐ বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন।

বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম একুশজন ছাত্রীর মধ্যে মদনমোহন কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালা দু'জন। অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হওয়ার পর বিদ্যাসাগর তাঁর পরিচিত ভদ্রলোকদের অনুরোধ করেন তাঁরা যেন নিজ নিজ কন্যাদের বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন। তাঁর অনুরোধের ফলেই পণ্ডিত তারানাথ তর্ক বাচস্পতি, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, হরদেব চট্টোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, ঈশানচন্দ্র বসু, নীলকমল বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কন্যারা এই বিদ্যলয়ে ভর্তি হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনীকে বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন।

পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁর দুই মেয়েকে এই বিদ্যালযে শুধু ভর্তি করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি নিজে কিছুকাল নিয়মিত বিদ্যালযে গিয়ে ছাত্রীদের পড়িয়েছেন, "বিশেষত বালিকাগণের শিক্ষা সংসাধন করিবার আশায়" পুস্তক ও রচনা করেছেন। বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য তিনি শিশু পাঠ্য যে পুস্তকগুলি রচনা করেন, সেগুলি হল 'শিশু শিক্ষা' ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ। শিশুমনের উপযোগী করে রচিত সেই শিশু পাঠ্যপুস্তকগুলি বাংলা শিশু পাঠ্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে। এছাড়া ১৮৫০ সালের দ্বিতীয়ার্ধে পণ্ডিত মদনমোহন স্ত্রী শিক্ষার সপক্ষে "সর্ব শুভকরী পত্রিকায়" একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। এই রচনাটি সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু তাঁর "আত্মচরিতে" লিখেছিলেন — "স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক ঐরূপ উৎকৃষ্ট প্রস্তাব অদ্যপি বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই।" বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি গঠিত হওয়ার পর ২৪শে ডিসেম্বর ১৮৫৬ সালে পরিচালক সমিতির সভাপতি সিসিল বীডন এবং সম্পাদক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বাক্ষরিত সমিতির প্রথম যে বিজ্ঞপ্তিটি প্রচারিত হয় তাতে বলা হয় যে,

"The Government have appointed us a committee to manage the school founded by the Late Mr. Bethune......none but the daughters of the respectable Hindus are admitted..... Reading, Writting, Arithmatic, Natural science, Geography, Needle work,- these subjects are taught. They are instructed through the medium of Bengali. Lessons in English are given to those only whose parents and guradians wish it."

বেথুন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশেষ করে সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের মেয়েদের শিক্ষালাভের জন্য। বিদ্যালয়ে পরিচালনা সমিতির সভাপতি স্যার সিসিল বীডন এবং সম্পাদক বিদ্যাসাগরের স্বাক্ষরিত বিদ্যালয় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে একথা পরিষ্কারভাবে বলা হয় যে......"None but the daughters of the respectable Hindus are admitted." কাবণ অবশ্যই ছিল। সেই সময়ের বাংলাদেশের যে সামাজিক গঠন ছিল সেটা ভালেভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে সমাজের স্তরবিভাগের উপর দিকে যত ওঠা যায় সামাজিক বিধি নিষেধের কঠোরতাও ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর যত নীচের দিকে নামা যায় সেই বিধি নিষেধের কঠোরতা ততই হ্রাস পেতে থাকে, তারপর এমন একটা স্তরে নামা যায় যেখানে বিধি নিষেধ

বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। নিম্নবিত্ত-বিত্তহীন সমাজের সেইসব মানুষদের কাছে দৈনন্দিন গ্রাসাচ্ছাদনাটাই সর্বাধিক প্রয়োজনীয়। বিধি নিষেধ মানলে যেখানে উদর পূর্তির সম্ভাবনা নেই সেখানে বিধি নিষেধ মানবারও প্রয়োজন নেই। কিন্তু উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় সম্বন্ধে একথা খাটতো না। অন্তঃপুরের আব্রুরক্ষায় সেদিন সমাজের উপরতলার মানুষগুলো যেন অস্থির হয়ে উঠেছিল। সূর্যও যার মুখ দেখতে পায় না সেই অসূর্যম্পশ্যা নারীই তাঁদের সমাজে শ্রেষ্ঠতম সম্মানের অধিকারিণী ছিলেন। সুতরাং অন্তঃপুরের সেই অন্ধকার থেকে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা আলোকোজ্জ্বল প্রকাশ্য রাজপথ বেয়ে প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয়ে গিরে পাঠগ্রহণ করবে, অন্তঃপুর ছেড়ে সাধারণ জনসমক্ষে বার হবে এ ছিল সেদিন উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের কাছে স্বপ্নাতীত ব্যাপার। সেজন্য অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে এবং উনবিংশ শতকের প্রথমদিকে বিদেশী মিশনারি এবং ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি ও লেডিস সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন পরিচালিত যেসব বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলিতে সমাজের তথাকথিত উচ্চবর্ণ অপেক্ষা নিম্নবর্ণের বালিকারাই সাধারণত শিক্ষাগ্রহণ করতে আসতো। সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষদের মধ্যে সেগুলির বিশেষ কোন প্রভাব কাজ করেনি ; যদিও সেদিনের রক্ষণশীল দলনেতা রাধাকান্তদেব নিজে উদ্যোগী হয়ে গৌরমোহন বিদ্যালংকারকে দিয়ে 'স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক' নামে একটি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করিয়েছিলেন এবং ঐ বই ও অন্যান্য নানাবিধ সাহায্যদান করেছিলেন ঐসব বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে। যাইহোক সম্ভ্রান্ত হিন্দু সমাজের বিশেষ সাহায্য বা সাড়া না পাওয়ার জন্যই প্রধানত বালিকা বিদ্যালয়গুলি বেশি দিন স্থায়ী হতে পারেনি। স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের কাজে নেমে বেথুন সাহেব এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় উভয়েই সেদিনের সামাজিক অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সেজন্যই সম্ভবত তাঁরা সম্ভ্রান্ত হিন্দু ঘরের বালিকাদের শিক্ষার জন্যেই বেথুন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে নেমেছিলেন। সমকালীন সমাজ মানসিকতা উপলব্ধি করে বুঝেছিলেন সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার বিস্তার না ঘটলে বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষার প্রকৃত প্রসার ঘটা সম্ভব নয়, কারণ সমাজ রথের রশি রয়েছে সম্ভ্রান্ত, উচ্চবিত্ত বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর হাতে। আধাসামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে গেলে, দেশকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার অবশ্যই প্রয়োজন এবং সম্ভ্রান্ত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে থেকে মেয়েদের সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্রে না নিয়ে আসতে পারলে প্রগতির পথে সামাজিক পরিবর্তনও সম্ভব নয়। তাই বিদ্যালয় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে তাঁরা বলেছিলেন সম্ভ্রান্ত হিন্দু ঘরের মেয়েদের ছাড়া আর কাউকে বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে না। তবে এই সঙ্গে এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বেথুন স্কুলের পরিচালকমণ্ডলীর সম্পাদকরূপে কাজ করতে করতেই বিদ্যাসাগর বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৮৫৪ সালের উডের দলিলে স্ত্রী শিক্ষার অনুকূলে সুপারিশ করা হয়েছিল এবং তারই ভিত্তিতে সরকার থেকে স্ত্রী

শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়া হয়। বাংলাদেশে তখন ছোটলাট হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের উপরই স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব অর্পণ করেন। বিদ্যাসাগর তাঁর নুতন কর্মক্ষেত্র রূপে গ্রাম বাংলাকেই বেছে নেন। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তিনি যদি নিজেকে সংকীর্ণ মানসিকতার সীমায় বেঁধে রাখতেন তাহলে শহর কলকাতাকেই বেছে নিতেন আপন কর্মক্ষেত্র রূপে। বৃহত্তর জনমানসের কথা চিন্তা করে গ্রাম বাংলায় তাঁর কর্মক্ষেত্রকে বিস্তৃত করতেন না। তিনি যেমন শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সীমাবেখা মানতেন না, তেমনি উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত-সম্ভ্রান্ত-বিত্তহীন ইত্যাদি সামাজিক সীমারেখাও মানতেন না। তাই যখন দেখেছেন শহরে কাজ শুরু হয়ে গেছে, তখন প্রথম সুযোগেই চলে গেছেন গ্রামবাংলার বিস্তৃত কুমারী মৃত্তিকায় স্ত্রী শিক্ষার বীজ বপন করতে।

বেথুন সাহেব তাঁব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রথম থেকেই বিদ্যাসাগরের সাগ্রহ সাহচর্য পান, বিদ্যাসাগর ছিলেন এই বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে বেথুনের একজন উৎসাহী সহযোগী। ১৮৫০ সালেই বেথুনের অনুরোধে সাগ্রহে এই বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদকের পদ তিনি (বিদ্যাসাগর) গ্রহণ করেন এবং তখন থেকে বিদ্যালযটিব উন্নতির জন্য শতকাজের মধ্যেও তিনি নিজেকে নিয়োজিত বেখেছিলেন।

১৮৬২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিচালনায় বিদ্যালয়টির কিরূপে উন্নতি ঘটেছিল তার একটি বিবরণ পাওযা যায় — "Reading, writing, arithmetic, biography, geography and history of Bengal, with gallery lessons on objects from the course of study. Needle work and sewing are likewise taught. Instruction is imparted to the pupils through the medium of the vernacular. The tutorial staff consists of a Head Mistress, with two female assistants and two pandits. Beside general superintendence, the Head Mistress teaches needle work to the first and second classes, and revises the lessons given to them by the pandits. The second mistress teaches needle-work and sewing to the remaining classes, assisted by the third mistress. The third mistress teaches in addition the class consisting of beginners in which the phonetic system in being experimentally introduced. The pandits teach all the books read in the several classes."

উল্লিখিত রিপোর্টটি থেকে স্ত্রী শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের আধুনিক মনস্কতার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। সেদিনের অগ্রগামী ব্রাহ্মসমাজ, সমাজ প্রগতির ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন এই অগ্রগামী ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট নেতা। কিন্তু অগ্রবর্তী আধুনিক ব্রাহ্ম নেতা হওয়া সত্ত্বেও এবং স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের একজন বিশেষ উদ্যোক্তা হয়েও কেশবচন্দ্র মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি অনুযায়ী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিচালনাধীনের বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম লক্ষ্য করলে তাঁর চিন্তাধারার আধুনিকতা সম্বন্ধে

কোন প্রশ্ন ওঠে না। কেশবচন্দ্র সেনের "অন্তঃপুর শিক্ষা প্রণালী" বা রাজা রাধাকান্ত দেবের মতানুযায়ী স্ত্রী শিক্ষাকে গৃহ পরিবেশে আবদ্ধ না রেখে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রকাশ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে নারী শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা করেছিলেন। একটা সুশৃঙ্খল-সুসংগঠিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই তিনি নারী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে চেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে আরও লক্ষণীয় যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তার করার কাজে যখন আত্মনিয়োগ করেন, তখন গ্রাম বাংলাকেই আপন কর্মক্ষেত্ররূপে বেছে নেন। দক্ষিণবঙ্গের বিশেষ বিদ্যালয় পরিদর্শকরূপে তিনি নিজের এলাকার অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন জেলায় প্রায় কুড়িটি আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিপূর্বে ১৮৫৪ সালের ২১মে থেকে ১১ই জুন পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজের ছুটির সময় হুগলী জেলার শিয়াখালা রাধানগর, কৃষ্ণনগর, ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোনা, শ্রীপুর, মায়াপুর, রামজীবনপুর প্রভৃতি গ্রাম পরিদর্শন করেন এবং নদীয়া, বর্ধমান ও চব্বিশ পরগণার গ্রাম সম্বন্ধে খোঁজ খবর করে জেনেছিলেন যে, গ্রামবাসীরা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী এবং তারা বিদ্যালয়ের জন্য বাড়ি তৈরি করে দিতেও রাজি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে বিভিন্ন গ্রামে আদর্শ বিদ্যালয়গুলি স্থাপন করা সার্থক ও সুফলপ্রসূ হয়েছিল। এই বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠার তিন বছর পরে তাঁর রিপোর্টে আমরা দেখতে পাই — ঐসব, আদর্শ বিদ্যালয়গুলি ছাত্রদের বাংলাভাষায় সুন্দর জ্ঞান হয়েছে এবং তারা অন্য নানা বিষয়েও যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেছে। রিপোর্টটি এখানে উদ্ধৃত করা হল —

" It is now about three years since our operations commenced and the Model Vrenacular Schools have been established. During this short period, the progress of these Institutions has really been very satisfactory. The pupils have gone through all the vernacular Books, suited to such institutions and may be said to have acquired a thorough knowledge of the language and to have made respectable progress is several branches of useful studies.

At the commencement of our operations, doubts were entertained in several quarters as to whether the Model schools could be duly appreciated by the people in the interior. These doubts. I am happy to state, have long since been fully removed by the almost complete success of those institutions. The people of the villages in which they are located, as well as those of contiguous places who are also benefited by them, look upon the schools as great blessings and feel greatful to government for them. That the institutions are highly prized is evident ftom the number of pupils attending each of them. In two of the schools the number is comparatively small; but this is accounted for more by the inability of the majority of the inhabitants of the villages, in which they are situated , to afford for schooling fees and class-books for their children than for want of Zeal and interest in the institutions.......The two old vernacular schools at

Ooterparah and Midnapur were in a very Hourishing condition during the sessions, especially the latter, which has gradually risen to the high standard of the Model Schools".

শুধু আদর্শ বিদ্যালয় নয়, তাঁর চেষ্টায় আরও বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মেদিনীপুরের ঘাটালে তিনি বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ১৮৫৩ সালে নিজের গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং ১৮৫৯ সালের ১লা এপ্রিল তাঁর তত্ত্বাবধানে পাইকপাড়ার রাজাদের দ্বারা কান্দির ইংরাজী-সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিক্ষা বিস্তারকে তিনি জীবনের পরমব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেই ব্রত পালন করে গেছেন। জীবনের একেবারে শেষপ্রান্তে এসেও তিনি স্বগ্রাম বীরসিংহে স্থাপন করেছিলেন ভগবতী বিদ্যালয় (১৮৯১) আর কার্মাটারে মাসিক কুড়িটাকা ব্যয় করে সাঁওতালদের জন্য স্থাপন করেছেন পাঠশালা। সমাজ সংস্কারের সব কর্মচাঞ্চল্য থেকে নিজেকে সরিযে নিয়ে এসেও সরাতে পারেননি নিজেকে শিক্ষা বিস্তার প্রচেষ্টা থেকে। যতক্ষণ পর্যন্ত কিছুমাত্র শারীরিক সামর্থ ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত মেট্রোপলিটন স্কুল কলেজ ছিল তাঁর নিত্য সাধনার ক্ষেত্র। তিনি বাংলার আপামর জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিলেন বলেই বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কলকাতা শহরের উচ্চ ও মাধ্যবিত্ত হিন্দু ভদ্র ঘরের মেযেদের শিক্ষার জন্য বেথুন সাহেব প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালযে অবৈতনিক সম্পাদক হিসাবে কর্মরত অবস্থাতেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই কাজের উপযুক্ত ক্ষেত্র হল গ্রামবাংলা। দেশের অধিকাংশ মানুষই যেখানে বাস করে এবং নিরক্ষতার ও অশিক্ষাব অন্ধকারে জনগণের অধিকাংশই যেখানে নিমজ্জিত হয়ে আছে সেই পল্লীগ্রামেই যে শিক্ষাবিস্তারের প্রকৃত আদর্শক্ষেত্র এ সত্য তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই সেই উপলব্ধিকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্ররূপে গ্রাম বাংলাকে বেছে নেন।

এরপরের ইতিহাস সকলেরই জানা। দক্ষিণবঙ্গের বিদ্যালয়গুলির বিশেষ পরিদর্শকরূপে তাঁর এলাকাভুক্ত জেলাগুলির বিভিন্ন স্থানে ১৮৫৭ সালের নভেম্বর মাস হতে ১৮৫৮ সালের মে মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় পঁয়ত্রিশটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলে। মানবপ্রেমিক বিদ্যাসাগর সমাজের নিপীড়িত মানুষের বেদনা মর্ম দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। কারণ নিজে তিনি ছিলেন নিপীড়িত। শৈশব ও বাল্যজীবন কেটেছে দুঃসহ দারিদ্র্য ও কঠোর পরিশ্রমে। বীরসিংহ গ্রামের পাঠশালায় এবং কলকাতা শহরের সংস্কৃত কলেজে ছাত্রাবস্থায় ধনী-দরিদ্র উভয়শ্রেণীর সহপাঠীদের সঙ্গেই একযোগে পাঠগ্রহণ যেমন করেছেন তেমনই দেখেওছেন উভয়শ্রেণীর বৈষম্যমূলক জীবনাচরণ। বাল্য সহচরীর অকাল বৈধব্য, শিক্ষক শম্ভুনাথ তর্ক বাচস্পতিব বালিকা বধূ বিধবা রাইমণির অপত্যস্নেহ, পিতামহ রামজয় তর্কালঙ্কারের স্ত্রী পিতামহী

দুর্গাদেবীর সুতো কেটে ছয়টি সন্তানসহ কঠোর জীবনযাত্রা নির্বাহ — এসব কিছুই অতি শৈশব থেকে বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে গেঁথে গিয়ে পরবর্তী জীবনে স্ব সমাজের অর্ধেক নিপীড়িত মানুষের বেদনা মোচনের সংগ্রামে তাঁর মনকে প্রস্তুত করছিল। স্বদেশের সর্বাধিক অবহেলিত, উৎপীড়িত এবং উপেক্ষিত নারী সমাজের উন্নতির জন্য তাদের আপন অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বিদ্যাসাগরের সংগ্রামী মানসিকতার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল তাঁর বাল্যকাল থেকেই। একমাত্র শিক্ষাই যে মানুষের মন থেকে সমস্তরকম অন্ধ কুসংস্কারেব অবসান ঘটাতে পারে — এই সত্য তিনি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করতেন ; তাই সমাজ সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা সংস্কারের কাজও করেছেন সমানভাবে। সমাজের মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে যে সমাজকেও সংস্কার করা যাবে না, আবার অপরপক্ষে সামাজিক সংস্কার সাধিত হতে পারে যে যুক্তি ও বিচারবোধের সাহায্যে সেই যুক্তি ও বিচারবোধও আসতে পারে একমাত্র শিক্ষারই মাধ্যমে-এই মৌলিক সত্যকে তিনি মনে প্রাণে অনুধাবন করেছিলেন বলেই তাঁর সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা সংস্কারের কাজ চলেছিল প্রায় পাশাপাশি। তাঁর সংগ্রাম পদ্বতি ছিল বৈপরীত্যময়। জন্মেছিলেন দরিদ্র পরিবারে। চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে বড় হয়ে উঠতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু তাঁর মত দাতা দ্বিতীয় কেউ আর হতে পারলেন না। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন, অথচ সমস্ত জীবনব্যাপী সংগ্রাম করে গেলেন রক্ষণশীল ঐতিহ্যগত সমস্ত রকম আচার-বিচার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। শিক্ষালাভ করেছিলেন সংস্কৃত কলেজে-সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যে-ব্যাকরণ স্মৃতিই যেখানে মূল উপজীব্য, কিন্তু তিনি শিক্ষা সংস্কার করতে গিয়ে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ভালোভাবে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে মত দিলেন। কারণ তাহলে দেশীয় ক্লাসিকাল ঐতিহ্যের প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয়ে এবং ইংরাজী ভাষার শব্দভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য নিয়ে বাংলাভাষা উৎকর্ষতা লাভ করতে পারবে। সংস্কৃত কলেজকে তিনি সেকালের 'টোল'-'চতুষ্পাঠী' করে গড়ে তুলতে চাননি, আবার হিন্দু কলেজের মত 'দেশী সাহেব' তৈরির প্রতিষ্ঠানও করতে চাননি। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিদ্যার মিলনকেন্দ্ররূপেই গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি সংস্কৃত কলেজকে। তবে শুধু সংস্কৃত কলেজ নয়, সারা বাংলাদেশকেই তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলন তীর্থ করতে চেয়েছিলেন, এই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কামনা। নারী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রেও তিনি এই মনোভাব নিয়ে কাজ করেছিলেন। সর্বসংস্কারমুক্ত উদার মানবিকতার দৃষ্টি নিয়ে তিনি নারীশিক্ষা প্রসারের চেষ্টা করেছিলেন। অবরোধ মুক্ত প্রকাশ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আধুনিক প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি বাংলাদেশের মেয়েদের। ছেলেদের মত মেয়েরাও যাতে প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে পঠন পাঠনের সুযোগ পায় সেজন্যই গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বহু সংখ্যক বালিকা বিদ্যালয় আর শহর কলকাতায় বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে বিশ বছর ধরে করেছিলেন অক্লান্ত পরিশ্রম।

প্রাচীন ঐতিহ্যবোধের সঙ্গে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে রচনা করেছিলেন

নারী শিক্ষা পাঠক্রম যা বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে আমরা দেখতে পেয়েছি।

১। Report on public instruction in Bengal for 1857-1858 [Report of Pandit Iswar Chandra Sarma. Special Inspector of Schools South Bengal for 1857-1858; উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাঠাগারের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

২। Notes on the Sanskrit College, বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তা - (১) বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (১ম খণ্ড।। শিক্ষা, পৃ: ৪৪৩, ১৪)

৩। ব্যালান্টাইনের রিপোর্টের বিষয়ে বিদ্যাসাগরের পত্র-বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তা - (২) বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (১ম খণ্ড।। শিক্ষা পৃ: ৪৫১-৪৫৪)

৪। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ - বিনয় ঘোষ, পৃ: ২৫৪

৫। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ - বিনয় ঘোষ - পৃ: ২৫৫-২৫৬

৬। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ - শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ: ৩৬৭

৭। বিদ্যাসাগরের শিক্ষানীতি ও বর্ণপরিচয়-সন্তোষ কুমার অধিকারী, পৃ:৫২

৮। করুণাসাগর বিদ্যাসাগর- ইন্দ্র মিত্র পৃ: ২০১

৯। করুণাসাগর বিদ্যাসাগর-ইন্দ্র মিত্র পৃ: ২০১

১০। History of the Bethune School and College (Bethune School & College centenary Volume : page-23).

১১। Woman's Education in Eastern India-Joges Chandra Bagal, Page : 11-12

১২। History of the Bethune School and College (Bethune School & College centenary volume,Page : 24)

১৩। Report on Public Instruction in Bengal-1857-1858; উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাঠাগারের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

১৪। বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে-ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৪৫।

বিদ্যাসাগরের মহৎ কীর্তি

এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রী বিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ গ্রন্থে 'বাংলা শিক্ষা' অধ্যায়ে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখ করা আবশ্যক বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন ঃ "বাংলাদেশের গ্রামে আধুনিক শিক্ষার আলোক বিদ্যাসাগরই যে প্রথম বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন তা নয়। তার আগে খ্রীষ্টান মিশনারিরা পথ দেখিয়েছিলেন। রবার্ট মে, ক্যাপ্টেন জেমস্ স্টুয়ার্ট, শ্রীরামপুরের ব্যাপ.টিস্ট মিশনারিরা গ্রামাঞ্চালে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। বাঁশবেড়িয়া অঞ্চলে তত্ত্ববোধিনী সভার পাঠশালার কথা স্মরণীয়। হার্ডিঞ্জের বঙ্গ বিদ্যালয়গুলির কথাও ভোলা যায় না। বিদ্যাসাগরের আগে বাংলার গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের এই প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। কলকাতা শহরের বাইরে একটা বৃহত্তর সমাজ বৃত্তের মধ্যে এইসব প্রচেষ্টার ফলে শিক্ষা সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ জেগেছিল। ...কিন্তু সেই আগ্রহের বীজ অল্পকালের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যেত, কোন ফসল ফলতো না, যদি বিদ্যাসাগর পরবর্তীকালে এইভাবে বাংলা শিক্ষার ক্ষেত্রে মডেল স্কুলের পরিকল্পনা নিয়ে অবতীর্ণ না হতেন। ...কলকাতা শহরের বাইরে, ছোট ছোট নগরের সীমানার মধ্যে, এবং তার আশেপাশে পাদ্রী সাহেবদের শিক্ষাদানের উদ্যম অধিকাংশই ব্যয় হয়েছে। এই ভৌগোলিক সীমানার বাইরে বাংলা মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করে, গ্রামাঞ্চলের সুদূর অভ্যন্তরে পর্যন্ত বিদ্যাসাগর শহর থেকে দূরে শিক্ষার বার্তা বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার প্রচেষ্টার প্রসঙ্গেও শ্রী বিনয় ঘোষের উল্লিখিত মন্তব্যটি সর্বতোভাবে প্রযোজ্য বলে মনে করি।

এদেশের মেয়েরা লেখা পড়া শিখে শিক্ষিতা হয়ে উঠুক—এটা বিদ্যাসাগর মহাশয় মনে প্রাণে চেয়েছিলেন। আর নিজের স্বভাব অনুযায়ী যা তিনি মনে প্রণে চাইতেন তা কাজে পরিণত করার জন্য উঠে পড়ে লাগতেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে উডের দলিলের সুপারিশ অনুযায়ী ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতীয় বালিকাদের শিক্ষার জন্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করার কথা বলেন। এ বিষয়ে লেফ্‌টেনান্ট গভর্নর হ্যালিডে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলোচনা করেন। হিন্দু সমাজ তখনও পর্যন্ত প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণের জন্য পাঠানোর মতো উদার হয়ে ওঠেনি। পাঠগ্রহণের জন্য প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে মেয়েদের পাঠালে পারিবারিক মর্যাদাহানি ঘটবে বলে তাঁরা মনে করতেন। কর্মযোগী বিদ্যাসাগর সমস্ত প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে কার্যক্ষেত্রে নেমে

পড়লেন। জৌগ্রামের বালিকা বিদ্যালয়টি ছাড়াও আরও কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য সাহায্যের আবেদন করা হয় এবং ছোটলাট সবকটি আবেদনই মঞ্জুর করেন (দ্রঃ ৩য় অধ্যায়, পৃঃ ৫৭)। কাজেই মেয়েদের শিক্ষার প্রসারে বাংলা সরকারের সমর্থন আছে মনে করে প্রবল উৎসাহে বিদ্যাসাগর একের পর এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করতে লাগলেন নিজের এলাকায়। কারণ তখন তিনি দক্ষিণবঙ্গের বিদ্যালয়গুলির বিশেষ পরিদর্শক রূপে কাজ করছেন। গ্রামবাসীরাও উৎসাহের সঙ্গে বিদ্যলয়ের গৃহ নির্মাণ করে দিতে রাজি হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে বিদ্যাসাগর তাঁর রিপোর্টে বলেছেন, ". .Having put the Model Schools in to working order, I directed my chief attention to the establishment of–Female Schools in the districts in my division. I succeeded in opening 40 schools during the session and in the subsequent month of May and June Last. The total number of girls attending the schools amounts to 1348. Several parties dissuaded me from undertaking the task, because they thought that the inhabitant of the Interior would never consent to send their girls to public schools. I, however felt within myself that with energetic exertion I could be sure of success. I accoringly set to work and I am happy to be able to state that I have not only made the people sympathize in the good cause, but that they have come forward with alacrity and sent their daughters to the new schools... I am confident that I would have been able to establish similar schools in almost every village in the Districts under me. ...Thus a change may be said to have come over the spitirt of the times, and this may be reckoned as a new era in the history of Education in Bengal."

ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা মহাপুরুষের অভিমত যে উত্তরকালে সত্য হয়েছিল তার প্রমাণ বাংলাদেশের আধুনিক ইতিহাস এবং তৎপরবর্তী ঘটনাবলী। বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানের অগ্রগতি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ সহ সমগ্র বিশ্বের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন. আধা সামন্ততান্ত্রিক প্রথার অবসানে কিঞ্চিৎ গণতান্ত্রিক বাতাবরণের সৃষ্টি এবং সেই গণতান্ত্রিক আবহাওয়ায় লালিত মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বোধের উন্মেষ, আর এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বোধের উন্মেষের ফলেই সমাজে নারীর অধিকার আজ স্বীকৃত সত্য। উল্লিখিত পরিবর্তনগুলির ফলশ্রুতি স্বরূপ নারী শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা, সামাজিক অগ্রগতি ও সন্তানের সুষ্ঠু পালনের জন্য স্ত্রী শিক্ষার উপযোগিতা এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে নারীরও আজ সম অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ, নারীমুক্তি এবং নারী শিক্ষার ক্ষেত্রের সেদিনের সামাজিক অন্তরায়গুলি আজ আর কোন অন্তরায়ই নয়, যে অন্তরায়গুলির অবসানের জন্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

সংগ্রাম করে গেছেন। এই সংগ্রমের সঙ্গী হিসাবে কখনো একাধিকজনকে তিনি সঙ্গে পেয়েছেন, কখনো বা এককভাবেই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে তাঁকে। আবার অনেকের কাছে প্রতারিতও হয়েছেন বারবার, এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন জনের কাছে তাঁর লেখা চিঠিপত্রগুলোকেই আমরা উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ বলে মেনে নেব। সেগুলি হলো (১) 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফান্ড' এর পরিচালক বর্গকে লেখা চিঠি (এই অধ্যায়ের শেষ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত)। (২) শ্রীযুক্তবাবু প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীকে লেখা চিঠি ..."ফল কথা এই, আমার আত্মীয়রা আমার পক্ষে বড় নির্দয়, সামান্য অপরাধ অথবা অপরাধ কল্পনা করিয়া আমায় নরকে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন। এই সংস্কার অনেক দিন পূর্বে আমার হৃদয়ে প্ররুঢ় হইয়া ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছে, ...(বিদ্যাসাগরের পত্রাবলী, বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেন্টার প্রকাশিত, পৃঃ ৫৭)। (৩) ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা ঋণগ্রস্ত বিপন্ন বিদ্যাসাগরের চিঠি (বিদ্যাসাগরের পত্রাবলী, বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেন্টার প্রকাশিত, পৃঃ ৬১-৬২)। (৪) বীরসিংহ গ্রামের অন্যতম প্রধান অধিবাসী গদাধর পালকে লেখা চিঠি (৫) হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদককে লেখা এই চিঠিটিতে বিদ্যাসাগরের একক ব্যক্তিত্বের প্রবল প্রকাশ প্রতিফলিত হয়েছে অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে। (বিদ্যাসাগরের পত্রাবলী, বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত পৃঃ ৬৪-৬৬)। (চিঠিগুলি এই অধ্যায়ের শেষে উদ্ধৃত করা হয়েছে)। তবু তিনি তাঁর লক্ষ্য থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুত হননি। সংগ্রাম অসমাপ্ত রেখে মাঝ পথে ফিরে যাননি নিজ সংসারের নিভৃত নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বলা হয় মূর্তিমান যুগবিভাজিকা। রক্ষণশীল প্রাচীন মানসিকতা ও নব্য প্রগতিশীল আধুনিক মানসিকতার মধ্যবর্তী সেতু স্বরূপ ছিলেন তিনি। তাঁর পূর্বসূরি রামমোহন চেয়েছিলেন প্রাচ্য-প্রাশ্চাত্য সভ্যতার সমন্বয় সাধনের, বিদ্যাসাগর-রামমোহনের সেই সমন্বয় সাধনের চিন্তাধারাকে বাস্তবে রূপ দিতে চেয়েছিলেন (তাঁর এই প্রচেষ্টার সমর্থন মেলে "Notes on the Sanskrit College" শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ শিক্ষা সংস্কারমূলক পরিকল্পনার রচনায় এবং বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালান্টাইনের রিপোর্টের সমালোচনায় (এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা ৪র্থ অধ্যায়ে করা হয়েছে)। তাঁর সমস্ত সমাজ সংস্কারমূলক কাজের সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিক্ষা সংস্কারের কাজেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কারণ শিক্ষা বিস্তারের ফলে সামাজিক উন্নয়ন যে সহজতর হবে—এ সত্য তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন, তাই শিক্ষা ও সমাজ —উভয় ক্ষেত্রেই সংস্কারের সম্মার্জনী হস্তে সমভাবে তিনি বিচরণ করেছিলেন। তিনি যেমন একদিকে বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি সামাজিক কুপ্রথাগুলি উচ্ছেদের জন্য প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করেছিলেন, তেমনি অন্যদিকে গণশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

বিদ্যাসাগর যে বালিকা বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেগুলির একটি তালিকা দেওয়া গেল :

	হুগলী জেলা প্রতিষ্ঠাকাল	মাসিক টাঃ পঃ
১। পোলবা	২৪-১১-১৮৫৭	২৯.০০
২। দাসপুর	২৬-১১-১৮৫৭	২০.০০
৩। বঁইচি	০১-১২-১৮৫৭	৩২.০০
৪। দিগ শুই	০৭-১২-১৮৫৭	৩২.০০
৫। তালাণ্ডু	০৭-১২-১৮৫৭	২০.০০
৬। হাতিনা	১৫-১২-১৮৫৭	২০.০০
৭। বয়েরা	১৫-১২-১৮৫৭	২০.০০
৮। ন'পাড়া	৩০-০১-১৮৫৮	১৬.০০
৯। উদয়রাজপুর	০২-০৩-১৮৫৮	২৫.০০
১০। রামজীবনপুর	১৬-০৩-১৮৫৮	২৫.০০
১১। আকাবপুর	২৮-০৩-১৮৫৮	২৫.০০
১২। শিয়াখালা	০১-০৪-১৮৫৮	২০.০০
১৩। মাহেশ	০১-০৪-১৮৫৮	২৫.০০
১৪। বীরসিংহ (বর্তমানে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত)	০১-০৪-১৮৫৮	২০.০০
১৫। গোয়ালসারা	০৪-০৪-১৮৫৮	২৫.০০
১৬। দণ্ডীপুর	০৫-০৪-১৮৫৮	২৫.০০
১৭। দেপুর	০১-০৫-১৮৫৮	২৫.০০
১৮। রাউজাপুর	০১ ০৫-১৮৫৮	২৫.০০
১৯। মলয়পুর	১২-০৫-১৮৫৮	২৫.০০
২০। বিষ্ণুদাসপুর	১৫-০৫-১৮৫৮	২০.০০

	বর্ধমান জেলা	মাসিক খরচ
১। রাণাপাড়া	০১-১২-১৮৫৭	২০.০০
২। জামুই	২৫-০১-১৮৫৮	৩০.০০
৩। শ্রীকৃষ্ণপুর	২৬-০১-১৮৫৮	২৫.০০
৪। রাজারামপুর	২৬-০১-১৮৫৮	২৫.০০
৫। জ্যোৎ-শ্রীরামপুর	২৭-০১-১৮৫৮	২৫.০০
৬। দাঁইহাট	০১-০৩-১৮৫৮	২০.০০
৭। কাশীপুর	০১-০৩-১৮৫৮	২১.০০
৮। সানুই	১৫-০৪-১৮৫৮	২৫.০০
৯। রসুলপুর	২৬-০৪-১৮৫৮	৩১.০০

	হুগলী জেলা প্রতিষ্ঠাকাল	মাসিক টাঃ পঃ
১০। বঁত্তীর	২৭-০৪-১৮৫৮	২০.০০
১১। বেলগাছি	০১-০৫-১৮৫৮	২০.০০
	মেদিনীপুর জেলা	মাসিক খরচ
১। ভাঙ্গা বন্ধ	০১-০১-১৮৫৮	৩০.০০
২। বদনগঞ্জ	১০-০৫-১৮৫৮	৩১.০০
৩। শান্তিপুর	১৫-০৫-১৮৫৮	২০.০০
	নদীয়া জেলা	মাসিক খরচ
১। নদীয়া	০১-০৫-১৮৫৮	২৮.০০

এই বিদ্যালয়গুলির জন্য মাসিক খরচ ছিল মোট ৮৪৫ টাকা, ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১৩৪৮। বিদ্যালয়গুলির জন্য অর্থ সাহায্যের ব্যাপারে সরকারী মহলে যেসব চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়, সেগুলি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা হল :

ভারত সরকারের লেখা বাংলা সরকারের তদানীন্তন জুনিয়র সেক্রেটারি সি টি বাক্‌ল্যান্ডের চিঠি ·

"The proposals connected with Female Education which are refered to in the table (পৃষ্ঠা ১২ দ্রষ্টব্য) above given are perhaps of sufficient importance to justify my here inserting the following correspondence.

No. 695

From : The Junior Secretary to the Govt.of Bengal.
To the Secretary to the Govt of India, Home Department.

Dated : Fort William, the 13th April, 1858

General Education,
Sir,

"I am directed to bringh to the notice of Hon'ble the President in Council that Lieutenant Governor has recieved applications from the Director of Public Instruction for grants-in aid of numerous Native Female Schools, which it is proposed to establish in different districts in East & South Bengal, but at present His Honor finds himself precluded from giving, any assistance to these Institutions unless the rules in force regarding ordinary grants-in-aid are, to some extent, specially relaxed in their favour.

"It can admit of little doubt that Female Schools, if heartily encouraged and carefully fostered, will be most important and useful in the promotion of civilization and the Hon'ble the Court of Directors in their dispatch No. 96 of the 1st October, 1856 to the address of the government of India were pleased to give a certain amount of hope of encourgement by exempting Female Schools from the payment of schooling fees : But the

very slender hold which these institutions have at present on the sympathies of the people renders it absolutely necessary that some futher concession should be made in their favour until their good effect may come to be more widely felt and appreciated by the native public. "The principal obstacle which is encountered in any attempt to establish a female school is to be found in the reluctance with which the respectable inhabitants of a Hindoo town or villege can be persuaded to allow therir girls to attend such an institution. If their consent to this point is obtained, it must be considered that a great object is accomplished, and where even this much is effected, it would be a pity to withdraw from the field without taking advantage of this favorable manifestation of opinion. If but a small beginning is made, it may, in a short time, become a custom that the daughters of a native family should be educated, and their attendance at school may come to be looked on as much a matter of course as it is now for the boys of a family.

"From the applications before the Lieutenant Governor it appears that in most instances the people of the village have offered to provide a house for the School. This is generally the utmost that can be expected from their scanty means and timid mind, but where this is done, and as many as 20 girls of decent parentage can be got to attend the school, who can say how great an end is obtained?

"The number of applications now pending before the Lieutennt governer is 26, and the number of girls expected to attend the schools is 871, and His Honour confidently but respectfully solicits the authority of the Hon'ble the President in Council so far to modify the existing Rules regarding grants-in-aid on behalf of Female Schools, that whenever a suitable school house is provided and the attendance of as many as 20 girls is promised, the payment of all the other expenses of maintaining the schools shall be defrayed by Government.

I have, & C

(Signed) C. T. Buckland

Junior secretary to the Govt. of Bengal

From : C. Beadon, No. 1159 Esquire, Secretary to the Govt. of India.

Dated the 7th May, 1858

To

C. T. Buckland, Esquire,

Junior Secretary to the Govt. of Bengal.

Home Department, education.

Sir,

"I am directed to acknowledge the receipt of your Letter No. 695, dated the 13th ultimo, proposing the government should bear the Whole of the expense of the Female schools, upon condition that the people provide

some kind of a school house, and that atleast 20 girls attend at each school.

"The Hon'ble the President in Council is unwilling to allow of the abrogation of the grant-in aid Rules in favour of female Schools. His honour in Council thinks that unless Female Schools are really & materially supported by voluntary aid, they had better not be established at all, and indeed that the voluntery aid of the neighbourhood is by far the most important element of success.

'The present proposition can not therefore be entertained.

I have &C
(Signed) Cecil Beadon
Secy. to Govt. of India.

Council Chamber,
the 7th May, 1858.

বালিকা বিদ্যালয়গুলির জন্য বিদ্যাসাগর সরকারের কাছে প্রাপ্য সাহায্যের জন্য আবেদন করলেন। কিন্তু দেখা গেল যে, ভারত সরকার ঐ সাহায্য দিতে রাজি নন। (দ্রষ্টব্য : বাকল্যান্ডের চিঠির উত্তরে সিসিল বিডনের চিঠি) যদিও বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়গুলো স্থাপিত করার সময়ে সরকারের অনুমতি নেননি, কিন্তু এ ব্যাপারে যে সরকারের সাহায্য পাওয়া যাবে এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। বিদ্যালয়গুলো স্থাপন করার জন্য এ পর্যন্ত যা খরচ হয়েছে তার সবটুকুই বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে করেছেন, সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয় এ বিষযে ১৮৫৮ সালের ২৪শে জুন ডি পি আই-কে যে চিঠি লিখেছিলেন সেটা এখানে উদ্ধৃত করা হল।

"With reference to the order of the Govt. of India bearing date the 7th ultimo forwarded with your cicular letter No. 1316 dated 29th idem, I have the honour to state that in anticipation of the sanction of Govt. Female schools were opened by me in several villages in the districts of Hughli, Bardwan, Nadia & Midnapore and the requisite establishment entertained in them. The schools were opened on the condition that the inhabitants of each village would provide a suitable school house, the expences for their maintenance being defrayed by Govt. The supreme Govt. however, have in their orders quoted refused to grant any aid to the schools on the above condition. ("That in the case of Female schools, grants may be given on condition that a sum equal to atleast one half the grant be supplied by private subscriptions). (দ্রঃ পৃঃ ১০৫ নং ১৫) the institutions must therefore be closed. But it is necessary that the establishment should receive their pay which they have not had since the commencement and which, It must, govt. will be pleased to pass.

It is true that the establishment was entertained by me without orders. But I must be permitted to mention that at the commencement of my operations I was not discouraged either by yourself or govt. If I had been, I would never have ventured open so many schools nor been placed in my

present difficult position. (সরকারী সিদ্ধান্তের ফলে যে অপমানজনক ও আর্থিক বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মধ্যে বিদ্যাসাগরকে পড়তে হয়, তাইতেই বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি এই উক্তি করেছিলেন বলে মনে হয়) The establishment, having been appointed by me, naturally look upto me for payment, and it will certainly be a great hardship if I am made responsible for it, especially when the expenditure has been incurred on furtherance of an object of public utility.

Under the above circumstances, I earnestly beg that you will have the goodness to recommend the case to the favourable consideration of the govt.

(Edn. dept. Consultantion,
5 August 1858, No. 16)

বিদ্যাসাগরের চিঠিতে সব জেনে ডি পি আই বাংলা সরকারকে বিদ্যাসাগরের আবেদন যাতে মঞ্জুর করা হয় সেই অনুরোধ জানিয়ে লিখলেন :

"I would venture to recommend to the generous consideration of govt. the Pandit's petition to be shielded from personal and pecuniary liability on account of the female schools which, in anticipation of the sanction and approbation of govt. he was the means of establishing.

I would solicit attention to the memorandum annexed to the Pandit's letter, as the govt. may perhaps hardly be aware of the extent of this officers voluntery and unostentatious labours in the cause of female education. If so much can be done in the villages by one individual burdened with other and distant duties, occupying a position of no great authority, and almost without aid or-countenance from his superiors, how much might not be done in the same way if the govt. were to afford its sanction and support? on the other hand, what discouragement may not be inflcted on the cause if the benevolent exertions of the officer refered to are seen to lead only to his discredit and pecuniary loss."

(Edn. Dept. Consultantion,
5th August, 1858 No. 14)

এরপর ছোটলাট ভারত সরকারকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ জানিয়ে লিখলেন—

"The Lieutenant-Governor desires earnestly to support the recommendations of the D.P.I. and his Honour is not without hope that when the Hon'ble the President in Council in made aware of the number of promising female schools which had been actually established by the unostentatious zeal of the very intelligent and meritorious principal of the Sanskrit College, and which will now, together with the keen and anxious hopes and anticipations to which they have given rise, be suddently extinguished, he may perhaps be disposed spontaneously to reconsider the orders of the 7th May" (edn. dept. consultation. 5 August, 1858, No.17)

এর — উত্তরে ভারত সরকার জানতে চাইলেন পণ্ডিত মহাশয় কি করে ধরে নিলেন যে সরকারী সাহায্য পাওয়া যাবে ? তিনি যে একটার পর একটা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন সরকারের লিখিত আদেশ ছাড়া তার জন্য দায়ী কে ? এই প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যাসাগর ডি পি আইকে ১৮৫৮ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর একটা চিঠি লিখেন — সে খানা এই :

"I have the honour to state that as some female schools on this footing had already been established with the sanction of the govt., I believed that the plan was generally approved. I Inveriably reported to your office the establishment of every new school, and usually in the month succeeding that in which it was opened. My several applications foı the eatablishments required in these schools were always entertained by you though no orders were ever passed, and during a period of several months I was not in any way discoutaged in the course I was taking, which I belived to be in accordance with the wishes of the govt." (Edn. Dept. Consultation, 2 December 1858 No. 4).

ডি পি আই ১৮৫৮ সালের ৪ঠা অক্টোবর নিজ মন্তব্যসহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিঠিটি বাংলা সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেন। ডি পি আই মন্তব্য করেছেন :

"For my part, knowing or believing that the Pandit had been in personal communication with the liutenant Governor on the subject during my own absence from Calcutta, and inferring from your letter (No. 503) of the 21st. October that the Govt. was prepared to regard his exertions with favour, I did not hesitate to send on his reports to govt. (as Mr. Woodrow in my absence had done) without delay, discouragement or remark.

I regret to say that the untoward result with which the action of the department in this matter had been attended has given a "heavy blow and great discuragement" to the cause of female education, from the effects of which, I fear, nothing that is likely to be now done will enable it speedily to recover," (দ্রষ্টব্য Edn. Dept. Consultation 2 December 1858 No. 3;)

এই প্রসঙ্গে ১৮৫৮ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর দক্ষিণবঙ্গের স্কুলগুলির পরিদর্শক হেনরি উড্রো শিক্ষা অধিকর্তা গর্ডন ইয়ং কে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তাতে তিনি লিখেছিলেন :

The rule now observed in Bengal is that an Inspector of schools who wishes to see native females Instructed must pay for his schools himself. I have been cautions in gratifying my wishes, but Pundit Ishwar Chandra Bidyasagar opened 40 femal schools, secured and attendance of more than 1300 girls of good caste and soon found himself lible for between three and four thousand Rupees." (Gen Report on Public Instruction in the Lower Proviences of the Bengal Presidency, for 1857-58, Appendix A, P. 52)

কর্মক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অসামান্য নিষ্ঠা ও নৈপুণ্য তৎকালীন বিদেশী শাসকদের একাংশকে যে মুগ্ধ করেছিল উল্লিখিত রিপোর্ট ও চিঠিপত্রে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তাঁদের মন্তব্যগুলিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ বালিকা বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিদ্যাসাগরের উপর যে আর্থিক দায় এসে পড়ে সে সম্বন্ধেও তাঁরা বিদ্যাসাগরের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। সেই আর্থিক দায় থেকে তাঁকে উদ্ধার করবার জন্য সেই সব সহানুভূতিশীল বিদেশী সরকারী কর্মচারী ও শাসককুলের একাংশ চেষ্টার ত্রুটি করেননি। উডের দলিলের সুপারিশের উপর নির্ভর করে (স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কিত) এই বালিকা বিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ছোট লাট হ্যালিডে থেকে আরম্ভ করে বিদ্যাসাগর মহাশয় পর্যন্ত সকলেই এই ধারণা করে নিয়েছিলেন যে ভারত সরকার তাঁর প্রতিশ্রুতি মতো অর্থ সাহায্য দিতে কার্পণ্য করবেন না। সেজন্য সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই তিনি কাজ করে যাচ্ছিলেন। ফলে ঐ সব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার খরচ বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করার কথা যখন বলা হলো, তখন ভারত সরকার রাজি হলেন না অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করতে। কিন্তু বিদ্যালয়গুলি তখন চালু হয়ে গেছে। কাজেই বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেই ঐসব বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-কর্মী প্রভৃতির মাহিনা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ বহন করতে লাগলেন কিন্তু এতগুলি বিদ্যালয়ের ব্যয় স্থায়ীভাবে বহন করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ভাবেই সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং ১৮৫৮ সালের ২৭শে নভেম্বর ছোটলাট ভারত সরকারকে সমস্ত ঘটনা খোলাখুলি জানিয়ে চিঠি দিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন অত্যন্ত কর্মোদ্যমী পুরুষ। যে কাজ একবার করবেন বলে মনস্থ করতেন কাল বিলম্ব না করে সে কাজ সমাধা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তেন। বৃথা কালক্ষেপ করা ছিল তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। সরকারী রীতিতে মন্থর গতিতে কাজ করতেও তিনি পছন্দ করতেন না। সেজন্যই সরকারী অনুদানের জন্য অপেক্ষা না করে বালিকা বিদ্যালয়গুলি স্থাপন করে ফেলেছিলেন। বিদ্যালয়গুলির পরিচালনাব ব্যয় বাবদ তিনি নিজ তহবিল থেকে ৩,৪৩৯,৩ পয়সা, ৩ পাই খরচ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর রিপোর্টে বলেন (Report on Public Instruction in Bengal 1857-1858, Apendix A,Pp-1979-80)

"... ... The schools were established on the understanding that the inhabitants would provide suitable school houses the expenses for their-maintenance being defrayed by govt. These conditions were approved by His Honour the Lieutenant Governor and strongly recommended by him; but the Supreme Govt. unfortunately took a different view and refused their sanction to their establishment except under the grant-in-aid Rules.

(সরকারী অনুদান পেতে হলে স্কুলের বাড়ি ঘর থাকতে হবে, উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষার্থী ও শিক্ষক থাকতে হবে, শিক্ষা হবে ধর্মনিরপেক্ষ, শিক্ষার উপকরণ থাকতে হবে, ছাত্রদের কাছ থেকে স্বল্প বেতন আদায় করতে হবে এবং স্থানীয় পরিচালক সভা থাকতে হবে। এই সব শর্ত পূরণ করে কোন্ স্কুল অনুদান পাবে সে বিষয়ে

সিদ্ধান্ত নেবেন সরকারী শিক্ষা বিভাগ, অবশ্যই পরিদর্শকের রিপোর্টের ভিত্তিতে)।

My labours have thus become fruitless and the interesting little schools will have to be closed immediagely.

অতঃপর ভারত সরকার বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলির জন্য স্থায়ী কোন মাসিক সাহায্য মঞ্জুর করেননি। কিন্তু ঐ বিদ্যালয়গুলির জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজের যে প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা খরচ হয়েছিল-- সেই টাকাটা ভারত সরকার মঞ্জুর করে দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ভারত সরকার যে চিঠি লিখেছিলেন—সেই চিঠিটি এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

ভারত সরকারের চিঠি :

"It is to be regretted that the Pandit's scheme of opening female schools on a plan opposed to the orders of the Hon'ble Court, but in the name of the Govt. and in anticipation of sanction, should not have been discour aged at once, As it is evidentced, however, that the Pandit acted in good faith, and with the encouragement and approbation of his superiors. His Honour in council is please under all circumstances, to relieve him from responsibility for the sum of Rs. 3,439-3-3 (বিদ্যালয় বাবদ বিদ্যাসাগরের নিজস্ব প্রাপ্য টাকা) actually expended on these schools, and to direct that it be paid by the govt.

With regard to the future the President in Council observes that, so far as can be gathered from these papers, there is no security for the permanent character of any of the schools, and that the only sound material guarantee for their success, namely the voluntary support of the neighbourhood, is wholly wanting. It is not even stated that school houses have been built Not an argument is brought forward to shake the decision of the govt. of India already taken, that the main principle of the grant-in-aid rules shall not be relaxed in favour of these female achools. If keen and anxious hopes really exist, a small monthly payment is no very violent rest of them.

With reference to the above considerations and to paragraph 38 of the Hon'ble Court's despatch, dated the 22nd June last, the President in council must decline to give his sanction to the grant of any public money for the continued support of the female schools opened by Pandit Ishwarchandra, or for the establishment of the govt. schools it is proposed to set up in their stead. The correspondence will be forwarded for the consideration of the Rt. Hon'bel the Secretary of State, with a recommendation that a grant not exceeding Rs. 1,000 per mensum may be made for the establishment of female schools in Hughli, Bardwan, and the 24-Parganas, a portion to be expended in assisting such schools as were established by Pandit Ishwarchandra Sharma, and a portion on a few model schools to be supported by the Govt.

(Education Department consultantion, 20, January 1859, No. 9)

No. orders (No.9)

From C. Bedon Exq. Secretary to the Govt. India.

Home Dept. To C. T. Buckland sq. D. Secy to the Govt. Bengal. (No. 2796) dated 22nd December 1858.

এই চিঠিটা ভাল করে অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে, ভারত সরকার বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে আর্থিক সাহায্য দিতে কোন মতেই রাজি নন। ডি পি আই রিপোর্টে পরিষ্কারভাবে একথা বলা হয়েছিল যে,

"That in the case of Female Schools, grants may be given on condition that a sum equal to at least one half the grant be supplied by Private subscriptions". (দ্রষ্টব্য- Principal Edn. discussions during 1857-58, No. 15 Page 150) বিদ্যাসাগর মহাশয় ও ডি পি আই কে পাঠানো রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলেন যে, "The schools were established on the understanding that the inhabitants would provide suitable schools Houses the expenses for their maintenance beive depoyed by the govt." দ্রষ্টব্য : Report of Pandit Ishwarchandra Surma, Spe. Inspector of schools. south Bengal for 1857-58, Para-6, P.20) (উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাঠাগারের সৌজন্যে) এমন কি ১৮৫৪ সালের উডের দলিলে স্পষ্ট ভাবেই বলা হয়েছিল যে, "We have already observed that schools for females are included among those to which grants-in-aid may be given ; and we cannot refain from expressing our cordial sympathy with the efforts which are being made in this direction. Our governor-general in council has declared, in a communication to the govt. of Bengal, that the govt. ought to give to the native female education in India its frank and cordial support ..." (দ্রষ্টব্য : ৩য় অধ্যায়, পৃঃ ৫৬-৫৭)

সুতরাং বাস্তব ক্ষেত্রে সরকারী শর্ত মেনে এবং সরকারী নির্দেশকে মেনে নিয়ে বিদ্যাসাগরের সরকারী সাহায্যের জন্য আবেদন করার মধ্যে কোনই অসঙ্গতি ছিল না। বরং সরকার পক্ষ থেকেই যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হয়েছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শুধুই আন্তরিক সমর্থন জানালেই যে সরকারী দায়িত্ব বা কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না— সরকারী সমর্থন আর সরকারী সাহায্যের মধ্যে যে কোন পার্থক্য থাকতে পারে না এটা সরকার ভালভাবেই জানতেন, সেজন্যই বিদ্যাসাগরের প্রাপ্য অর্থ যা তিনি বালিকা বিদ্যালয়গুলি স্থাপন করতে গিয়ে ব্যয় করেছিলেন তা মিটিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সরকার থেকে কোন পূর্ব প্রতিশ্রুতি না থাকলে সে টাকা তাঁরা কিছুতেই মেটাতেন না। ভারত সরকার চিঠিতে জানাচ্ছেন যে, "কাগজ পত্র দেখে যা জানা যাচ্ছে তা হল বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির স্থায়িত্ব বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। বিদ্যালয়গুলি যে স্থায়ী হবে এমন নিশ্চিন্ততাও নেই। বিদ্যালয়গুলি স্থাপনে সফলতা আসতে পারে একমাত্র স্থানীয় অধিবাসীদের স্বতঃপ্রণোদিত বাস্তব সমর্থনের উপর, যার একান্তই অভাব। এমনকি বিদ্যালয়ভবন নির্মাণ করে দেওয়ার কথাও কাগজ পত্রে উল্লেখ নেই, সরকারী সিদ্ধান্তকে পরিবর্তিত করার মতো কোন যুক্তিই দেখানো হয়নি, স্থানীয় মানুষের মধ্যে যদি সত্যই বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে

আন্তরিক ব্যগ্রতা থাকে তাহলে সামান্য মাসিক প্রদত্ত অর্থ প্রদান করা এমন কিছু ব্যাপার নয় তাদের পক্ষে।" অথচ ডি পি আই রিপোর্টে বাংলা সরকারের জুনিয়র সেক্রেটারি বাক্‌ল্যান্ড লিখেছেন" ··· The Hon'ble court of Ditectors in their Dispatch No. 96 of the 1st October, 1856 to the address of the govt. of India were pleased to give a certain amount of hope and encouragement by exempting Female schools from the payment of schooling fees ..."

বিদ্যাসাগরও তাঁর রিপোর্টে যা লিখেছেন সে সব কোন কিছুরই উল্লেখ ভারত সরকারের চিঠিতে নেই। সুতরাং বালিকা বিদ্যালযগুলিকে কোনরকম সাহায্য না করার মনোভাব নিয়েই যে ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিযেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। বার্ষিক হাজার টাকা সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিও শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার রক্ষা করেননি। কাজেই ভারত সরকারের নেতিবাচক মনোভাবের পরিচয় সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের উপলব্ধি ভালভাবেই যে হযেছিল তাতে কোন সন্দেহই নেই। শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দিযেছিলেন, তবে ভবিষ্যতে বালিকা বিদ্যালয প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আর কোন সাহায্য দিতে অস্বীকার করেন।

শিক্ষার জন্য অর্থ সাহায্য দানের এই অনীহা ঔপনিবেশিক শাসকদের পক্ষে স্বাভাবিকই ছিল। বিভিন্ন সময়ে সরকারী অর্থ কৃচ্ছ্রতার খাঁড়া শিক্ষার উপর পড়েছে। তা'ছাড়া শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়ানোর কথাও একাধিকবার সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সরকারী অর্থ কৃচ্ছ্রতার এই অজুহাত স্বাধীন ভারতেও আজও পর্যন্ত চলেছে।

কিন্তু অদম্য উৎসাহী বিদ্যাসাগর মহাশয় স্ব প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার জন্য একটি 'নারী শিক্ষা ভাণ্ডার' স্থাপন করেন। তাঁর সেই ভাণ্ডারে সম্ভ্রান্ত দেশীয় ভদ্রলোক এবং উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজকর্মচারীগণ যে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন সে সম্বন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলি অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে গেল না। বরং মাঝেমাঝেই যে নতুন নতুন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনও করেছিলেন তার প্রমাণ আছে স্যার ব্র্যাটল ক্রিয়ারকে লেখা তাঁর চিঠিতে। ১৮৫৭-৫৮ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় ডি পি আই-এর কাছে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, সেই রিপোর্টে তিনি লিখেছিলেন, "I Succeeded in opening 40 schools during the session and the subsequent months of May and June Last..."।

অর্থাৎ সবমিলিযে তিনি মোট চল্লিশটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এ পর্যন্ত মোট ৩৫টি বলিকা বিদ্যালয়ের নামই পাওয়া গেছে, যেগুলি বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ সম্পর্কে 'ইন্দ্রমিত্র' তাঁর " করুণাসাগর বিদ্যাসাগর" গ্রন্থে লিখেছেন, "··· ডি পি আই-কে লেখা বিদ্যাসাগরের ১৮৫৮ সালের ২৪ জুনের চিঠির সঙ্গে প্রেরিত একটি তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৮৫৭ সালের ২৪ নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ সালের ১৫ মে পর্যন্ত বিদ্যাসাগর

সাকুল্যে পঁয়ত্রিশটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন (দ্রষ্টব্য Edn. Dept. Consultation, 5, August 1858. No. 16)

অতএব, বাঁকি পাঁচটি বালিকা বিদ্যালয় বিদ্যাসাগর ১৮৫৮ সালের মে-জুনে স্থাপন করে থাকবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তরে যথাসাধ্য অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু উক্ত পাঁচটি বালিকা বিদ্যালয়ের বিস্তারিত বিবরণ অদ্যাবধি সংগ্রহ করতে পারিনি" (দ্রষ্টব্য : করুণাসাগর বিদ্যাসাগর—ইন্দ্র মিত্র, পৃঃ ২২২)। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে যখন তাঁর রিপোর্টে স্বপ্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা চল্লিশটি বলে উল্লেখ করেছেন তখন আমাদেরও ঐ সংখ্যাটাই সঠিক বলে ধরে নিতে হবে। যাইহোক সরকারী সাহায্য না পাওয়া গেলেও, নারী শিক্ষা দরদী উৎসাহী জনের চাঁদার টাকায় বিদ্যাসাগর মহাশয় বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে গিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, যে অমানুষিক পরিশ্রম করেছিলেন, —তাঁর সেই প্রচেষ্টাকে যে সেদিনের বাংলাদেশের শিক্ষানুরাগী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ তাঁদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন সেই সময়ে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলোতেই তাব প্রমাণ রয়েছে।

"But every man in the country is not a Vidyasaghur" (দ্রষ্টব্য ৩য় অধ্যায়, পৃঃ৩৬) 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র এই মন্তব্যটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে বিদ্যাসাগরের প্রতি সমকালীন সমাজের এবং শিক্ষানুরাগী বহু মানুষেব আন্তরিক শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি, আবার তাঁর আপাত ব্যর্থতারও পরোক্ষ স্বীকৃতি।

বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলি স্থানীয় মানুষের মনে যে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করেছিল সে সম্পর্কে আমরা জানতে পারি ডি পি আই-এর কাছে পাঠানো বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রিপোর্ট এবং ভারত সরকারের কাছে পাঠানো বাংলা সরকারের জুনিয়র সেক্রেটারি বাকল্যান্ডের আবেদনপত্র থেকে। যদিও ভারত সরকারের চিঠিতে এ সম্পর্কে বিপরীত কথাই বলা হয়েছে। ভারত সরকারের চিঠিটি সাহায্য না দেওয়ার আবরণ রূপেই লেখা হয়েছিল, সুতরাং সেই সরকারী সিদ্ধান্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং বাকল্যান্ডের রিপোর্টের বক্তব্যকে যে সমর্থন করবে না, বরং বিপরীত বক্তব্যই রাখবে— একথা বলাই বাহুল্য। গ্রামবাসীগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিদ্যালয় ভবন যেমন নির্মাণ করে দিয়েছিলেন, তেমনই সেই বিদ্যালয়ে পঠন পাঠনের জন্য আপন আপন কন্যা সন্তানদেরও প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় সরকারী সাহায্য না পাওয়াতে, শুধুমাত্র নারী শিক্ষা দরদী কিছু মানুষের দানে এবং বিদ্যাসাগরের নিজের রোজগারের টাকায় অতগুলি বালিকা বিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে চালানো যে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। সুতরাং হিন্দু পেট্রিয়টের বক্তব্য অনুযায়ী তাঁর প্রতিষ্ঠিত সেইসব বালিকা বিদ্যালয়গুলির মধ্যে অধিকাংশগুলিই যে তাদের প্রায় জন্মলগ্নেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। তবে সেগুলির মধ্যে থেকে ন'টি (হিন্দু পেট্রিয়টে উল্লিখিত ৯টি স্কুলের মধ্যে ৭টি স্কুলের সম্বন্ধে

জানা গেছে যেগুলি পরবর্তী কিছুকাল পর্যন্ত টিঁকেছিল এবং সরকারী সাহায্য পেয়েছিল, স্কুলগুলি সরকারী রিপোর্টে হিন্দু ফিমেল স্কুল বলে উল্লিখিত আছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হবে)। বালিকা বিদ্যালয় যে নিজেদের টিঁকিয়ে রাখতে পেরেছিল, তার সবটুকু কৃতিত্বই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের, তাঁর অদম্য উৎসাহ, কর্মনিষ্ঠা ও জেদের জন্যই তা সম্ভব হয়েছিল।

১৮৫৮ সালের ১লা এপ্রিল বিদ্যাসাগর মহাশয় হুগলী জেলার শিয়াখালা, মাহেশ ও বীরসিংহ এই তিনখানি গ্রামে একইদিনে তিনটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। শিয়াখালার নারায়ণপুর শ্মশানের বিপরীতে আমবাগান নামে একটা জায়গায় বিদ্যাসাগর মহাশয় 'শিয়াখালা মডেল গার্লস স্কুল' নামে বালিকা বিদ্যালয়টি স্থাপন করেছিলেন। শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মিত্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁর রচিত "হুগলী জেলার ইতিহাস' বইটিতে উল্লেখ করেছেন যে, স্থানীয় মানুষের মতে অর্থ মঞ্জুর হলেও বিদ্যাসাগর মহাশয় নাকি বিদ্যালয়টি শেষপর্যন্ত চালু করেননি। কিন্তু অপরপক্ষে 'শিয়াখালা উত্তর বাহিনী' পাঠাগারের (স্থাপিত ১৯১১) বর্তমান গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত গোবিন্দরক্ষিত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে লেখিকার এবিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে উনি জানান যে, শিয়াখালায় বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়টির অস্তিত্ব বর্তমানে লোপ পেলেও, ঐ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তা বিদ্যাসাগর মহাশয়ই প্রতিষ্ঠা করেন। কারণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতামহী ঐ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন যে, স্থানীয় মানুষের মনে বিদ্যালয়টির প্রভাব অবশ্যই ছিল, যে কারণে বিদ্যালযটি ৬০/৬৫ বছর পর্যন্ত (চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে) নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রশ্ন করে জানা গেল যে, বিদ্যালয়টিতে পঠন-পাঠন করতে সাধারণত মধ্যবিত্ত ঘর থেকেই মেয়েরা আসতো। বিদ্যালয়টি ছিল চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত। স্থানীয় জনসাধারণ ও ইউনিয়ন বোর্ড (যদিও ইউনিয়ন বোর্ডের অস্তিত্ব ঐ সময় না থাকারই কথা, তবুও যেহেতু প্রাচীন গ্রন্থাগারিক উল্লেখ করেছিলেন বলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, মনে হয় "লোকাল বোর্ড" হবে) আর্থিক সাহায্য দান করতেন। ঐ বালিকা বিদ্যালয়টি যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বর্তমানে সেখানে স্থানীয় ব্যবসায়ী সীতানাথ কুণ্ডু মহাশয়ের বসতবাটি নির্মিত হয়েছে বলে জানা গেল।

শিয়াখালা গ্রামের পাশেই ছিল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতুলালয়। সেজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় শিয়াখালায় প্রায়ই যেতেন। "শিয়াখালা বেনীমাধব উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়" নামে একানব্বই বছরের পুরনো বিদ্যালয়টির সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতি বিজড়িত আছে। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বিদ্যাসাগর যে মডেল স্কুলগুলি (আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয়) গড়ে তোলেন, শিয়াখালার বর্তমান বেণীমাধব উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়টিও' ছিল সেগুলির মধ্যে একটি। বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক মডেল স্কুলের শিলান্যাসের উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বর্তমান বিদ্যালয়টি। জগৎপুর নিবাসী জনৈক দুর্যোধন মণ্ডল বিদ্যালয়গৃহ

নির্মাণের জন্য নিষ্কর জমি দান করেন। কিন্তু ১৮৭২ সালে সরকারী সাহায্য বন্ধ হওয়ার সাময়িকভাবে বিদ্যালয়টির কাজকর্ম স্থগিত হয়ে যায়। কিন্তু অনতিকালের মধ্যেই স্বর্গীয় প্রকাশচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য শিক্ষানুরাগী গ্রামবাসীদের সাহায্যে স্কুলটি আবার চালু হয়ে যায়। তারপর প্রয়াত দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এবং চেষ্টায় বিদ্যালয়টি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আসে। শিয়াখালার পার্শ্ববর্তী গ্রাম ইলিপুরের কৃতী সন্তান শিক্ষাব্রতী, লেখক, সুপণ্ডিত বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্যালয়ের প্রথম সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তারপর থেকেই ক্রমশ উন্নতির পথ বেয়ে বিদ্যালয়টি প্রথমে ১৯৫৭ সালে একাদশ শ্রেণী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় রূপে, তারপর ১৯৭৭ সাল থেকে দশ+দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। ১৯৮৭ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি বিদ্যালয়টির একানব্বইতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই বিদ্যালয়টির ত্রিতলের অলিন্দটিতে 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি ফলক' উৎকীর্ণ করা হয়েছে—বিদ্যালয়ের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অমর স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য।

সেই সময়ের নারীমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান পুরোহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাবে যে শিয়াখালা গ্রাম প্রভাবিত হয়েছিল—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই সেজন্যই এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মনে মেয়েদের শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষ কোন জড়তা ছিল না বলে স্থানীয় মানুষের অভিমত। গ্রন্থাগারিক গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বিবৃতি অনুসারে জানা যায়, বর্তমানে এই গ্রামের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ ভাগের অধিক এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে শতকরা ত্রিশভাগের অধিক মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে। অনুন্নত শ্রেণীর ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মেয়েদের মধ্যেও আনুমানিক পনেরো-কুড়ি বছর হ'ল শিক্ষা চেতনা এসেছে। স্থানীয় অধিবাসী হাফিজুদ্দিন মহম্মদ সাহেবের কন্যা মুসলমান মেয়েদের মধ্যে প্রথম মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করেন। বর্তমানে শিয়াখালা গ্রামে সরলা বালিকা বিদ্যালয় নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় বেশ কিছুদিন হল স্থাপিত হয়েছে। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিষ্ঠিত শিয়াখালা মডেল গার্লস স্কুলটি' অবলুপ্ত হওয়ার পরে এবং বর্তমান সরলা বালিকা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে মধ্যের ত্রিশ চল্লিশ বছরের যে ব্যবধান —সেই সময়টা সম্পর্কে স্থানীয় মানুষজনকে জিজ্ঞাসা করেও বিশেষ কিছুই জানতে পারা যায়নি। সে সম্পর্কে কোন নথিপত্রও কিছু নেই বলে তাঁরা (স্থানীয় মানুষ) জানিয়েছেন। তবে নারী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তার যে একটা প্রভাব নিঃশব্দে কাজ করে গেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

উডের দলিলের সুপারিশ অনুযায়ী কাজ শুরু করার অব্যবহিত পরেই ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটাতে বিলেতের হতচকিত কর্তৃপক্ষ ভাবলেন হয়তো ভারতের শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপই বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। তাই ১৮৫৮ সালে লর্ড এলেমবরো উডের দলিল কার্যকর না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু

মহারাণীর ঘোষণার পরে ভারত সচিব লর্ড স্ট্যানলি ১৮৫৯ সালে নতুনভাবে নির্দেশ দিলেন প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া আর সব ক্ষেত্রে উডের দলিলের সুপারিশগুলি কার্যকর করা হবে। এই স্ট্যানলি ডেসপ্যাচের পরিপ্রেক্ষিতেই পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বালিকা বিদ্যালয় সংক্রান্ত অর্থ সাহায্যের আবেদনগুলি মঞ্জুর করা হয়েছিল।

১৮৫৮ সালের ২রা মার্চ উদয়রাজপুরে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বালিকা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তারজন্য তিনি সরকারের কাছে অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের সেই আবেদন সরকার সেই সময় মঞ্জুর করেননি। কিন্তু ১৮৬২ সালের ১৩ই জুন বিদ্যাসাগরের সেই আবেদন মঞ্জুর করে বিদ্যালয়টি সম্পর্কে বিদ্যালয় পরিদর্শক মন্তব্য করেন যে,

There is not similar school within six miles of Udayrajpur. I recommend the grant. I notice, however, that it is proposed to replace as subscription of rupees 24 by half that sum a subscription,and half as government aid.I belive that the death of Lady canning has had a disastrous effect on the subscription list, to which her ladyship was the chief contributor......

১৮৫৮ সালের ১লা এপ্রিল বীরসিংহ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত অনুরূপ একটি বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য বিদ্যাসাগর সরকারের কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদন করেন। ১৮৬২ সালের ১৩ই জুন সেই আবেদন সম্পর্কে পরিদর্শক মন্তব্য করেছেন :

The restdence of pundit Eshwar Chandra Sharma is at Beersingha, and I consequently recommend that aid may be given to this school.

১৮৫৮ সালের ২৬শে এপ্রিল রসুলপুরে প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়টির জন্য বিদ্যাসাগর সরকারের কাছে অনুরূপ আবেদন করেছিলেন। ১৮৬২ সালের ১৪ই জুন পরিদর্শক বিদ্যাসাগরের সেই আবেদন মঞ্জুর করার জন্য সুপারিশ করেন এবং আবেদন মঞ্জুর হয়।

ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি হয়েছে। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মানুষের মনে সচেতনতা এসেছে। তারা এবিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেও জেনেছেন সেকথা।

বিদ্যাসাগর মহাশয় মনে প্রাণে চেয়েছিলেন এদেশের মেয়েরা শিক্ষিতা হয়ে উঠুক। মন-প্রাণ দিযে চাওয়া শুধু নয়, তাঁর সেই চাওয়াকে বাস্তবে রূপ দিতে তাকে সফল করে তুলতে তিনি তাঁর আপ্রাণ চেষ্টার মধ্যে কোন ত্রুটি রাখেননি। যতগুলি বালিকা বিদ্যালয় তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—অর্থাভাবে সবকটিকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়তো তিনি পারেননি ; কিন্তু সেজন্যে তিনি 'ব্যর্থ' হয়েছিলেন, একথা আমরা বলতে পারি না। কারণ সবগুলি না হোক কয়েকটিকে যে অন্তত বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন—এটা তো তথ্যগত প্রামাণিক সত্য। আর এখানেই তাঁর সফল কৃতিত্ব। তীব্র দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে অমানুষিক পরিশ্রম, তীক্ষ্ণ মেধা ও অসাধারণ অধ্যাবসায়ের সাহায্যে নিজেকে সাধারণের থেকে অনেক উঁচুতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। অথচ সেই ছাত্র জীবন থেকেই যা কিছু উপার্জন করেছেন, সে জলপানির টাকাই হোক, কিংবা

পরবর্তী জীবনে স্বোপার্জিত অর্থই হোক, সবটুকুই আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে সকলকে দান করে দিয়েছেন—নিজের জন্য বিশেষ কিছুই রাখেননি। কারণ নিজের জন্য তো তিনি জন্মগ্রহণ করেননি, তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন পরের জন্য। কোথায় কোন্ দরিদ্র ছাত্র অর্থাভাবে পড়াশুনা চালাতে পারছে না, তার পড়ার খরচ চালাচ্ছেন। কোথায় কোন অনাথা বিধবা আত্মীয় পরিজনের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে—তার মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। নিজের কাছে না থাকায় অন্যের কাছে ধার করে বিদেশে ঋণগ্রস্ত মহাকবি মধুসূদনকে অর্থ সাহায্য পাঠিয়েছেন। নিজের খরচে অন্নসত্র খুলে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত মানুষের অন্নের সংস্থান করেছেন। এত দান ধ্যান ছাড়াও বিধবা বিবাহ কার্যকরী করার জন্য অকাতরে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। এরমধ্যে আবার স্বপ্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালগুলির শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন বাবদ সরকারী অর্থ সাহায্য না পাওয়াতে সে সব ব্যয়ও তাঁকেই বহন করতে হয়েছে। সুতরাং অতগুলি বালিকা বিদ্যালয়ের সবকটিকে নিজের তহবিল থেকে ব্যয় করে টিকিয়ে রাখা শুধু তাঁর পক্ষে কেন, কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। তবু তার মধ্যেই যে একাধিক বালিকা বিদ্যালয়কে তিনি বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন তা সম্ভব হয়েছিল শুধু তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, অদম্য উৎসাহ, দুর্দমনীয় জেদ আর নারী জাতির প্রতি অসীম মমত্ব বোধের জন্য—যা সাধারণের মধ্যে একান্তই বিরল। এই বিরল প্রতিভার মানুষটির ভিতরকার প্রবল প্রাণশক্তির প্রকাশ ঘটেছে তাঁর প্রতিটি সংস্কারমূলক কাজের মধ্যে। এই অপার প্রাণশক্তির জোরেই তিনি সবরকম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। নারী জাতিব প্রতি তাঁর হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধা-ভক্তি-মমতা ও ভালবাসা থেকেই যেন জন্ম নিয়েছিল সেই প্রবল প্রাণশক্তি, যার বলে বলীয়ান হয়ে তিনি অজেয় বীরের মর্যাদা আদায় করে নিতে পেরেছিলেন তাঁর সমকালীন সমাজের কাছ থেকেই শুধু নয়, তাঁর উত্তরকালের কাছ থেকেও। স্বদেশের অবহেলিত নারী জাতির প্রতি মমতা বোধ তাঁর এতই গভীর এবং নিখাদ ছিল যে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে থেকেও আপন রোগ যন্ত্রণা বিস্মৃত হয়ে অসহায়া স্ত্রী জাতির যন্ত্রণা মোচনের জন্য 'সহবাস সম্মতি' আইনের বিষয়ে সরকারের কাছে আপন মতামত সংবলিত পরামর্শমূলক এক সুদীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন।

" Though on these grounds I can not support the Bill as it is, I should like the measure to be so framed as to give something like an adequate protection to child wives, without in any way conflicting with any religious usage. I would propose that it should be an offence for a man to consummate marriage before his wife has had her first menses. As the majority of girls do not exhibit that symptom before they are thirteen, forteen or fifteen, the measure I suggest would give larger, more real and more extensive protection than the Bill. At the same time, such a measure could not be objected to on the ground of interfering with a religious observance. From every point of view, there fore the most resonable course

appears to me, to make a law declaring it penal for a man to have intercourse with his wife, before she has first menses.

Such a law would not only serve the interests of humanity by giving resonable protection to child wives, but would, so far from interfering with religious usage, enforce a rule laid down in the sastras. The punishments which the sastras prescribe for violation of the rule, is of a spiritual character and is liable to be disregarded. The religious prohibition would bemade more. effective, if it was embodied in a penal law. I may be permitted to press this consideration most earnestly on the attention of the Gov." নারী জাতির দুঃখ মোচনের চিন্তা তাঁর নিজের রোগযন্ত্রণাকে কিংবা মৃত্যু-চিন্তাকেও অতিক্রম করে গিয়েছিল।

১৯শ শতকে পাশ্চাত্য দেশে নারীর মর্যাদা কত উঁচুতে ছিল তা সে যুগের ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই জানতেন। কিন্তু তাই বলে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে পাশ্চাত্য আদর্শের অনুসরণে স্বদেশে নারীজাতির কল্যাণ সাধনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এ কথা ভাবলে ভুল করা হবে। একজন মানব মুখীন চেতনাসম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হিসেবেই তাঁর মনে হয়েছিল সমাজে স্ত্রী জাতির মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত জাতির কল্যাণ সম্ভব নয়। সেজন্যই একমাত্র পুত্র নারায়ণ চন্দ্রের বিধবা বিবাহের সিদ্ধান্তকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে শম্ভুচন্দ্রকে লিখেছিলেন, "বিধবা বিবাহ প্রর্বতন আমার জীবনের সর্ব প্রধান সৎকর্ম। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাম্মুখ নহি। ·· আমি দেশাচারের দাস নহি ; নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে তাহা করিব, লোকের বা কুটুমের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।" নারী জাতির উন্নতি বিধান করা ছিল বিদ্যাসাগরের জীবনের প্রধান ধ্যান, সমস্ত সামাজিক সংস্কার প্রয়াসের কেন্দ্রবিন্দু। ১৮৭২ সালে হঠাৎ স্বামীবিয়োগে বিপন্না মহিলাদের কল্যাণার্থে প্রতিষ্ঠা করলেন 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফান্ড।' বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবার সাধারণত একজন উপার্জনক্ষম পুরুষ নির্ভর। কোন কারণে তাঁর মৃত্যু হলে পরিবারের স্ত্রী-পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে অসহায় অনাথ হয়ে যেতে হয়। এই ধরনের পরিবারকে কিছুটা নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ফান্ড প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। যিনি মাসে মাসে ফান্ডে কিছু টাকা দেবেন, তাঁর মৃত্যুর পর স্ত্রী-পুত্র বা অন্য কোন আত্মীয় সেই টাকার দ্বিগুণের কিছু বেশি যাবজ্জীবন মাসিক সাহায্য পাবেন। এইভাবে অ্যানুয়িটি ফান্ডে মাসিক ৩০ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সংস্থানের বন্দোবস্ত করা হয়। এই ফান্ড প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭২ সালের ১৫ই জুন। ১৮৭২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে একটি সভা করে ফান্ড প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করা হয়। প্রথমে দশজন 'সাবসক্রাইবার' নিয়ে ৩২নং কলেজ স্ট্রিটে ফান্ডের কাজ আরম্ভ হয়। পাইকপাড়ার রাজারা একত্রে ২৫০০ টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। প্রথম দু'বছর ট্রাস্টি ছিলেন বিদ্যাসাগর ও জাস্টিস দ্বারকনাথ মিত্র। তৃতীয় বছরে দ্বারকানাথের

মৃত্যুর পর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রমেশচন্দ্র মিত্র ও বিদ্যাসাগর ট্রাস্টি হন। তবে ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত, মাত্র তিন বছর বিদ্যাসাগরের সঙ্গে অ্যানুয়িটি ফান্ডের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। ১৮৭৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর তিনি ডিরেক্টরদের কাছে একখানি পত্রে ফান্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৮৭৬ সালে ২রা জানুয়ারি হিন্দু স্কুলের একটি সভায় ডিরেক্টররা তাঁর সম্পর্ক ত্যাগের কারণ জানতে চান। ২১শে ফেব্রুয়ারি বিদ্যাসাগর একখানি সুদীর্ঘ পত্রে এই কারণ লিখে জানান। ফান্ডের হিসেব-নিকেশের ঠিক নেই, নিয়মকানুনেন বালাই নেই, সভার রির্পোট ঠিকমতো রাখা হয় না। ডিরেক্টররা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির কথা চিন্তা না করে কর্তৃত্ব ও দলাদলি নিয়েই মত্ত থাকেন—এই ধরনের বহু অভিযোগ করে পত্রের শেষে লেখেন—" এই ফান্ডের সংস্থাপন ও উন্নতি সম্পাদন বিষয় আমি যথাসাধ্য চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি। উত্তরকালে আপনাদের ফলভোগের প্রত্যাশা আছে : আমি সে প্রত্যাশা রাখি না। যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করে, সে দেশের হিতসাধনের সাধ্যনুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া, তাহার পরম ধর্ম ও তাহার জীবনের সর্ব প্রধান কর্ম ; কেবল এই বিবেচনায় আমি তাদৃশী চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি, এতদ্‌ভিন্ন ও বিষয়ে আমার আর কিছুমাত্র স্বার্থসম্বন্ধ ছিল না। বলিলে আপনারা বিশ্বাস করিবেন কিনা জানি না ; কিন্তু না বলিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না, এই ফান্ডের উপর, আপনাদিগের সকলকার অপেক্ষা আমার অধিক মায়া। আমায়, সেই মায়া কাটাইয়া, ফান্ডেব সংশ্রব ত্যাগ করিতে হইতেছে, সেইজন্য আমার অন্তঃকরণে কত কষ্ট হইতেছে, তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। যাঁহাদের হস্তে আপনারা কার্যভার অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সরল পথে চলেন না। এমনস্থলে, এ বিষয়ে লিপ্ত থাকিলে, উত্তরকালের কলঙ্কভোগী হইতে ও ধর্ম দ্বারে অপরাধী হইতে হইবে ;কেবল এই ভয়ে নিতান্ত নিরূপায় হইয়া, নিতান্ত দুঃখিত মনে, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক, আমায় এ সংশ্রব ত্যাগ করিতে হইতেছে। ··· বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আমি অতি সামান্য ব্যক্তি ; তথাপি আপনারা আমার উপর এতদূর বিশ্বাস করিয়া গুরুতর ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, এজন্য আপনাদের নিকট অপকট হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ঐ গুরুতর ভার বহন করিয়া যতদিন এই ফান্ডে সংশ্রবে ছিলাম, সেই সময় মধ্যে অবশ্যই আমি অনেক দোষে দোষী হইয়াছি, দয়া করিয়া, আপনারা আমার সকল দোষের মার্জনা করিবেন। যতদিন আপনাদের ট্রাস্টি ছিলাম, সাধ্যনুসারে ফান্ডের হিত চেষ্টা করিয়াছি, জ্ঞানপূর্বক বা ইচ্ছাপূর্বক কখনও কখনও সে বিষয়ে অযত্ন, উপেক্ষা বা অমনোযোগ করি নাই। এক্ষণে আপনারা প্রসন্ন হইয়া বিদায় দেন, প্রস্থান করি।

কলিকাতা, ১০ ফাল্গুন, ১২৮২ সাল,

ভবদীয়স্য, শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ডিরেক্টরদের অনেক অনুরোধ-উপরোধেও বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর সিদ্ধান্ত পালটাননি। অত্যন্ত স্বাধীনচেতা-নিষ্ঠাবান কর্মী বিদ্যাসাগরের পক্ষে অন্যায়ের সঙ্গে আপস করে চলা সম্ভব হয়নি জীবনের কোন ক্ষেত্রেই। চাকরি জীবনের প্রথমে সংস্কৃত কলেজের

সম্পাদক রসময় দত্তের সঙ্গে নীতিগত বিরোধের ফলে ১৫ মাসের মধ্যে পদত্যাগ করেছিলেন, অন্যায়ের সঙ্গে আপস করতে পারেননি বলে, স্ত্রী শিক্ষা প্রসার এবং সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যক্রম প্রশাসন ইত্যাদি ব্যাপারে সরকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদও ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, এক্ষেত্রেও কারণ ছিল সরকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে অন্যায়ের সঙ্গে আপস করতে না পারা। অ্যানুয়িটি ফান্ডের ক্ষেত্রেও সেই একই ঘটনা ঘটেছিল, যদিও হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফান্ডের পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠা তাঁর জন্যই সম্ভব হয়েছিল, এবং এই ফান্ড তাঁর জীবনের একটা মস্তবড় কীর্তি। কিছু দিন পরে রমেশচন্দ্র মিত্রও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ফান্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফান্ডের পক্ষে এই আঘাত কাটিয়ে ওঠা কঠিন হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত ফান্ডের ডিরেক্টরগণ সরকারের কাছে এ ব্যাপারে সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন "বিধাতার কৃপায় ক্রমে ক্রমে সকল আশঙ্কা তিরোহিত হইল এবং সেই 'বৃত্তিভাণ্ডার' অদ্যাপি জীবিত থাকিয়া অসংখ্য দুঃস্থ ও বিপন্ন লোকের অভাব মোচন করিতেছে।" (বিদ্যাসাগর-চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যয় পৃঃ ৪৩৪)। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের লোক হিতকর উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করে ও বহু মধ্যবিত্ত লোকের স্বার্থ এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত রয়েছে দেখে শেষ পর্যন্ত সরকার এর পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন।

(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-বিনয় ঘোষ পৃঃ ১৩০)

ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা ঋণগ্রস্ত বিপন্ন বিদ্যাসাগরের চিঠি :

"... আমি ক্রমাগত কয়েকদিনই চেষ্টা দেখিলাম, কিন্তু তোমার কাগজ খোলসা করিয়া দিবার উপায় করিতে পারিলাম না। সুতরাং সত্বর তোমার কাগজ তোমাকে দিতে পারি এমন পথ দেখিতেছি না। তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ আমি নিজ প্রয়োজনের নিমিত্ত তোমার কাগজ লই নাই। বিধবা বিবাহের ব্যয় নির্বাহার্থে লইয়াছিলাম, কেবল তোমার নিকট নহে, অন্যান্য লোকের নিকট হইতেও লইয়াছি। এ সকল কাগজ এই ভরসায় লইয়াছিলাম যে, বিধবা বিবাহ পক্ষীয় ব্যক্তিরা যে সাহায্য দান অঙ্গীকার করিয়াছেন, তদ্বারা অনায়াসে পরিশোধ করিতে পারিব। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই অঙ্গীকৃত সাহায্য দানে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। উত্তরোত্তর এ বিষয়ের ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু আয় ক্রমে খর্ব হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং আমি বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। সেই সকল ব্যক্তি অঙ্গীকার প্রতিপালন করিলে, আমাকে এরূপ সঙ্কটে পড়িতে হইত না। কেহ মাসিক, কেহ এককালীন, কেহ বা উভয় এইরূপ নিয়মে অনেক অনেকে দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেহ কোন হেতু দেখাইয়া, কেহবা তাহা না করিয়াও, দিতেছেন না। অন্যান্য ব্যক্তিদের ন্যায় তুমিও মাসিক ও এককালীন সাহায্যদান স্বাক্ষর কর। এককালীনের অর্ধমাত্র দিয়াছ, অবশিষ্টার্থ এ পর্যন্ত দাও নাই, এবং কিছুদিন হইল মাসিক দান রহিত করিয়াছ। এইরূপে আয়ের অনেক খর্বতা হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু ব্যয় পূর্বাপেক্ষা অধিক হইয়া

উঠিয়াছে। সুতরাং এই বিষয় উপলক্ষে যে ঋণ হইয়াছে, তাহার সহসা পরিশোধ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, আমি ঋণ পবিশোধের সম্পূর্ণ চেষ্টা দেখিতেছি। অন্য উপায়ে তাহা না করিতে পারি, অবশেষে আপন সর্বস্ব বিক্রয় করিয়াও পরিশোধ করিব, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে তোমার প্রয়োজনের সময়ে তোমাকে তোমার কাগজ দিতে পারিলাম না, এজন্য অতিশয় দুঃখিত হইতেছি। ··· দেশহিতৈষী, সৎকর্ম্মোৎসাহী মহাশয় দিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ধনে প্রাণে মারা পড়িলাম। অর্থ দিয়া সাহায্য করা দূরে থাকুক, কেহ ভুলিয়াও এ'বিষয়ে সংবাদ লয়েন না। ···"

বীরসিংহ গ্রামের অন্যতম প্রধান অধিবাসী গদাধর পালকে লেখা চিঠি :

"·····নানা কারণবশতঃ স্থির করিয়াছি আমি আর বীরসিংহায় যাইব না। তুমি গ্রামের প্রধান, এজন্য তোমা দ্বারা গ্রামস্থ সর্বসাধারণ লোকের নিকট হইতে এ জন্মের মতো বিদায় লইতেছি, এবং সকলকে যথাযোগ্য প্রমাণ, নমস্কার ও আর্শীবাদ জানাইয়া বিনয়বাক্যে এই প্রার্থণা কবিতেছি, যদি কখনও কোন দোষ করিয়া থাকি, সকলে দয়া করিয়া আমায় ক্ষমা করিবে। সাধারণের হিতার্থে গ্রামে যে বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপিত আছে এবং গ্রামস্থ নিরুপায় লোকদিগের মাস মাস যে কিছু কিছু আনুকূল্য করিয়া থাকি, আমার শক্তি থাকিলে ঐ সকল বিষয় রহিত হইবে না। কিছুকাল হইল আমার মনের ও শরীরের অবস্থা অতি মন্দ হইয়াছে। সুতরাং অধিকদিন বাঁচিব, এরূপ বোধ হয না যদি শুনিতে পাই তোমবা সকলে স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছ, তাহা হইলে যারপরনাই সুখী হইব।

ইতি ১২ অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল। শুভাকাঙ্ক্ষীণ। শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ"।

হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদককে লেখা চিঠি :

" ··· অনেকদিন অনুপস্থিতির পর বাড়ি থেকে কলকাতায ফিবে এসে আমি জানতে পেরে বিস্মিত হয়েছি যে, বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য আমাকে নাকি গুরুভার ঋণ স্বীকার করতে হয়েছে ও তা' শোধ দেবার জন্য কিছু টাকা তোলার ব্যবস্থা হচ্ছে। ইংরাজী ও বাংলা ভাষার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ বিষয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, এবং এখন এটা প্রায় সবারই মুখের কথা হযে উঠেছে। এই প্রস্তাবের মুখবন্ধে নাকি আমার অনুমিত ঋণের পরিমাণও দেওয়া হয়েছে। পরিষ্কারভাবে জোরের সঙ্গে ঘোষণা করতে পারার এই প্রথম সুযোগেই আমি জানাতে চাই যে আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে এ প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে এবং অনির্ভর যোগ্য খরচের ভিত্তিতে আমার ঋণের পরিমাণ ৪৫,০০০ টাকা বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। প্রকৃত দায় ঐ অঙ্কের অর্ধেকেরও কম এবং এই ঋণ পবিশোধের জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন করার কোন অভিপ্রায় কোন সময় আমার ছিল না। আন্দোলনের সমর্থকদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান, সে যতো কমই হোক, আমি কোন সময়ই প্রত্যাখ্যান করিনি, কিন্তু সমর্থনের জন্য কোন ব্যক্তির ওপর চাপ দেওয়া চিরকালই আমার নীতি বিরুদ্ধ···শুধুমাত্র আন্দোলনের স্বার্থেই এই বিবৃতি প্রচার আমি প্রয়োজনীয় বোধ করেছি। ব্যক্তিগতভাবে আমাকে লোক কী ভাবল বা বললো, তার কোন পরোয়া

আমি করি না। কিন্তু সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত কোনো প্রয়াসও আমার আন্দোলনের ক্ষতি করছে এটা দেখে সত্যি আমার দুঃখ হয়। যাঁরা চাঁদা তুলেছেন, তাঁরা যদি বিধবা বিবাহ তহবিল তোলাতেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতেন ও আমার যে ঋণের জন্য আমি কখনোই জনসাধারণের কাছে প্রার্থী হওয়ার কথা ভাবিনি, সেই ঋণের প্রসঙ্গ উল্লেখ না করতেন, তাহলে আমি এ প্রচেষ্টার বিরোধিতার কোন প্রয়োজন বোধ করতাম না। কিন্তু যে জাতীয় স্বার্থে আমি খেটে চলেছি তার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রসঙ্গ, এমন জড়িয়ে গেছে যে, এই ধরনের চেষ্টা যাঁরা করছেন তাঁদের প্রতিবাদ আমার করতেই হচ্ছে, এবং আমি অনুরোধ করছি তাঁরা যেন এ থেকে বিরত হ'ন।

২৬শে জুন, ১৮৬৭ —ঈশ্বরচন্দ্র শৰ্ম্মা

নির্দেশিকা

১। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ—বিনয় ঘোষ পৃঃ ২১০

২। Report of pundit Iswar Chandra Sharma, special inspector of school, south Bengal for 1857-58 (Report on public instruction in Bengal 1857-1858, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাঠাগারের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৩। বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়— পৃঃ ৬৮-৬৯

৪। Report on the Director of public Instruction of Female Education (page-89-90)

৫। -DO- (page-90-91)

৬। Principal education discussions during 1857-1858 (continued no.15, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাঠাগারের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

৭। দ্রষ্টব্য : 'Unpublished letters of Vidyasgar' –Edited by Arabinda Guha পৃঃ ৩৪ হ'তে উদ্ধৃত।

৮। আধুনিক ভারতে শিক্ষা বিবর্তন — অধ্যাপক জ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃঃ ৭৮।

৯। General report on Public Instruction in the Lower provineces of the Bengal presidency for 1857-1858 Appendix A, PP, 179-180 (উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাঠাগারের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

১০। Edn Dept, Consultantion 1859, Ednl. Proceedings of the Lt. Govt. of Bengal-1862- (National Archive)

১১। লেখিকার শিয়াখালা—নিবাধুই দত্তপুকুর প্রভৃতি অঞ্চল সমূহ পরিদর্শন ও অনুসন্ধান লব্ধ বিবরণ।

১২। লেখিকার শিয়াখালা বেণীমাধব উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি পরিদর্শন লব্ধ সংগৃহীত বিবরণ।

১৩। আধুনিক ভারতে শিক্ষা বিবর্তন-অধ্যাপক জ্যোতি প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়-পৃঃ৮০

১৪। Proceedings of the Liutenant Governor of Bengal Edn. Dept.June 1862 no 141-142

১৫।-Do- July 1862,Nos.৫ & ৬

১৬। -Do- July 1862, Nos. ৩ & ৪

১৭। বিদ্যাসাগর-চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ২৯৫-২৯৬।

১৮। শম্ভুচন্দ্রকে লেখা বিদ্যাসাগরে চিঠি দ্রষ্টব্য-বিদ্যাসাগর-চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ২৫৩-২৫৪।

১৯। দ্রষ্টব্য : বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ—বিনয় ঘোষ, পৃঃ ৩৪৮-৩৪৯।

বিদ্যাসাগরের কীর্তির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে :

বাংলাদেশে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সার্থকতা লাভের মানদণ্ড হিসেবে আমরা বেছে নিতে পারি নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে :

(ক) শিক্ষা প্রসারের ফলে বঙ্গ-মহিলাদের মধ্যে কুসংস্কার বর্জনের চেতনার উন্মেষ হয়েছে কিনা।

(খ) তাদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা বোধ জেগেছে কিনা।

(গ) গার্হস্থ্য জীবনে নারীর ভূমিকা শুধু 'ভার্য্যা' কিংবা 'পুত্রোৎপাদনের যন্ত্র' -- এই মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা।

(ঘ) শিক্ষার সাহায্যে নিজের সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রত্যয়বোধের উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে নারী সংগ্রামমুখী হয়ে উঠেছে কিনা।

পরিবেশ, পরিকল্পনা ও প্রয়োগগত কোন ত্রুটির ফলে উপরোক্ত বিষয়গুলিতে যদি কোন অসম্পূর্ণতা থাকে, তাহলে সেগুলোও আমাদের খুঁটিয়ে দেখতে হবে। এছাড়া আমাদের জানতে হবে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সফলতাটুকু লাভ করেছিলেন, সেই সফলতা লাভের পিছনে কোন্ কোন্ উপাদান কাজ করেছে।

সমগ্র ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে আজ পর্যন্ত শিক্ষার প্রসার যা হয়েছে, তা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। ১৯শ শতকের প্রথমভাগে রেভাঃ উইলিয়াম অ্যাডামের সমীক্ষা এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের সমীক্ষার ফলে জানা যায় যে, সেইসময় ভারতে সাক্ষরতার হার ছিল শতকরা ছয়ভাগ মাত্র। ১৯৫১ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, সেই হার মাত্র এগারোভাগ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে শতকরা সতেরোভাগ। ১৯৮৭ সালে যে হিসাব নেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা উনিশভাগ মাত্র। অর্থাৎ ১৯৮৭ সালে সমগ্র ভারতে সাক্ষরতার হার ছিল শতকরা ছত্রিশভাগ মাত্র। তার মানে হ'ল এখনও ভারতের জনসংখ্যার শতকরা চৌষট্টিভাগ (৪৫কোটি মানুষ) নিরক্ষর। বর্তমানে সমগ্র ভারতে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তুলনায় যেরকম কম হারে সাক্ষরতা বাড়ছে, তাতে আগামী ২০০১ সালে ভারতে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা হবে পঞ্চাশ কোটি অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের নিরক্ষর মানুষের অর্ধেক। এই হিসাব ভারতের পুরুষ ও নারী উভয়শ্রেণীর নিরক্ষর মানুষের সম্মিলিত সংখ্যার হিসাব। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে সাক্ষরতা কিংবা নিরক্ষরতার হিসাব যদি নেওয়া হয়, তাহলে সে সংখ্যা আরও ভয়াবহ। বাস্তবিক সাক্ষরতার ক্ষেত্রে ভারতীয় মহিলাদের অবস্থান যে কত শোচনীয় তার একটু হিসাব নিলেই বাস্তব অবস্থা কি তা জানা যাবে।

ভারতের মহিলাদের মধ্যে সাক্ষর মাত্র পঁচিশ শতাংশ, অর্থাৎ পঁচাত্তর ভাগই নিরক্ষর।

পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে সাক্ষরতার প্রসার সর্ব সাকুল্যে ২৫শতাংশ মাত্র। ১৯৮৫ সালেও দেখা গেছে কোথাও কোথাও নারীশিক্ষার হার ছিল মাত্র ১৫ শতাংশ এবং গ্রামাঞ্চলে কোথাও কোথাও ৫শতাংশ মাত্র।

বাংলাদেশে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন শুরু হয়েছে সেই ১৭৬০ সালে 'হেজ'-এর বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের মধ্যে দিয়ে। অথচ আজ প্রায় দুশো আঠাশ বছর পরেও বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষার এই হার রীতিমত নৈরাশ্যজনক। অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ বহন করে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের নারী সমাজের যে বৃহত্তর অংশ, সামাজিক কুসংস্কারের বন্ধন মুক্তি যে তাদের ঘটেনি সে কথা বলাইবাহুল্য। কিন্তু যাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে সেইসব ভাগ্যবতী আলোক প্রাপ্তাদের মধ্যে কুসংস্কাব বর্জনের চেতনা কতখানি এসেছে তার পরিমাপ যদি আমরা কবি, তাহলে সেদিকে পাল্লাভারী বলে আত্মশ্লাঘা করার বিশেষ কোন প্রমাণই আমাদেব পুঁজিতে নেই। মধ্যযুগীয় অন্ধ-কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ১৯শ শতকের নাবী সমাজের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে যুগন্ধর মহামানব, একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশের জন্য প্রতীক্ষারত স্বদেশেব ভূমিতে আবার যদি তাঁর আবির্ভাব ঘটতো, তাহলে বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি দেখতেন তাঁর প্রজ্জ্বলিত শিক্ষার আলোক রশ্মি স্বদেশের নারী সমাজকে সর্বত্র আলোকিত কবতে পারেনি শুধু নয়, যেটুকু অংশ আলোকিত হয়েছে সেই অংশের ওপরটুকুই শুধু আলোকিত হয়েছে, — শিক্ষা হয়েছে যেন একটা খোলসমাত্র। শিক্ষার লক্ষ্য যে মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন এবং নারীর সেই সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানেব জন্যই যে তিনি নারীশিক্ষা প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সে প্রচেষ্টা তাঁর পুরোপুরি সফল হয়নি। আজও শহর কলকাতার ধনী-দরিদ্র-শিক্ষিতা-অশিক্ষিতা নির্বিশেষে মহিলারা 'জাগ্রতা দেবী' মহিমার 'প্রসাদ' লাভের আশায় 'হত্যা' দিয়ে পড়ে থাকেন, কিংবা ঘন্টার পর ঘন্টা দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকেন শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীনভাবে। ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত স্বামীর জন্য আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে কোন তথাকথিত প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত সন্ন্যাসী দত্ত কম্বলের শয্যায় শুইয়ে রাখেন। গণৎকার বা জ্যোতিষীর নির্দেশে গার্হস্থ্যজীবন পরিচালনা কবেন।

স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুযায়ী মানুষ চিরকাল নিজের নিরাপত্তার কথাই ভেবে এসেছে। নিজেকে টিকিযে রাখার সমস্যাটাই তার কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা, এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করতে সে দ্বিধা করে না। বংশ রক্ষার তাগিদও তার মধ্যে একটি শুধু নয়, অন্যতম একটি। এই বংশ রক্ষার তাগিদেই একদিন "পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্য্যা"র রীতি সংসারে চলিত ছিল। আজও নারী সম্বন্ধে এই চিন্তার বিশেষ হের ফের হয়েছে বলে মনে হয়না (যদিও বড়াই করে সোচ্চারে বলা হয়না)। আসন্ন একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েও আজ শহর-গ্রাম নির্বিশেষে শিক্ষিতা-অশিক্ষিতা সবশ্রেণীর মহিলাদেরই বৃহৎ এক অংশ সন্তানলাভের আশায় বিভিন্ন 'দেবস্থানে' রঙিন কাপড়ের 'ডোরী' বেঁধে মানত করছেন, হাতে-গলায়-কোমরে মাদুলী-তাবিজ বেঁধে চলেছেন। শিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে অনেকেই কন্যাসন্তান অপেক্ষা পুত্র

সন্তান লাভই অধিকতর কাম্য বলে মনে করে থাকেন। আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিতা হয়ে এবং সূর্যগ্রহণ-চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জেনেও "গ্রহণী" হওয়ার আশঙ্কায় শুধু মহিলারাই রান্নাঘর বন্ধ করে গ্রহণ মুক্তির অপেক্ষায় বসে থাকেন না, অনেক বালিকা বিদ্যালযে ছুটিও দিয়ে দেওয়া হয় গ্রহণ উপলক্ষে। গ্রামাঞ্চলে তো বটেই, শহরের অভিজাত পল্লীর দুর্গোৎসব মণ্ডপেও বিজয়া-দশমীর দিন 'বৈধব্য দশাপ্রাপ্ত' হওয়ার আশঙ্কা দূর করতে দলে দলে শিক্ষিতা সধবা মহিলাদের সিঁদুর খেলতে দেখা যায় প্রতিবছর। দেওরালার তথাকথিত 'সতীস্থানে — সতী মন্দিরে, শহর ও গ্রামের বিভিন্ন স্থানের সতী মেলা' নামে কথিত অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন, পুজো উপচার নিয়ে ভিড় করছেন যেসব মহিলারা তাঁদের মধ্যে শিক্ষার 'আলোক প্রাপ্তার' সংখ্যাও যে অল্প নয় তা বলাইবাহুল্য। যে সঙ্কীর্ণ মানসিকতা নিয়ে একসময় নিরক্ষর অশিক্ষিতা শাশুড়ি ঠাকুরণেরা অসহায়া পুত্র বধূদের পীড়ন করেছেন, — সেই একই মানসিকতা আজকের যুগের শিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যেও দেখা যায়। আজ বধূ নির্যাতনের অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় নির্যাতনকারিণীরা নিজেরাই ছিলেন একসময় নির্যাতিতা, অর্থাৎ কালটাই শুধু বদলেছে — মনটা নয়।

অবশ্য কুসংস্কারকে পুরোপুরি বর্জন করতে না পারলেও কুসংস্কার সম্বন্ধে চেতনা যে জেগেছে তা হয়ত বলা যায়। এমন অনেক কিছু আচার-আচরণ শিক্ষিতা মহিলারা অনুসরণ করে থাকেন যেগুলির অসারতা সম্পর্কে তাঁরা নিজেরা যথেষ্ট পরিমাণেই ওয়াকিবহাল। অথচ সেইসব আচার-আচরণ তাঁরা পালন করে চলেছেন নিছক পারিবারিক ঐতিহ্যকে অনুসরণ করতে কিংবা কোন 'প্রাপ্তি'র প্রত্যাশায়। একটা ভয়মিশ্রিত মনোভাবই এইসব কুসংস্কার মেনে চলার পিছনে কাজ করে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল-শিক্ষার সাহায্যে সার্বিকভাবে সেই ভয় ও দুর্বলতাকে অতিক্রম করার মতো মানসিক বলিষ্ঠতা এখনও অর্জন করতে পারেনি বাঙালী নারী।

বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ হয়ে গেছে শতাধিক বছর আগে, তবু সমাজে এখনও তা সচলতা লাভ করেনি। সামাজিক রীতি অনুসরণ করে, সম্বন্ধ করে বিধবা কন্যার সঙ্গে কোন অবিবাহিত পুরুষের বিবাহ হয়েছে বলে শোনা যায় না। বিধবা কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদকারিণী পাত্রীর পাণি প্রার্থনা করে কখনো হয়ত সংবাদপত্রের 'পাত্র-পাত্রী' কলমে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও বিজ্ঞাপন দাতা কোন উদার হৃদয় পুরুষই, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোন শিক্ষিতা মা-বোন সে বিজ্ঞাপন বহুক্ষেত্রেই দেননি। যদিও এখন আর বিধবার পুনর্বিবাহ ব্যাপারটি কোন সমস্যাই নয়, তবুও একথা মানতেই হবে যে প্রেমঘটিত বিবাহের ক্ষেত্রেই এটা সহজ হয়েছে, আত্মীয় পরিজনের দ্বারা সম্বন্ধ করা বিবাহের ক্ষেত্রে নয়। সেইজন্যই বিধবাবিবাহেচ্ছু বিজ্ঞাপন দাতাকে 'উদার হৃদয়' বলা হয়েছে — সমাজ মানসিকতাই এই 'উদার' শব্দটি ব্যবহার করতে বাধ্য করেছে এবং বিশেষভাবে উল্লেখিত 'উদার' শব্দটাই আজও সমাজে নারীর স্থান কোথায় তা নির্দেশ করছে।

আমাদের এই পুরুষ প্রধান সমাজে নারী-ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা পুরুষের স্বীকৃতির উপরই

প্রধানত নির্ভর করে। পুরুষ প্রগতিশীল হলেই সে নারীর ব্যক্তিত্বকে মূল্য দেবে। কিন্তু সাধারণ মধ্য ও উচ্চবিত্ত সমাজে পুরুষের এই প্রগতিশীলতা অনেকাংশেই তার একটা বহিরাবরণ মাত্র। শিক্ষা-আধুনিকতা আর অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের চাপে পড়ে কতকটা বাধ্য হয়েই যেন প্রগতিশীলতার একটা আবরণে সে নিজেকে আড়াল করতে চায়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল পুরুষের এই প্রতিকূলতাকে পিছন থেকে উৎসাহ দেয় নারীই। এখনও বহু সংসারে আত্মীয়দের হাত ধরে মেয়েরা পণ্যদ্রব্যের মতো পাত্র পক্ষের সামনে এসে দাঁড়ায় নিজেদের যাচাই করানোর জন্য। আর এক্ষেত্রে পাত্রীরা নিজেরাও বিশেষ আপত্তি জানায় না। ১৮-১৯শ শতকীয় কৌলীন্য প্রথার অভিশাপ থেকে আজও সমাজ মুক্ত হয়নি বলেই মনে হয়। সেই কৌলীন্য প্রথার বাইরের রূপটাই বদলেছে শুধু। বংশজ কৌলীন্য প্রথার স্থান আজ অধিকার করেছে অর্থজ কৌলীন্য প্রথা। বিজ্ঞানের অকৃপণদানে নানা ধরনের আকর্ষণীয় বিলাস সামগ্রীতে বিশ্বের বাজার আজ ছাপিয়ে উঠেছে। জীবনযাত্রাকে বিলাস বহুল করে তোলার জন্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য এক অসম প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে মানুষ। প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আরও অর্থের, এবং সেই 'আরও' অর্থের যোগান দিতে, সংসারকে 'আরও' বেশি স্বচ্ছলতা দিতে আজ পুরুষের সঙ্গে নারীও নেমে পড়েছে অর্থোপার্জনের পথে। বাংলাদেশের চরম অবহেলিত নারী সমাজকে সর্ব কলুষ থেকে মুক্ত করতে — নারী ব্যক্তিত্বের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে একদা বিদ্যাসাগর মহাশয় স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ও বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বহুবিবাহ নিবারণ করার জন্যও রীতিমত আন্দোলন করেছিলেন। বাংলাদেশের কৌলীন্য প্রথার কুফল সম্বন্ধে দেশবাসীকে অবহিত করার প্রয়াস করেছিলেন। সেদিনের বিদেশী সরকার বহুবিবাহ বিরোধী আইন প্রণয়নে অসম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনোত্তরকালে 'হিন্দু কোডবিল' পাসের ফলে হিন্দু পুরুষের একাধিক বিবাহ করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। বিদ্যাসাগরের সাধনার সিদ্ধি লাভ ঘটে তাঁর মরণোত্তরকালে। রাষ্ট্রীয় আইন নারীকে ফিরিয়ে দিল তার হৃত ব্যক্তিত্ব। কিন্তু আজকের আধুনিক সমাজে নারী তার ব্যক্তিত্বকে সর্বত্র ধরে রাখতে পারছে না। আধুনিক সমাজের অর্থজ কৌলীন্য প্রথার যূপকাষ্ঠে নারী তার মূল্যবোধকে বলি দিচ্ছে কোন কোন ক্ষেত্রে। কখনো সে সামাজিক প্রতিষ্ঠা হারাবার ভয়ে অর্থকুলীন স্বামীর বহু নারীগামিতাকে মেনে নিয়ে সেই স্বামীর সহবাসেই অপমানিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে, কখনো বা নারী নিজেই অর্থজ কৌলীন্য মদে মত্ত পুরুষের পায়ে নিজের নারীত্ব তথা ব্যক্তিত্বকে নিঃশর্ত নিবেদনে দ্বিধাহীন চিত্ত। সুতরাং শিক্ষার প্রসার ঘটলেও সমাজের কোন কোন অংশে যে নারীর সার্বিক ব্যক্তিত্ববোধ বা ব্যক্তি চেতনার বিকাশ এখনও অসম্পূর্ণ রয়েছে তা বোধ হয় বলা যায়।

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখা থেকে জানা যায় যে, তাঁর কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়ে যাঁরা বিধবা বিবাহের জন্য অর্থও নিয়েছে, আবার লুকিয়ে একাধিক বিবাহও করেছে, এই প্রবঞ্চনা বন্ধ করার জন্য শেষপর্যন্ত বিদ্যাসাগর পাত্রকে দিয়ে একটি অঙ্গীকার পত্র লিখিয়ে সই করিয়ে নিতেন। এই অঙ্গীকার পত্র ছিল এইরকম:— "বিধবা

বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত ও আইনসঙ্গত কর্ম জানিয়া আমি স্বেচ্ছাপূর্বক শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে তোমার পাণিগ্রহণ করিলাম, অদ্যাবধি আমরা পরস্পর দাম্পত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলাম।.... প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি প্রকৃতরূপে পতিধর্ম পালন করিব, অর্থাৎ তোমায় যাবজ্জীবন সাধ্যানুসারে সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাখিব। তোমার প্রতি কখনও অযত্ন ও অনাদর করিব না, আর ইহাও অঙ্গীকার করিতেছি, তোমার জীবদ্দশায় আমি আর বিবাহ করিব না।......তোমার জীবদ্দশায় যদি ভার্য্যান্তর পরিগ্রহ করি, তাহলে তোমাকে আমি বেদনিক স্বরূপ এক সহস্র টাকা দিব। আর যদি আমি পুনরায় বিবাহ করাতে তুমি অসন্তুষ্ট বা অন্যবিধ অন্যায় আচরণ দর্শনে বিরক্ত হইয়া আমার সহবাসে থাকিতে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে তুমি স্থানান্তরে থাকিতে পারিবে। তোমার গ্রাসাচ্ছাদনাদি ব্যয় নির্বাহ নিমিত্ত আমি তোমাকে মাসিক নিয়মে প্রতিমাসের আরম্ভে ১০টাকা করিয়া দিব।....আমি অবর্তমানে তুমি ও তোমার পুত্র কন্যারা প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে আমার পৈতৃক ও স্বার্জিত যাবতীয় বিষয়ের উত্তবাধিকারী হইবে, তাহাতে কেহ প্রতিবন্ধক হইতে পাবিবে না। আর যদি তোমাকে বা তোমার পুত্র কন্যাদিগকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে বিনিযোগ পত্রাদির দ্বারাই আমার বিষয়ের অন্য কোন ব্যবস্থা করি, তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর হইবেক। এতদর্থে স্বেচ্ছাপূর্বক, সুস্থ শরীরে ও স্বচ্ছন্দ মনে এই একবাব পত্র লিখিয়া দিলাম।" একটাকার স্ট্যাম্প কাগজে এই চুক্তিপত্র লিখে চারজন সম্ভ্রান্ত লোকের স্বাক্ষর থাকতো। এই চুক্তি পত্রে (বিদ্যাসাগর রচিত) বিবাহ বিচ্ছেদের পরোক্ষ স্বীকৃতিও আছে। 'ইয়ং বেঙ্গল' প্রস্তাবিত 'ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন' এবং ১৮৭২ সালের '৩' আইনের (সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট) সঙ্গে এই অঙ্গীকার পত্রের মূলগত সাদৃশ্য যথেষ্ট ছিল। মৃত্যুশয্যায় শুযেও তিনি শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ নবীন নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করেছিলেন '৩' আইন সংশোধন কবে ব্রাহ্ম বিবাহের সঙ্গে হিন্দু বিবাহের ও দাম্পত্য বন্ধনকে দৃঢ় করার জন্য এবং বহু বিবাহের বদলে এক বিবাহকে হিন্দু সমাজে প্রর্বতন করার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যেতে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের নৈতিক কর্তব্যবোধ ও সামাজিক দায়িত্ববোধ এদেশের মানুষের মনে না জাগলে কেবল আইনের জোবে যে বিধবা বিবাহ সার্থক হবে না, তা বুঝেই তিনি তাঁর আদর্শের তরুণ উত্তবাধিকারীদের অনুরোধ করেছিলেন এই কর্তব্য সম্পাদনের জন্য অবিরাম সংগ্রাম চালিযে যাওযার।

নারী ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আজকের সমাজের আধুনিক মনোভাবাপন্ন উচ্চশিক্ষিতা ও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিতা কিছু মহিলা তাঁদের নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করে বলেন — "শোষিত-দরিদ্র পরিবারের এবং সমাজের উপর তলার মেয়েরাও নানাভাবে সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে গণ্য হচ্ছেন। ... মেয়েদের আর্থিক স্বয়ম্ভরতা যে তাদের সম্পূর্ণতা, স্বাধীনতার অঙ্গ সেটা স্বীকৃত নয়। সমাজে তার পদমর্যাদা পুরুষের মা, স্ত্রী অথবা মেয়ে হিসাবেই চিহ্নিত।"

সামাজিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক স্তরে নারী সমাজের আরও অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে।....সর্বাগ্রে দরকার চিন্তার স্বাধীনতা। কারণ স্বাধীন চেতনার সুপ্তবীজ যেমন মননেই থাকে, অন্যকে পরাধীন করে রাখা বা পরাধীন দেখতে চাওয়ার

পিছনে যে প্রবৃত্তি কাজ করে, তারও জন্ম মানুষের মনেই। সেইজন্য ব্যাপক অর্থে ও চেহারায় নারী-স্বাধীনতা দেখতে চাইলে পুরুষেরও একধরনের মানসিক মুক্তি খুব প্রয়োজন। যে মুক্তি পুরুষকে এই বোধ দেবে যে, নারীর সঙ্গে বহু যুগ ধরে নানান অন্যায় হয়ে এসেছে, এখন তার শুদ্ধি প্রয়োজন। তবে নারী সঠিকভাবে স্বাধীনতা লাভ করবে।"···· 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের সময়থেকেই সবকিছুর প্রাচীর ভেঙে সাধারণ মেয়েরা প্রথম পথে নামে। শিক্ষার প্রসার হয়, বিয়ের বয়সও বাড়ানো হয়।····সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত মহিলারা পাশাপাশি মহিলা সমিতিব কাজ চালিয়ে গেছেন।····গবেষণার ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যা, সেই সাময়িক পত্র-পত্রিকা, সেগুলির মধ্যে নারী-পত্রিকার ক্রম বর্ধমান সংখ্যা গরিষ্ঠতাও নারী-স্বাধীনতার এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন ও প্রতিফলন (ডঃ ভারতী রায়, সহ উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সাক্ষাৎকার-রাজা মুখোপাধ্যায়- 'সানন্দা', ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৮৮, ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা)। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য মহিলা পরিচালিত পত্র-পত্রিকার কয়েকটি নাম হল — 'বঙ্গমহিলা'- মহিলা সম্পাদিত প্রথম সাময়িক পত্র, প্রকাশকাল-১৮৭০-১৩ই এপ্রিল, সম্পাদিকা-মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় (পাক্ষিক)। 'অনাথিনী'-মাসিক পত্র-জুলাই, ১৮৭৫, সম্পাদিকা-থাকমণিদেবী। 'হিন্দু ললনা'- (পাক্ষিক)- ফেব্রুয়ারি-১৮৭৮, সম্পাদিকা- জনৈকা মহিলা (নাম জানা যায় না) ব্যারাকপুরের নবাবগঞ্জ থেকে প্রকাশিত। 'খৃষ্টীয় মহিলা' জানুয়ারি-১৮৮১-সম্পাদিকা-কুমারী কামিনী শীল।

ভাবতী	-সম্পাদিকা -	স্বর্ণকুমাবী দেবী	(১২৯১-১৩০১)
ঐ	ঐ	হিবন্ময়ী দেবী ও সবলা দেবী	(১৩০২-১৩০৪)
ঐ	ঐ	সরলা দেবী	(১৩০৬-১৩১৪)
ঐ	ঐ	স্বর্ণকুমারী দেবী	(১৩১৫-১৩২১)
ঐ	ঐ	সবলা দেবী	(১৩৩১-১৩৩৩)
পবিচাবিকা	সম্পাদিকা	মোহিনী দেবী	)১৮৮৭-১৮৯৪)
ঐ	ঐ	সুচারু দেবী	(১৩০২-১৩১১)
ঐ	ঐ	মণিকা দেবী	(১৩১১-১৩১২)
ঐ	ঐ	নিরুপমা দেবী	(১৩২৩-১৩৩০)

'বঙ্গবাসিনী' (সাপ্তাহিক) ১২ আশ্বিন ১২৯০

'সোহাগিনী' বৈশাখ ১২৯১ সম্পাদিকা- কৃষ্ণরঞ্জিনী বসু ও শ্যামাঙ্গিণী দে

'বালক'	বৈশাখ ১২৯২	ঐ	জ্ঞানদানন্দিনী দেবী
'বিরহিনী'	১২৯৫	ঐ	শৈলবালা দেবী
'পুণ্য'	১৩০৪	ঐ	প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী
'অন্তঃপুর'	১৩০৪	ঐ	বনলতা দেবী
'মুকুল'	১৩০৭	ঐ	হেমলতা দেবী
ঐ	১৩১৮	ঐ	লাবণ্যপ্রভা সরকাব
ঐ	১৩৩৫	ঐ	শকুন্তলা দেবী

তালিকা বৃদ্ধির জন্য আরও নাম দেওয়া যায়, কিন্তু তাতে অনাবশ্যক দৈর্ঘ্য বাড়বে। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ধারাবাহিকভাবে মহিলা পরিচালিত মাসিক-পাক্ষিক এবং সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকাগুলি সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে চলেছে, এবং তার

পরিধি এত বিস্তৃত যে তা নিয়ে আলাদা গবেষণামূলক নিবন্ধ অনায়াসেই লেখা যায়। এগুলোর উল্লেখ করা হ'ল নারীশিক্ষা প্রসারের ফলশ্রুতি বিবেচনায়।

আর একটি বিষয় এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য — মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতাকে নারী ব্যক্তিত্বের বিকাশে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সহায়ক বলে মনে করা হলেও এটাকে স্ত্রী স্বাধীনতার একটা অংশ মাত্র বলা যায়। কারণ নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় স্ত্রীরাই প্রধানত উপার্জন করে এবং তাদের স্বামীরা বেকার জীবন কাটায়। কলকাতার মতো শহরে অনেক গৃহভৃত্য এবং পরিচারিকার জীবনে এইরকম ঘটনার পরিচয় মিলবে। এইসব নিম্নবিত্ত মহিলাদের কিঞ্চিৎ আর্থিক স্বাধীনতা থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, এরা হয় স্বামী পরিত্যক্তা, নয়তো স্বামী দ্বারা অত্যাচারিতা অথবা স্বামীর আইনত স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও এবং 'হিন্দু কোডবিল' পাস হওয়ার ফলে পুরুষের এক স্ত্রী বর্তমান থাকলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ হয়ে গেলেও স্বামীরা নির্বিকার চিত্তে আরও দুটো/তিনটে বিয়ে করেছে। আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এইসব মহিলারা স্বামীর দূরাচারকে মেনে নেয়। সুতরাং আমাদের দেশের সমাজের সর্বস্তরে প্রতিটি মেয়ের মধ্যে ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে প্রকৃত সচেতনতা এসেছে বলে মনে হয় না, আর্থিক সঙ্গতিও ব্যক্তিসত্তার নিশ্চিত গ্যারান্টি নয়। সেই বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত সমাজে মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট করা আছে একটা আলাদা আসন। এই আলাদা আসনটি যখন পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট আসনটির সমমর্যাদা সম্পন্ন শুধু নয়- সমার্থক হবে, একে অন্যের পবিপূরক হযে উঠবে তখন নারী ব্যক্তিত্বের, নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রকৃত বিকাশ সম্পূর্ণ হয়েছে বলা যাবে।

এজন্য আমাদের সামাজিক কাঠামোটাই দায়ী। প্রত্যন্ত অঞ্চল ও প্রদেশের সমাজ ব্যবস্থায় কিন্তু কোথাও কোথাও দেখা যায় নারীর প্রাধান্যই বেশি। সেইসব অঞ্চলে আধুনিক শিক্ষার আলো গিয়ে পৌঁছয়নি, ঐতিহ্যগত সংস্কার মেয়ে-পুরুষ মেনে চলেছে। 'কিন্নর' প্রদেশে এখনও রয়েছে দ্রৌপদী প্রথা, একই স্ত্রীর বহু সংখ্যক স্বামী এবং তা সমাজ স্বীকৃত। তবে এই প্রথার একটা বৈষয়িক উদ্দেশ্যও আছে — তাহ'ল, একই নারীর গর্ভে পরিবারের সব ভাইযের সন্তান উৎপাদন হয় বলে পারিবারিক সম্পদ ভাগ হয না। গাড়োয়াল প্রদেশেব গভীরে পার্বত্য হিমালযেব বিভিন্ন অঞ্চলে নারী-পুরুষ উভয়েই সমান পবিশ্রম সাপেক্ষ কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। কাজের কোন ভাগাভাগি করে দেওয়া নেই সে সমাজে। নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই সমাজে সম অধিকার-সমান ব্যবস্থা স্বীকৃত। মণিপুর, কেরালার কিছু অংশেও আছে নারী প্রধান সমাজ, সেখানে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাও অনেক সমৃদ্ধ, সাক্ষরতা এবং খেলাধূলোতেও মেয়েরা এগিয়ে আছে সেসব অঞ্চলে। (গবেষিকার এইসব অঞ্চলে ভ্রমণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লব্ধ বিবরণ)। তবে শিক্ষার মধ্যে দিয়ে যে সচেতনতা আসে (Education brings consciousness) আক্ষরিক অর্থে সে সচেতনতা তাদের মধ্যে খুঁজতে যাওয়া বৃথা। এজন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ জাত সামাজিক কাঠামোই দায়ী। সেই কঠিন প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবন ধারণই যেখানে সর্বপ্রধান ও সর্বশেষ চাহিদা — সেখানে

নারী-পুরুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন জীবন ধারণার কথা চিন্তা করার সময় বা সুযোগ তাদের কোনটাই নেই।

সংসার জীবনের সর্বত্র নারীর যে পূর্ব নির্ধারিত ভূমিকা — 'পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্য্যা' — সেই অবস্থার আমূল পরিবর্তন বোধহয় এখনও হয়নি। কারণ সমাজের সর্বস্তরে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে স্ত্রী-শিক্ষা এখনও প্রসার লাভ করেনি। যেখানে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে এমন পরিবারে নারীর পূর্ব ভূমিকা পরিবর্তনের বিষয়টি আপেক্ষিক অর্থে ব্যবহার করতে পারা যায়। আমাদের পুরুষ প্রধান সমাজে পুরুষের দাবিই সর্বাগ্রে বিবেচিত হয়ে থাকে। শিক্ষিতা উপার্জনক্ষম হয়েও মেয়েরা নিজেদের পুরুষের উপর নির্ভরশীল ভাবতে কুণ্ঠিত হয় না, নিজেদের 'নাথবতী' বা পুরুষের উপর নির্ভরশীল একজন মেয়ে — এই ভাবনার বাইরে বেরিয়ে এসে নিজেকে স্বতন্ত্র মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার কথা চিন্তাও করতে পারে না। তাই এখনও উচ্চশিক্ষিতা মেয়েরা পাত্র পক্ষের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসে নারী জীবনের 'চরম সার্থকতা' লাভের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। পণের কারণে বধূহত্যার যুগে বাস করেও পণের বিনিময়ে বধূ সাজতে আপত্তি করে না। এর কারণ আজও আমাদের সমাজে মেয়েদের পরনির্ভরশীল হয়ে থাকার শিক্ষাই দেওয়া হয়ে থাকে। তবে মানুষ সচেতন হচ্ছে। ধীর লয়ে হলেও নারী সমাজের এই সচেতনতা আশার কথা। সন্তানের মা হিসাবে নারীর ভূমিকাও আজ কম মূল্যবান নয়। শিক্ষিত পরিবারে ছেলে মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ-খাওয়া-দাওয়া-পড়াশুনোর উপরও মায়ের অধিকার এবং দায়িত্ব বহুক্ষেত্রেই আজ স্বীকৃত। কিন্তু সংস্কার গত সংকীর্ণতা এখনও বহু মহিলাই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য শিক্ষিতা-স্বল্প শিক্ষিতা কিংবা অশিক্ষিতা নির্বিশেষে বর্তমানে বহু মহিলাই যদিও জন্ম নিয়ন্ত্রণে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন, তবুও সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, শহরের নিম্নবিত্ত এলাকা ও গ্রাম-গঞ্জের মানুষ এ ব্যাপারে বৈষম্যমূলক নীতি মেনে চলেন। গ্রাম-গঞ্জে দেখেছি যেহেতু খেত-খামারে কাজ করার জন্য পুরুষ দরকার সেজন্য পুত্রসন্তান না জন্মানো পর্যন্ত তাঁরা জন্ম নিরোধে আগ্রহী হন না। অপরপক্ষে মেয়ে জন্মালে বরপণ ইত্যাদি ব্যাপারে ভবিষ্যৎ ব্যয়েব আশঙ্কা এবং চাষের কাজেও তাদের সাহায্য না পাওয়া ইত্যাদি কারণে একাধিক পুত্রসন্তান জন্মানোর পরেই আর কন্যাসন্তানের জন্য অপেক্ষা না করেই জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিয়ে নেন। শহরের অনুন্নত অঞ্চলে শ্রমিক অধ্যুষিত শিল্পাঞ্চলগুলি এবং নিম্নবিত্তদের বাসস্থান 'বস্তী' অঞ্চলে সমীক্ষা চালিয়েও ঐ একই তথ্য পাওয়া গেছে। সেখানেও কলে কারখানায় কাজের জন্য — রিক্‌শা-ঠেলা-বাস-ট্রাক চালানো এবং মোট বওয়ার জন্য 'ব্যাটাছেলের' দরকার, যে রোজগার করে এনে সংসারে দিতে পারবে, সুতরাং একাধিক কন্যাসন্তান জন্মানোর পরও তাঁরা অপেক্ষা করে থাকেন 'পুত্রের' মুখ দেখার আশায়। সেজন্য শরীর পাত করে স্বাস্থ্য নষ্ট করেও মায়েরা বহু সন্তান গর্ভে ধারণ করতে আপত্তি করেন না বা অনীহা দেখান না, বরং আগ্রহই দেখান। (দীঘা, কাকদ্বীপ, জয়নগর, বীরসিংহ, গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামগঞ্জে এবং কলকাতার উত্তর-দক্ষিণের শিল্পাঞ্চল ও বস্তী অঞ্চলে

লেখিকার সমীক্ষা লব্ধ অভিজ্ঞতার বিবরণ)। উচ্চশিক্ষিত, উচ্চবিত্ত মহলেও এই একই অবস্থা। সেখানেও বহু অর্থ ব্যয় করে আলট্রাসোনিক যন্ত্রে গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় করা হচ্ছে, অ্যাম্‌নিওসিন্‌থেসিস্‌ পরীক্ষার সাহায্যে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় করে কন্যা ভ্রূণ হলে তাকে হত্যা করা হচ্ছে, আর পুরুষ ভ্রূণ যদি বিকলাঙ্গ হয় তাহলেও সেই সন্তানকে জীবিত রাখা হচ্ছে। এক্ষেত্রেও সেই পণের প্রশ্ন, পারিবারিক বংশধারা রক্ষা করা, ভবিষ্যতের আর্থিক সঙ্গতির সম্ভাবনা ইত্যাদি কারণে কন্যাভ্রূণ হত্যা করা হচ্ছে। তবে নিম্নবিত্ত নিরক্ষর সহজ সরল মানুষরা যেমন নিজমুখেই স্বীকার করেছে, উচ্চবিত্ত উচ্চ শিক্ষিতরা সরাসরি তা স্বীকার করতে চান না — তাই তাঁদের মনের কথা জানার জন্য সমাজ তাত্ত্বিকদের যেতে হয় বিভিন্ন মেডিকেল ক্লিনিকে। বিজ্ঞানের এক যুগান্তকারী আবিষ্কার হ'ল "অ্যামনিওসিন্‌থেসিস টেস্ট", যার সাহায্যে গর্ভস্থ অবস্থায় ভাবী সন্তানেব ভবিষ্যৎ ও লিঙ্গ নির্ধারণ করা সম্ভব। বিজ্ঞানের এই আবিষ্কারের উদ্দেশ্য ছিল সুস্থ সন্তানকে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হতে দেওয়া এবং অসুস্থ সন্তানের জন্ম গর্ভেই রোধ করা। অর্থাৎ প্রকারান্তরে বর্তমান সমাজকে প্রতিবন্ধী মুক্ত করা- প্রতিবন্ধী শিশুর সমস্যা থেকে মুক্ত করা। কিন্তু আমাদের দেশে বেশ কিছুদিন ধরেই এই পরীক্ষার অপব্যবহার করা হচ্ছে। ভ্রূণের স্বাস্থ্য পরীক্ষার অজুহাতে ভ্রূণেব লিঙ্গ নির্ণয় কবা হচ্ছে এবং পবীক্ষার ফলে যদি দেখা যায় কন্যাভ্রূণ তবে ভ্রূণ হত্যা করা হচ্ছে। গত ১৯৭৬-৭৭ সালে পুনার একটি লিঙ্গ নির্ধারণ পরীক্ষার সমীক্ষায দেখা গেছে ৭০০ জনের মধ্যে ৪৫০ জন কন্যা ভ্রূণ ধারণকারিণীদের মধ্যে ৪৩০ জন কন্যা ভ্রূণ মোচনে আগ্রহী। অন্যদিকে ২৫০ জন পুত্রভ্রূণ ধারণকারিণীদের মধ্যে বিকলাঙ্গ, সন্তান হবে জেনেও শুধুমাত্র 'ছেলে' হবে বলে গর্ভপাতে রাজি হয়নি। বিজ্ঞানের এই আশ্চর্য আবিষ্কারকে 'কন্যা ভ্রূণ হত্যার হাতিয়ার' হিসাবে ব্যবহার কবা হচ্ছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে অ্যামনিওসিনথেসিস টেস্ট খুবই ব্যয়বহুল পরীক্ষা। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এই পরীক্ষার সাহায্য নেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। সমাজের উপর তলার উচ্চবিত্ত মহলেই এই পরীক্ষা চলেছে। অর্থাৎ উচ্চবিত্ত মহলেও কন্যা সন্তান যে আজও কত অবাঞ্ছনীয় এই ঘটনা তারই প্রমাণ। তবে সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে এই ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ অবিলম্বে এই ধবনের ঘটনা বন্ধ করার জন্য নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। দেশের বিজ্ঞানী সমাজও চিন্তিত হয়ে উঠেছেন এবং ভারতের ফেডারেশন অব অবষ্টেট্রিকস্‌ অ্যান্ড গায়নোকলজিক্যাল সোসাইটির আশঙ্কা এই ধরনের পরীক্ষা সমাজ জীবনে বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাবে। (কন্যা ভ্রূণ হত্যা : বিজ্ঞানের অপব্যবহার- ডা: তপতী বড়াল, 'সমকালীন প্রতিবিধান পত্রিকা' ত্রিমাসিক মহিলা পত্রিকা, ১ম বর্ষ-৩য় সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল ১৯৮৮) সুতরাং প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে এটাই আশার কথা, আর এটাই সামাজিক সচেতনতার লক্ষ্য, যে সামাজিক সচেতনতা আসে শিক্ষার মাধ্যমে কারণ সেই মৌলিক সত্য "Education brings consciousness" — যেজন্য বিদ্যাসাগরের সংগ্রাম।

সুতরাং 'দেশাচারের' সেই মজে যাওয়া স্রোতটা যতদিন পর্যন্ত না একেবারে রুদ্ধ

হয়ে যায়, ততদিন পর্যন্ত সেই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে — যে সংগ্রামের উত্তরাধিকার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কয়েক প্রজন্ম আগে আধুনিক বর্তমান যুগের বাংলাদেশের মেয়েদের উপর দিয়ে গেছেন।

১৮শ-১৯শ শতকীয় সমাজে পুরুষের আত্মাভিমান নারীকে 'অবলা' ছাড়া আর কিছু ভাবতো না। তাদের কাছে নারী ছিল শুধু জীবন্ত সম্পত্তি, ভাত-কাপড়ে পোষা সন্তান ধারণের যন্ত্রমাত্র। মেয়েদের শিক্ষালাভের সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। শ্বশুরবাড়ি থেকে দু'লাইন চিঠি লিখতে পারা, ধোপার ফর্দ-দুধের হিসেব-এর বেশি শেখার কোন দরকার নেই বলে মনে করা হ'ত। কারণ মেয়ে কি চাকরি করতে যাবে ? নাকি এনে খাওয়াবে ? মেয়ে না মাটির ভাঁড়। কথায় বলে বারোহাত কাপড় পড়লেও মেয়েদের ত' কাছা নেই, কাছা পুরুষের। নারীর চরিত্রগত সততার মানদণ্ড ছিল — "মরবে নারী, উড়বে ছাই, তবে নারীর গুণ গাই।" আমৃত্যু নারীকে সতীত্বের এই পরীক্ষা দিয়ে যেতে হ'ত। "আজও আমাদের সমাজ নারীর অপরাধ বিচারের বেলায় মোটামুটি অগ্নি পরীক্ষার যুগেই রয়ে গেছে। তবুও আজ এই বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে এসে মেয়েরা যদি কিছু অর্জন করে থাকে — তা হয়ত এই যে, এখন আর দূর থেকে আবছা দেখে তাদের প্রত্যেকের বিশিষ্ট ব্যক্তিসত্তাকে অগ্রাহ্য করতে না পারা।" সমাজ মানসিকতার এই ক্রম পরিবর্তন, ধীর গতিতে হলেও — সে পরিবর্তন যে শিক্ষা প্রসারের ফলেই হয়ে চলেছে — এটা অনস্বীকার্য। কারণ শিক্ষাই যে সমাজ মানসিকতা পরিবর্তনের প্রধানতম হাতিয়ার — এই মৌলিক সত্যকে কেউই অস্বীকার করতে পারেন না।

তবে সেইসঙ্গে আমাদের এটাও স্বীকার করতে হবে যে, আজকের নারীর মধ্যে যে সংগ্রামমুখীনতা এসেছে তার পিছনে শিক্ষার ভূমিকা যতখানি তার চেয়ে অনেক বেশি ভূমিকা সংকটময় অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, রাষ্ট্রীয় আন্দোলন এবং স্বাধীনতাকামী চেতনার উন্মেষের।

অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য নানাবিধ কারণে আজ যৌথ পরিবারগুলি স্বামী-স্ত্রী আর দু'একটি সন্তান সহ ছোট ছোট এককে বিভক্ত হয়ে গেছে। সেই ছোট্ট সংসারের সর্বময় ক্ষমতার আসনটি আজ বাঙালী নারী সম্পূর্ণ নিজেদের করে কায়েম করে নিয়েছে। সুতরাং সংসারের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের সব ভারটুকুই আজ নারীই বহন করছে বলা চলে। ফলে জায়ারূপে- মাতারূপে সংসার ক্ষেত্রে নারীর স্থান আজ অনেকটাই উপরে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই যে তা ঘটছে এমন কথা বলা যায় না। তাসত্ত্বেও দারিদ্র্য, সাংসারিক অসুবিধা ইত্যাদি নানাকারণে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার আশানুরূপভাবে না ঘটলেও ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরাও যে শিক্ষালাভের অধিকারী- এই অধিকারবোধও আজ নারী সমাজের সর্বত্রই জেগেছে বলা যায়।

১৮শ-১৯শ শতকে বাঙালী সমাজে উচ্চবিত্তশ্রেণীর তুলনায় অবরোধ প্রথার কঠোরতা অনেক শিথিল ছিল মধ্য ও নিম্নবিত্তশ্রেণীর মধ্যে। নারীর ভূমিকাও অতটা অবহেলিত ছিল না। মধ্য ও নিম্ন বিত্ত পরিবারে ঠাকুমা-পিসিমা এবং মায়ের ভূমিকা অনেকক্ষেত্রেই যথেষ্ট মর্যাদা সম্পন্ন ছিল সেই পুরুষ শাসিত সমাজেও। তার প্রমাণ পাওয়া যায়

বিদ্যাসাগরের স্বরচিত জীবন চরিতে, যেখানে তিনি বিধবা 'রাইমণির' সঙ্গে, পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলেছেন····"স্নেহ-দয়া-সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিষয়ে রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এপর্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্য মূর্তি আমার হৃদয় মন্দিরে দেবী মূর্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে।" (দ্রষ্টব্য : বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (৩য় খন্ড) পৃঃ ৪২২, সাক্ষরতা প্রকাশন)। বিদ্যাসাগর জননী ভগবতী দেবী সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মচরিতে বলেছেন, "শুনিলাম ভগবতী দেবী ছুতরের মেয়ে বলিয়া তাহাদিগকে ঘৃণা করা দূরে থাকুক, মেয়েটিকে কোলে জড়াইয়াছেন কাছে বসিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইয়াছেন····" (দ্রষ্টব্য : আত্মচরিত-শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ৬৬, অনুচ্ছেদ ২য়), 'বামাবোধিনী' পত্রিকার ১২৯৮ সালের পৌষ (৩২৪ সংখ্যা) সংখ্যায় ভগবতী দেবী সম্বন্ধে লেখা হয়েছে — "বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশ যখন তাঁকে নিন্দা ও উৎপীড়নে বিব্রত করে তুলেছিল, তখন বিদ্যাসাগর জননীই তাঁকে সমানে উৎসাহ দিয়ে তাঁর অন্তরে শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন।

রামতনু লাহিড়ীর জননী জগদ্ধাত্রী দেবী, শিবনাথ জননী গোলকমণি দেবী এবং শিবনাথ পত্নী প্রসন্নময়ী দেবীও মহৎ চরিত্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী ছিলেন। ভগবতী দেবীর মতো তাঁরাও জাতপাত গত সমস্তরকম কুসংস্কার থেকে মুক্ত আধুনিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন। (দ্রষ্টব্য : "আত্মচরিত" ও "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত)।

সেযুগে এটাও লক্ষণীয় ব্যাপার ছিল এই যে, সে যুগের মহিলাদের সার্বিক অবহেলা-অবরোধের প্রাচীর ভাঙ্গা শুরু হয়েছিল কিন্তু সেই উচ্চবিত্তশ্রেণীর নারীদের মধ্যথেকেই! "বড় মানুষের ঝি-বউদের পাল্কীর উপরে আরো একটা ঢাকা চাপা থাকতো মোটা ঘটাটোপের। দেখতে হ'ত যেন চলতি গোরস্থান। পাশে পাশে চলত পিতলে বাঁধানো লাঠি হাতে দারোয়ানজি। ওদের কাজ ছিল····কুটুম বাড়িতে মেয়েদের পৌঁছিয়ে দেওয়া, আর পার্বনের দিনে গিন্নিকে বন্ধ পালকি শুদ্ধ গঙ্গায় ডুবিয়ে আনা।" অর্থাৎ গঙ্গাস্নানের পুণ্য অর্জন ও আব্রু রক্ষা দুইই চলত একই সাথে। সেই অবরোধ-অবিশ্বাসের দুর্গ ভেঙ্গে ঐসব বড় ঘর থেকেই মেয়েরা অফুরন্ত সূর্যালোকে প্রশস্ত রাজপথে এসে দাঁড়ালেন জনতার মাঝখানে, নেতৃত্ব দিলেন সৌদামিনী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, কাদম্বরী দেবী প্রমুখ ঠাকুরবাড়ির মহিলারা আর অগ্রগামী ব্রাহ্মনেতা কেশব সেনের স্ত্রী।

নিজের সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য বাঙালী নারীর মধ্যে সংগ্রামী চেতনার সার্বিক বিকাশ ঘটলো আরও কয়েক প্রজন্ম পরে। যদিও সমাজের সর্বত্র এখনও পর্যন্ত এই সংগ্রামমুখীনতা দেখা যায়নি, তবুও একথা অনস্বীকার্য যে এ সম্পর্কে চিন্তাজগতে চেতনার উন্মেষ অবশ্যই ঘটেছে। "পঞ্চাশ বছর আগে বাঙালী মেয়েরা সংবাদপত্র ছুঁতোনা। কিন্তু অরক্ষণীয়া এক কুমারী মেয়ে যেদিন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে লাঞ্ছনার হাত থেকে নিষ্কৃতি দেবার জন্য নিজে আগুনে পুড়ে আত্মনাশ করল, সেদিন থেকে মেয়েরা বাংলা সংবাদপত্রের পাতায় স্থান পেল এবং জীবিতরা পাতা ওলটাতে লাগলো।

নারীর চিন্তার জগতে তখন থেকেই হয়ত শুরু হয়েছিল সংগ্রামী মানসিকতার অঙ্কুরোদ্গম। সমাজজীবনে- কর্মজীবনে-গার্হস্থ্যজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারী যে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে, শুধু 'নারী' হওয়ার জন্যে যে আজ তার সামনে নিষেধের কোন গন্ডী টানা নেই — এ স্বীকৃতি নারী আজ পেয়েছে, তবে সেই স্বীকৃতির বাস্তব প্রয়োগ হয়ত সর্বক্ষেত্রে হয়নি।

রামমোহনের সময় থেকেই বাংলাদেশের মেয়েদের মধ্যে সচেতনতা আনার চেষ্টা শুরু হয়েছিল। তিনি সতীদাহ নিরোধ আন্দোলন যখন শুরু করেন এবং প্রবর্তক-নিবর্তক সংবাদে যখন স্ত্রী জাতির মধ্যে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা লিখছিলেন তখন বিদ্যাসাগরের জন্ম হয়নি। (১৮১৮-১৮১৯) সতীদাহ নিবারণ আইন যখন প্রবর্তিত হয় (১৮২৯) তখন বিদ্যাসাগর নয় বছরের বালক, এবং সমস্ত সামাজিক সংস্কারকে অগ্রাহ্য করে রামমোহন যখন ইউরোপ যাত্রা করেন (১৮৩০) তখন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের ছাত্র দশ বছরের বালক। তারপর এল ইয়ংবেঙ্গলরা, নারীশিক্ষা, নারীমুক্তির জন্য সমাজে তাঁরা ঝড় তুললেন, সংস্কৃত কলেজের ছাত্র বিদ্যাসাগর তাও দেখলেন। পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য প্রগতিবাদীদের সমাজ সংস্কার কাজের ধারাও দেখলেন। পরিকল্পনাহীন 'কথা' সর্বস্ব আন্দোলনের সীমিত শক্তিও দেখলেন, সতীদাহ নিবারণ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে আইন প্রণয়নের সময় রামমোহনের পিছিয়ে আসাও দেখেছিলেন — এইসব কিছু দেখাশোনার পরই তিনি তাঁর সংস্কার আন্দোলনে নেমেছিলেন। আন্দোলনকে সফল করে তুলতে হলে 'কথা' নয় 'কাজ'-ই দরকার এটা তিনি বুঝেছিলেন, এবং সেই কাজ হবে সুপরিকল্পিত-এলোমেলো নয়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে শিক্ষা পরিকল্পনা করলেন, পুরনো শিক্ষা ব্যবস্থাকে (সংস্কৃত কলেজের) ঢেলে সাজাবার ব্যবস্থা করলেন, তারপর বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করতে লাগলেন সরকারি সুযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। এইসব বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য নিজস্ব পরিকল্পনা পেশ করলেন, বিদ্যালয়গুলি কেমন হবে, কি পড়াশোনা হবে, কারা পড়াবেন এবং কারা পড়বে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। (দ্রষ্টব্য: বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ-বিনয় ঘোষ পৃঃ ১৯৯-২০১)। তারপর নামলেন বিধবা বিবাহ আন্দোলনে, প্রায় সাথে সাথেই শুরু করলেন বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে নারীশিক্ষা প্রসারের চেষ্টায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করতে। তার আগে কলকাতা শহরে বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালনভার পেয়েছেন, শহর ও গ্রাম একই সঙ্গে দু' জায়গাতেই স্ত্রী শিক্ষার প্রসারের কাজ চালাতে লাগলেন। ইতিপূর্বে সর্ব শুভকরী পত্রিকায় 'বাল্যবিবাহের দোষ' নিয়ে প্রবন্ধও লিখেছেন, তারপর বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করালেন, তাকে কাজে প্রয়োগ করতে উদ্যোগ নিলেন। এরপর শুরু করলেন বহুবিবাহ নিরোধ আন্দোলন। এইসব আন্দোলনের ফলে দেশব্যাপী একটা আলোড়ন শুরু হয়ে গিয়েছিল। পত্র-পত্রিকায় বাদ-প্রতিবাদ-বিভিন্ন জনের বৈঠকখানায় আলাপ-আলোচনা চলছিলই, সেই আন্দোলনের উত্তাপ বাংলাদেশের অন্তঃপুরেও নিশ্চয়ই এসে পড়ছিল। বিদ্যাসাগরের নির্ভীক মানসিকতার পরিচয়সূচক বিভিন্ন ঘটনা তখন বাংলাদেশের বাতাসে কিংবদন্তীর মতো

ভাসছে, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পন্ডিত পরিবারের সন্তান, মায়ের হাতে কাটা সুতোয় তৈরি মোটা খাটো ধুতি পরনে, চাদর গায়ে, মাথায় প্রলম্বিত শিখাধারী ব্রাহ্মণ পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সদম্ভে ঘোষণা করলেন — "সাংখ্য-বেদান্ত ভ্রান্ত দর্শন, ইউরোপীয় প্রশাসককে অকুতোভয়ে জানালেন বার্কলের ইন্‌কুইরী ও ভ্রান্ত দর্শন।" বিদেশী প্রশাসককে জানাতে ভুললেন না - ব্যালান্টাইনের কাছ থেকে তিনি সমপদস্থেরই মর্যাদা দাবি করেন, ব্যালান্টাইনের উপদেশ তিনি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। ব্রিটিশরাজের অধীনে চাকরি করে সেই ব্রিটিশ রাজের কর্মচারীর (কার সাহেব) মুখের সামনে চটি শুদ্ধ পা নাচানোর গল্প থেকে শুরু করে, চটি পায়ে এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রবেশ করতে না পেরে চলে আসা, বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত ব্যাপারে মনান্তর হওয়ায় সংস্কৃত কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দেওয়া, ছোটলাটের মুখের উপর "আলু পটল বেচে খাব" বলে ইস্তফা পত্র পেশ করা। পুত্র নারায়ণের বিধবা বিবাহ উপলক্ষে স্বগ্রামবাসীবা সমাজে 'এক ঘবে' করার হুমকি দিলে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, তিনি দেশাচাবের নিতান্ত দাস নন, সমাজের মঙ্গলের জন্য যা উচিত মনে হয়েছে করেছেন, লোকের বা আত্মীয় কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সংকুচিত হবেন না, তার সঙ্গে আত্মীয়রা যদি সম্বন্ধ না রাখেন তাহলে তাঁর কিছুমাত্র অনুশোচনা হবে না। এই সংগ্রামমুখী মানসিকতার উত্তরাধিকারই বিদ্যাসাগর মহাশয় দিয়ে গেছেন আমাদের-বাংলাদেশের নারী সমাজকে।

সামগ্রিকভাবে না হলেও আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং আত্মপ্রত্যয়বোধও নারীর মধ্যে অবশ্যই এসেছে। আন্তর্জাতিক অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে হয়ত সে প্রতিষ্ঠা- সে প্রত্যয়বোধ খুবই ন্যূন-তবুও যতটুকু বোধ সে সম্পর্কে জেগেছে তার মূল্যও কম নয়। ১৮শ-১৯শ শতকের বাংলাদেশের সমাজে নারীর যে অবস্থার চিত্র আমরা সে যুগের সামাজিক ইতিহাস পাঠ করে জানতে পারি সে অবস্থাকে নিঃসন্দেহে অনেক পিছনে ফেলে এসেছে আজ বাঙালী নারী সমাজ। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 'নারীকে আপনভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার হে বিধাতা' ? মহাকবির এই প্রশ্নের উত্তর পরবর্তীকাল দিতে পারলেও একথা অনস্বীকার্য যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে এদেশের পুরুষেরাই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর এদেশের নারীকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রক্ষণশীল সমাজের সঙ্গে লড়াই চালিয়েছেন, তাঁদের সেই লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন মনোমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বহু বিখ্যাত মানুষ। এছাড়া খ্রীষ্টান মিশনারি ও ব্রাহ্মরাও এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। গত দুশো বছর ধরে এদেশে ধর্মান্ধতা, নিষ্ঠুর কুসংস্কার আর নারী অবমাননার সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন প্রধানত কয়েকজন হৃদয়বান পুরুষই। নারী আজ পেয়েছে তার শিক্ষার অধিকার, স্বাধীন উপার্জনের অধিকার, পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার, নিরঙ্কুশ দাম্পত্য ও তার অভাবে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার এবং পরিবার পরিকল্পনা করার অধিকার। এই 'পঞ্চ শীলে'র উপর আজকের মেয়েদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শৈশবে পিতা,

যৌবনে স্বামী ও বার্ধক্যে পুত্রের নিশ্চিন্ত (?) আশ্রয় থেকে ক্রমশ তারা চ্যুত হচ্ছে, আর এই স্বাধীনতার আবশ্যিক অনুষঙ্গ যে ঝড়-ঝাপটা তাও সহ্য করতে হচ্ছে যথেষ্ট। তবু মনুষ্যধর্মের বিবেচনায়- এটাই শ্রেয়তর জ্ঞান করে সে। সেদিনের সমাজে 'মেয়ে হওয়া মহাপাপ'-এই ছিল প্রবচন। ছেলে হলে বাড়িতে শাঁখ বাজাতো, মেয়ে হলে সাত পুরুষ নরকস্থ। মেয়ে না জন্মালে যে ছেলে জন্মাতে পারবে না — এই সহজ বুদ্ধিটাও যেন লোপ পেয়ে গিয়েছিল সেদিন। সেদিনের মানহারা-প্রতিষ্ঠাহারা বাঙালী নারী মনে মনে বিদ্রোহের বীজমন্ত্র জপ করতো কিনা সে কথা আজ আর জানার উপায় নেই। পুরনো সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার জন্যই হয়তো সেদিনের বাঙালী মেয়ে-সমাজের একটা বিশেষ অংশ অ-সহযোগ আন্দোলন সশস্ত্র বিপ্লবাত্মক আন্দোলন তথা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ডাকে ঘর ছেড়ে পথে নেমে এসেছিল। এই স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যেদিয়েই যেন আত্মনিয়ন্ত্রণের এবং আত্মপ্রত্যয়ের বোধ বাঙালী নারী অর্জন করেছিল। রাজনীতিকে আশ্রয় করেই যেন তারা সমাজ বিপ্লবের সূচনা করেছিল। এরপর একে একে এল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ,বিয়াল্লিশের আন্দোলন, পঞ্চাশের মন্বন্তর, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদহিন্দ আন্দোলন, দেশবিভাগ এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। যেন একটা রাষ্ট্র বিপ্লব ঘটে গেল সমগ্র দেশে। এই বিপ্লবের আঘাতে লক্ষ লক্ষ পরিবার ছিন্নমূল হয়ে গেল। অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটলো প্রায় প্রতিটি পরিবারে। প্রাণ বাঁচানোর প্রাণান্তকর তাগিদে রুখে দাঁড়ালো মানুষ, দেশাচারের দুর্গ ভেঙে গেল চেতনা মুক্তির আঘাতে। বাঁচার লড়াই শুরু হ'ল। আর এই লড়াইয়ের প্রধানতম হাতিয়ার হ'লো শিক্ষা।

সুতরাং ১৯৪৭-এর পর থেকেই ভাবত রাষ্ট্রে নারী সমাজের অগ্রগতি হয়েছে দ্রুততর। ভারতের সংবিধানে নারীর দাবি স্বীকৃত হ'ল। শিক্ষাক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে, মেয়েরাও সমান আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে নিজের জায়গা করে নিতে লাগলো। প্রমাণিত হ'ল গণিতে-রসায়নে-পদার্থবিদ্যায়-চিকিৎসা বিজ্ঞানে পূর্ত ও কারিগরি বিদ্যায়-স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে-ঐতিহাসিক-তথ্যবোধে, সামরিক বাহিনীতে-বিমানে ও নৌবাহিনীতে সর্বোপরি অর্থনীতি ও রাজনীতিতে তারা পুরুষের সমান অংশীদার হতে পারে। বিগত ষাট-সত্তর বছরে বাঙালী সমাজের প্রধান ইতিহাস হল নারীর শৃঙ্খলমুক্তির ইতিহাস, নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা-আত্মপ্রত্যয় বোধ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। আর এই নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রপথিক বিদ্যাসাগরের সফলতা এখানেই। সমকালীন সময়ে না হলেও কয়েক প্রজন্ম পরে যে তাঁর সাধনার সিদ্ধিলাভ ঘটেছে তাতেই তাঁর কৃতিত্ব।

যে পরিবেশে বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেদিনের সেই সামাজিক পরিবেশ কেমন ছিল ? কৃষক-জেলে-বাগদী অধ্যুষিত দরিদ্র গ্রাম বীরসিংহ। তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষ এই গ্রামে বেশি বাস করতেন না। গ্রামবাসীরা দরিদ্র হলেও খাঁটি মানুষ তারা। দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র শৈশবে এইসব খাঁটি মানুষদের মধ্যেই বড় হয়ে উঠেছিলেন। এইসব নিম্নবর্ণের শিশুগুলিই ছিল তাঁর খেলার সাথী। বিশেষ কোন ধনীর দুলাল তাঁর বাল্য সহচর ছিল না। শৈশব থেকেই তাই মানুষে মানুষে পার্থক্য বোধের গ্লানি তাঁর মধ্যে ছিল না। তিনি নিজেও ছিলেন অতি দরিদ্র ঘরের সন্তান। কিন্তু দরিদ্র হ'লেও

অত্যন্ত আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন সেই পরিবারের মানুষগুলি। পিতামহী দুর্গাদেবী স্বামী দেশান্তরী হওয়ায় পিতৃগৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন, কিন্তু অনতিকালের মধ্যেই পিতৃগৃহ ত্যাগ করে পর্ণকুটীরে শিশু সন্তানদের নিয়ে সুতো কেটে অনশনে অর্ধাশনে দিনযাপন করেছেন, তবু স্বামীর মর্যাদা ক্ষুন্ন করে পিতৃগৃহে ভাইদের অবহেলার অন্নগ্রহণ করেননি। উত্তরাধিকার সূত্রে পিতামহী দুর্গাদেবীর আত্মমর্যাদা জ্ঞান ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রে সঞ্চারিত হয়েছিল, আর পিতামহ রামজয়ের চরিত্রের অমিত তেজ ও ঋজু চরিত্রের বৈশিষ্ট্যও তাঁর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিদ্যাসাগর চরিতে' বলেছেন : "এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌত্রকে আর কোন সম্পত্তি দান করিতে পারেন নাই। কেবল যে অক্ষয় সম্পদের উত্তরাধিকার বন্টন একমাত্র ভগবানের হস্তে, সেই চরিত্র মাহাত্ম্য অখণ্ডভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্রের অংশে রাখিয়া গিয়াছেন।" এইরকম পারিবারিক পরিবেশে তিনি শৈশবকাল অতিক্রম করে পিতা ঠাকুরদাসের সঙ্গে যখন কলকাতায় আসেন তখন পুরোপুরি রামমোহনের যুগ শুরু হয়ে গেছে। কলকাতায় তখন 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (১৮১৭)। স্ত্রীশিক্ষার কথাও আলোচনা হচ্ছে শহরে। কলকাতার 'ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি হিন্দু কন্যাদের জন্যে ১৮১৯ সালে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' নামে একটি মহিলা সমিতি স্থাপন করেছেন। ১৮২১ সালে মিস কুক ইংলন্ড থেকে এদেশে এসে Ladies Society for Native Female Education in Calcutta and its vicinity নামে একটি সমিতি স্থাপন করেছেন। মিসকুক প্রথমে একজন বাঙালী শিক্ষিকা নিযুক্ত করেন। এই সোসাইটির উদ্যোগে নন্দনবাগান, গৌড়ীবেড়ে, জানবাজার ও চিৎপুর অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এইসব বালিকা বিদ্যালয়গুলির নাম ছিল জুভেনাইল স্কুল, লিভার পুরস্কুল, সালেম স্কুল ও বার্মিংহাম স্কুল ("Name after the place in which the ladies reside.") ১৮২২ সালে জুভেনাইল সোসাইটির উদ্যোগে 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। এদেশেরই একজন সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালংকার পুস্তিকাটি রচনা করেন। ইতিহাস থেকে অনেক হিন্দু বিদূষী মহিলার দৃষ্টান্ত উদ্ধার করে স্ত্রীশিক্ষা যে সামাজিক রীতি বিরুদ্ধ নয় লেখক তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, বিক্ষিপ্তভাবে হলেও সেইসময় থেকেই বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার চেষ্টা শুরু হয়েছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় এসে আশ্রয় পেলেন ভাগবতচরণ সিংহের গৃহে। সেখানে বালক ঈশ্বরচন্দ্র রাইমণির কাছে পেলেন মাতৃস্নেহ। মায়ের কোল ছেড়ে এসে এই শহর কলকাতায় বালক ঈশ্বরচন্দ্রের মনে রাইমণির স্নেহ মাতৃবিচ্ছেদ বেদনাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের পরবর্তী জীবনের জন্য রাইমণি-র স্নেহ যে প্রয়োজন ছিল ইতিহাসই তা বলে। পরবর্তীকালে ঈশ্বরচন্দ্র নিজেই এ সম্পর্কে বলেছেন : "আমি স্ত্রী জাতির পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রী জাতির পক্ষপাতী না হয়,

তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।"

১৯শ শতকের দ্বিতীয় দশকে বিদ্যাসাগরের জন্ম। বাংলাদেশে তখন যুগান্তর শুরু হয়ে গেছে। সর্বত্র সংশয়, দ্বন্দ্ব এবং ভয়। দ্বন্দ্ব চলছে প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের, রক্ষণশীলতার সঙ্গে প্রগতিশীলতার। কলকাতায় তখন শিক্ষা নিয়ে প্রবল মতদ্বৈধ চলছে। গোলদীঘির পারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সংস্কৃত কলেজ, আর তার কাছেই হিন্দু কলেজ- একটি প্রাচীন পন্থী, দ্বিতীয়টি নব্যপন্থী। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র পাঠ্যবস্থায় রামমোহনের সংস্কার আন্দোলনকে উপলব্ধি করলেন, প্রত্যক্ষ করলেন ইয়ংবেঙ্গল দলের উচ্ছৃঙ্খলতা। পাশ্চাত্য সভ্যতার রঙে রঙিন খ্রীষ্টধর্মের ছত্রতলে আশ্রয় নিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি বাংলার তরুণ প্রতিভা। খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুললেন দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতাগণ। উনবিংশ শতকে বঙ্গদেশ প্রধানত ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছিল। মস্ত এক কর্মযজ্ঞ যেন চলছিল দেশজুড়ে। সেই কর্মযজ্ঞ থেকে দূরে থাকতে পারলেন না বিদ্যাসাগরও। তবে ধর্ম সম্বন্ধে তিনি ছিলেন নিরুত্তর। কর্মকেই তিনি করেছিলেন জীবনের ধ্যানজ্ঞান।

রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে যুগ তারই মধ্যভাগে বিদ্যাসাগরের অবস্থান। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা। (১৮১৭-২০শে জানুয়ারি) থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান (১৯১৮-১১ই নভেম্বর)-১৯১৯-এ জালিয়ানাওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড এবং গান্ধীজীর ভারতীয় রাজনীতিতে আবির্ভাব- মোটামুটি এই একশত বছরকে সমগ্রভাবে একটা যুগ বলা যায়। এই যুগটা হ'ল বাংলার নবযুগ। পরাধীন দেশে এক আধা সামন্ত ব্যবস্থার মধ্যে বাঙালী ভদ্রলোক শ্রেণী এ যুগের স্রষ্টা, বাহক ও ধারক। তাসত্ত্বেও এই একশত বৎসরের মধ্যে বাঙালী সমাজে যে ব্যাপক আলোড়ন দেখা গিয়েছিল-এত অদ্ভুত কীর্তি স্রষ্টা, মনীষী ও কর্মীপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল যার তুলনা ভারতের ইতিহাসে আর নেই।

দুটি পর্বে এই যুগকে বিভক্ত করা যায় —

এই যুগের প্রথম পর্ব- মোটামুটি ১৯শ শতকের প্রথমার্ধকে বলা যায়। অর্থাৎ ১৮১৫ থেকে ১৮৫৯ পর্যন্ত সময়কাল।

আর দ্বিতীয় পর্ব হিসাবে ধরা যায়- ১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকাল থেকে ২০শ শতকের প্রথম দুই দশক।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাল (১৮২০-১৮৯১)- এই দুই পর্বের সংযোগ স্থলে। তিনি যখন কলকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজে যোগ দিলেন (১৮২৯) তখন হিন্দু কলেজে চলেছে ডিরোজিওর যুগ। তিনি যখন সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নমগ্ন তখন পার্শ্বস্থ হিন্দু কলেজ ইয়ংবেঙ্গলের বিদ্রোহে টলায়মান। সমাজে ঝড় বইছে। দিগ্‌ভ্রান্ত যৌবনের বিদ্রোহে-ঔদ্ধত্যে সমকালের সহানুভূতি না থাক, যুক্তি, সাহস, সত্যবাদিতায় সেই পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ইয়ংবেঙ্গল যে এক অনস্বীকার্য যুগসত্যের অগ্রদূত একথা মানতেই হবে। ঈশ্বরচন্দ্রের উন্মুখ জাগ্রত চিত্তে সে যুগের প্রভাব নিশ্চয়ই পড়েছিল, কারণ সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষে আমরা দেখি এই যুগচেতনাকে গ্রহণ করার জন্য বিদ্যাসাগর প্রস্তুত।

১৮৭০ পর্যন্ত একটানা এবং ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত কর্মক্ষেত্রে তিনিই বাঙালী সমাজে অগ্রগণ্য।

যেসব সমস্যা তিনি কর্মপটু মানুষের মতো সমাধানে উদ্যোগী হন, সেইসব সমস্যা নিয়ে বিশবছর আগেই 'আত্মীয়সভার' (রামমোহন) আলোচনায় প্রশ্ন উঠেছে, ইয়ংবেঙ্গলের পত্র-পত্রিকায়, তত্ত্ববোধিনীর সভ্যদের মধ্যে সেসব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে সেগুলি ছিল মূলত আলোচনা ও সদিচ্ছা। তবু এতসব কিছুর পরও থেকে যায় দেশাচার-লোকাচাব-জগদ্দল পাথরের মতো যা জনমানসের গতিস্রোতকে অবরুদ্ধ করে রাখে, যে জনমানসের বিস্ফোরণের আশঙ্কায় শাসকশ্রেণী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সংস্কারকে আইনে পরিণত করতে অরাজি হয়, সংস্কারমূলক প্রচেষ্টার উপর থেকে সাহায্যের হাত উঠিয়ে নেয়- পশ্চাদপসরণ করে (বহুবিবাহ প্রথাকে আইন করে বন্ধ করতে অসঙ্গত হয়েছিল ব্রিটিশ সরকার, স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের জন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েও সরকার শেষপর্যন্ত সেই প্রতিশ্রুতি পালন করেনি), সেই দেশাচার-সেই লোকাচারের কারণেই বিদ্যাসাগর তাঁর সময়ে পুরোপুরি সাফল্য লাভ করতে পারেননি। সেসময় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বড় অন্তরায় ছিল এদেশীয় শিক্ষিকার অভাব। মিস মেরী কার্পেন্টার এই অভাব দূর করার চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৬৬ সালের শেষে তিনি কলকাতায় আসেন এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের কাজে সহায়তা করার জন্য। মিস কার্পেন্টার কলকাতায় এসেই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করেন। এদেশীয় শিক্ষিকা গড়ে তোলার জন্য মিস কার্পেন্টার বেথুন স্কুলে একটি 'স্ত্রী নর্মাল বিদ্যালয়' স্থাপনে উদ্যোগী হন। ব্রাহ্মসমাজে এই উদ্দেশ্যে একটি সভা করা হয়। আমন্ত্রিত হয়ে ঐ সভায় বিদ্যাসাগরও উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় (১ ডিসেম্বর ১৮৬৬) যে কমিটি গঠিত হয় বিদ্যাসাগর তার সভ্য নিযুক্ত হন। কিন্তু পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এক পত্র লিখে জানিয়ে দেন যে, "তিনি প্রস্তাবিত প্রস্তাবে লিপ্ত থাকিতে সম্মত নহেন।"

স্ত্রী নর্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর নীতিগত কোন আপত্তি না থাকলেও সামাজিক কারণে আপত্তি ছিল। ১লা অক্টোবর ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলার তৎকালীন ছোটলাট উইলিয়াম গ্রেকে একটি পত্রে জানান- "আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের পর আমি এ বিষয়ে অনেক ভেবে দেখেছি এবং অনুসন্ধানও করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্ত্রী নর্মাল বিদ্যালয় সম্বন্ধে আমার পূর্বের মত পরিবর্তনের কোন কারণ আমি খুঁজে পাইনি। এ সম্বন্ধে আমার মত এই যে, আমাদের দেশের হিন্দু সমাজের গ্রহণযোগ্য একদল দেশীয় শিক্ষয়িত্রী তৈরি করবার জন্য মিস কার্পেন্টার যে পথ অবলম্বন করতে চান, তা কাজে পরিণত করা কঠিন। আমাদের সমাজের যে বর্তমান অবস্থা এবং দেশবাসীর যে মনোভাব তাতে এই ধরনের কোন প্রতিষ্ঠান চালানো সম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে আমি যত ভেবেছি, তত এই ধারণাই আমার দৃঢ় হয়েছে। যে কাজ বা পরিকল্পনা বাস্তবে সফল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই তা আমি কোনমতেই সরকারকে গ্রহণ করতে পরামর্শ দিতে পারি না।

এদেশের ভদ্র পরিবারের হিন্দুরা যখন অবরোধ প্রথার গোঁড়ামির জন্য দশ-এগারো বছরের বিবাহিত বালিকাদেরই গৃহের বাইরে যেতে দেয় না, তখন তারা যে বয়স্কা

মহিলাদের শিক্ষয়িত্রীর কাজ গ্রহণ করতে সম্মতি দেবে, এ আশা দূরাশামাত্র। বাকি থাকে অসহায় অনাথ বিধবারা, এবং তাদেরই একাজে পাওয়া যেতে পারে। শিক্ষকতার কাজে তারা কতদূর উপযুক্ত হবে আপাতত সে প্রশ্ন বাদ দিয়েও আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, অন্তঃপুর ছেড়ে বাইরে বিধবারা যদি সাধারণ শিক্ষয়িত্রীর কাজে যোগ দেয়, তাহলে লোকের কাছে তারা অবিশ্বাসের পাত্রী হয়ে উঠবে। তা যদি হয় তাহলে এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী যে কতটা আবশ্যক ও অভিপ্রেত তা আমি বিশেষভাবে জানি, এবং সেকথা আপনাকে নতুন করে জানানো বাহুল্য মনে করি। দেশবাসীর দৃঢ় মূল সামাজিক কুসংস্কার যদি দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে না দাঁড়াত, তাহলে সকলের আগে আমি এ প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করতাম এবং একে কাজে পরিণত করার জন্য যথাসাধ্য সহযোগিতা করতে এতটুকু কুণ্ঠিত হতাম না। কিন্তু যে কাজে সাফল্যের কোন সম্ভাবনা নেই তা আমি নিজে যেমন সমর্থন করি না, তেমনি সরকারকেও তা করতে পরামর্শ দিতে পারি না।"

যুগ সংস্কারক যাঁরা তাদের মধ্যে একটা ঔচিত্যবোধও কাজ করে। যে সংস্কারের আপাত কোন সম্ভাবনা নেই, যা করতে গেলে অন্যান্য অবশ্য প্রয়োজনীয় সংস্কারকার্য ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা, সেই ধরনের সংস্কার বস্তুবাদী সংস্কারকগণ করতে চান না। এ প্রসঙ্গে রুশোর দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। নয়া আভিজাত্যের সামাজিক সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে গণ বিদ্রোহের নায়ক, শিশু মুক্তির জনক রুশো কিন্তু নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তির ক্ষেত্রে তাঁর সময়কার যুগচেতনার ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করতে পারেন নি। স্ত্রীজাতির বুদ্ধি বৃত্তিতে আস্থাও রাখতে পারেননি। বরং বলেছেন — A women of culture is the plague of her husband, her children, her family, her servants- everybody. গৃহিণীর জীবনই মেয়েদের পক্ষে প্রকৃতি নির্ধারিত জীবন, বুদ্ধি বৃত্তির চর্চার থেকে তাদের প্রয়োজন সুগৃহিনী ও সুসঙ্গিনী হওয়া। তাই বাড়িতে মায়ের কাছে শিক্ষাই শ্রেয়। এমিলের শিক্ষায় রুশো উদার, কিন্তু সোফির শিক্ষায় তিনি সংকীর্ণ। তিনি অভিজাত সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, কিন্তু সোফিকে সেই সমাজের অনুকরণে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। সোফির স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে তিনি স্বীকার করেননি। এক্ষেত্রে তিনি স্ববিরোধী চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে যুগচেতনার উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। তবে যুগচেতনার উর্ধ্বে তিনি উঠতে পারেননি এটা বোধহয় সর্বতোভাবে বলা যায় না, তা যদি হ'ত তাহলে বিধবার পুনর্বিবাহের চেষ্টাইতো তিনি করতেন না, সাংখ্য বেদান্তকে ভ্রান্ত দর্শন বলে শিক্ষাক্রম থেকে (সংস্কৃত কলেজের) বাদ দেওয়ার কথাও বলতেন না। এমনও হতে পারে যে, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে প্রতিশ্রুত সরকারী সাহায্য দানে বঞ্চিত করা, পরের দিকে অতি নগণ্য পরিমাণে এবং তাও অনিয়মিতভাবে সাহায্যদান, সময়ে সময়ে অর্থকৃচ্ছ্রতার অজুহাতে সেইটুকু পরিমাণ সাহায্যদানেও গাফিলতি- ইত্যাদি কারণে ভারতবর্ষের প্রজা সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে প্রকৃত সরকারি মনোভাব সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতাই হয়ত

স্ত্রী নর্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের আপত্তির অন্যতম কারণ ছিল। বিশেষত দেশীয় মানুষকে দেওয়া সরকারী প্রতিশ্রুতিতে তখন আর তাঁর কোন বিশ্বাসই ছিলনা। যাইহোক স্ত্রী নর্মাল বিদ্যালয় সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মতামত যে সময়োপযোগীই হয়েছিল, পরবর্তী ঘটনাবলীই তার প্রমাণ।

১৮৮৮ সালে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়েছে, "যদিও বঙ্গদেশে ক্রমেক্রমে স্ত্রী শিক্ষার প্রতি যত্ন ও উৎসাহ বৃদ্ধি হইতেছে, যদিও স্ত্রী-শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে লোকের সন্দেহ ক্রমে দূরীভূত হইতেছে, তথাপি বঙ্গদেশে যতদিন অবরোধ প্রথা প্রচলিত থাকিবে, ততদিন স্ত্রী-শিক্ষা সহজ ও সত্বর বিস্তার পক্ষে বিঘ্ন ঘটিবে না। ....অবরোধ প্রথা থাকাতে স্ত্রী-শিক্ষার সম্বন্ধে যে ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে যাহাতে তাহার নিবাকরণ হয়, তাহার জন্য আমরা বিশেষ চিন্তিত। ....আমাদের একান্ত বাসনা যে, আমাদিগকের মধ্য হইতে সুশিক্ষিতা পারিবারিক শিক্ষয়িত্রী সকল নিযুক্ত হন এবং তাঁহারা গৃহে গৃহে গমন করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, নীতি ইত্যাদি উচ্চ উচ্চ বিষয়ে শিক্ষাপ্রদান করেন। আমরা জানিয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইলাম যে, কতকগুলি কৃত বিদ্য ব্যক্তিত্ব সুশিক্ষিতা বঙ্গীয় মহিলাদের স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রকৃষ্ট উপায় সকল অবলম্বন করিবার নিমিত্ত একটি সভা গঠন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা ও নিযুক্ত করা ঐ সভার একটি প্রধান কার্য হইবে।.... ।....ইহার জন্য শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত হইবে এবং সেই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ শিক্ষিতা হইলে তাঁহাদিগের মধ্যে কতকগুলি অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রী হইবেন, এবং কতকগুলি মফস্বলে গমন করিয়া তথায় অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য অন্তঃপুর বিদ্যালয় সকল স্থাপন করিবেন। শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ অন্তঃপুর বিদ্যালয়ে যাহাতে উপযুক্ত বেতনে কাজ পাইতে পারেন তাহার নিয়ম করা হইবে। অন্তঃপুর বিদ্যালয়গুলির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীগণও ঐ সকল বিদ্যালয়ে কাজ পাইতে পারিবেন।" (বামাবোধিনী পত্রিকা-আষাঢ়-১২৯৫, জুলাই ১৮৮৮, ৪র্থ কল্প, ২য় ভাগ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৌজন্যে)।

বিদ্যাসাগর মহাশয় স্ত্রী নর্মাল বিদ্যালয়ের সার্থকতা সম্বন্ধে ১৮৬৭ সালে যে নেতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছিলেন তা'যে কত সময়োচিত হয়েছিল তার প্রমাণ আরও একুশ বছর অর্থাৎ প্রায় দু'যুগ পরে 'বামাবোধিনী'তে প্রকাশিত উল্লিখিত সংবাদটিতে পাওয়া যায়। তখনও অর্থাৎ ১৮৮৮তে বলা হচ্ছে অবরোধ প্রথার দরুন স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের বিঘ্ন হচ্ছে এবং যতদিন অবরোধ প্রথা থাকবে, ততদিন স্ত্রী-শিক্ষার সহজ ও সত্বর বিস্তার ঘটা সম্ভব নয়। সেই সময়কার শিক্ষিত কৃত বিদ্য মহিলা ও পুরুষরা একটি সভাস্থাপন করে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রস্তাবিত ঐ শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় হতে শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করে তাদের অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রীর কাজে লাগানো হবে এবং ঐ কাজে উপযুক্ত বেতনও দেওয়া হবে। অর্থাৎ 'ঢাকা চাপা ঘেরা টোপের' মধ্যে মেয়েদের রাখাও হবে এবং সেই অবস্থাতেই তাদের উচ্চ থেকে উচ্চতর শিক্ষাও দেওয়া হবে। এ যেন 'সোনার পাথর বাটি'র মতো ব্যাপার। আরও বিস্ময়ের

ব্যাপার হ'ল, শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে মেয়েরা শিক্ষা পেয়ে অন্তঃপুরের মেয়েদের শিক্ষা দেবে বলে সভায় প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে বলে সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে। এই সংবাদ পাঠ করে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে যেসব মেয়েরা শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণ করতে আসবে তারা কি অন্তঃপুরের মহিলা নয়? অর্থাৎ সেই স্ববিরোধিতা- চিন্তায় কর্মে যা বুদ্ধিজীবী বাঙালীর বিশেষত্ব, যার ফলে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার বিঘ্নিত হয়েছে, যে কারণে শহুরে ভদ্রলোক শ্রেণীর প্রতি বিদ্যাসাগর শেষ জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে গিয়েছিলেন।

দেশ-কালের পক্ষে কোন বিষয় কতখানি উপযোগী তা তিনি জেনে ছিলেন। (তবে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার এবং বিধবা বিবাহ প্রচলনও বহু বিবাহ নিরোধ আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর এই "জানা" বা এই ঔচিত্যবোধ এসেছিল অনেক দুঃখজনক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে, অর্থাৎ যাকে বলে 'ঠেকে শেখা' কতকটা যেন তাই)। তাই তিনি বলেছেন যেখানে দশ এগারো বছরের বিবাহিতা বালিকাকে অবরোধের মধ্যে রাখা হয়, সেখানে তাদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতে দেওয়া হবে — তৎকালীন সামাজিক অবস্থায় সেটা একেবারেই অসম্ভব। বিদ্যাসাগরের মতামত উপেক্ষা করে বেথুন স্কুলে স্ত্রী নর্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত হ'ল সরকারী উদ্যোগে, এবং বাস্তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথাই সত্য বলে প্রমাণিত হল। তিন বছর যেতে না যেতেই পরবর্তী ছোটলাট জর্জ ক্যাম্পবেল বেথুন বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট স্ত্রী নর্মাল বিদ্যালয়টি তুলে দেবার আদেশ দিয়ে ডি·পি·আই·কে লিখলেন, "সাধারণভাবে বিচার করে দেখলে বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়, তিন বছর ধরে পরীক্ষা করবার পরেও 'ফিমেল নর্মাল স্কুল' সফল হয়নি।" ১৮৬৯-এ প্রতিষ্ঠিত স্ত্রী নর্মাল বিদ্যালয় অবশেষে তিন বছরের মধ্যে ১৮৭২ সালে বন্ধ করে দেওয়া হ'ল।

স্ত্রী নর্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথে সামাজিক কুসংস্কারের অন্তরায় যে কত প্রবল ছিল তা জানতে সে সময়ে সোমপ্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রলেখকের একটি পত্র তুলে দেওয়া হল 'মিস মেরী কার্পেন্টার এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগেব অবস্থার উৎকর্ষ সাধনার্থ বৃদ্ধ বয়সে এদেশে আগমন করিয়াছেন: তাঁহার চেষ্টা অতি প্রশংসনীয় এবং আমরা স্বদেশীয়দিগের প্রতিনিধি স্বরূপ তাঁহাকে অকৃত্রিম ধন্যবাদ দিতেছি। মিস কার্পেন্টারের সম্মানার্থে সম্প্রতি কয়েকটি সভা হয়। ····সেদিন কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজ বাটীতে মিস কার্পেন্টার আগমন করেন। তৎকালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি কয়েকজন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তথায় এই প্রস্তাব হয়, এতদ্দেশীয় স্ত্রী-শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য নর্মাল বিদ্যালয় করা আবশ্যক, এবং তদর্থ গভর্নমেন্টের নিকটে আবেদন করা উচিত। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থে এক কমিটি নিযুক্ত করা হয়, বিদ্যাসাগর তন্মধ্যে একজন ছিলেন। তথায় এই প্রস্তাব হয়, আমরা যখন প্রথমত এই প্রস্তাব শ্রবণ করি তখন আশ্চর্যবোধ করিয়াছিলাম। কাহার দ্বারা এই প্রস্তাব হইয়াছে? দেশের কি ইহা অনুমোদনীয়? বর্তমান অবস্থায় কি ইহা সঙ্গত? এতদানুসারে কি কাজ হইতে পারে? আমরা আপনা আপনি এই প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু ইহার তুষ্টিকর উত্তর প্রাপ্ত হইলাম না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্ত্রী শিক্ষার একজন প্রধান উদ্যোগী, বঙ্গদেশে তাঁহার ন্যায় কেহই এবিষয়ে অধিক কাজ করিতে পারেন না। তিনি হঠাৎ

এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন, শুনিয়া আমরা আরও আশ্চর্যবোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু গত সোমবারের হিন্দু পেট্রিয়টে বিদ্যাসাগরের এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে, তিনি প্রস্তাবিত প্রস্তাবে লিপ্ত থাকিতে সম্মত নহেন। এটি বুদ্ধির কাজ হইয়াছে, তাহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে।....এক্ষণে দেখা উচিত এদেশের যে অবস্থা....তাহাতে স্ত্রী-শিক্ষকের কার্যারম্ভের কাল আসিয়াছে কিনা ?....নর্মাল বিদ্যালয়ে কাহারা শিক্ষা করিবেন ? এদেশীয় বিধবাগণ ? আমরা বলিতেছি শিক্ষকের সংখ্যা অতি অল্প হইবে। উচ্চ জাতির প্রায় কোন বিধবা আসিবেন না। ঢাকায় একটি নর্মাল বিদ্যালয় হইয়াছে, কিন্তু তথায় প্রায় বৈষ্ণবীব সংখ্যা অধিক। আমরা ইহাদিগের অবমাননা করিতেছি না, কিন্তু বলিতেছি, বৈষ্ণবীদিগের উপরে সর্বসাধারণের ভক্তি অতি অল্প। এ অভক্তির বিশেষ কারণ আছে, এবং লোকে এশ্রেণীর শিক্ষকের নিকটে যদি কন্যাগণকে না পাঠান তাহা হইলে আশ্চর্যের বিষয কিছুই নাই।" ....ঐ সোমপ্রকাশ পত্রিকার ৫ই ফাল্গুন ১২৭৫, ১৪শ সংখ্যায় স্ত্রী নর্মাল বিদ্যালয় সম্পর্কে সম্পাদকীযতে লেখা হয়েছে, ...এ স্থলে আমরা অতিশয় সতর্ক হইয়া কাজ করিবার অনুরোধ করিতেছি। মিস কার্পেন্টার শিক্ষয়িত্রীদিগকে বিদ্যালয়ের মধ্যে রাখিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আপাতত ত্যাগ করা কর্তব্য।" যে সকল স্ত্রীলোক নর্মাল বিদ্যালয়ে আসিবেন, তাহাদিগকে আবৃত শকটে আনয়ন করা কর্তব্য। বিদ্যালয়ে যে সে পুরুষ দর্শক যাইতে পারিবেন না। যে সমস্ত স্ত্রীলোক নর্মাল বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থে আসিবেন, তাহাদিগের লোভ ও উৎসাহ জন্মে এরূপ অর্থদানের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত পত্র এবং সেই পত্রের উত্তবে সোম প্রকাশের সম্পাদকীয় — এগুলো থেকেই সেদিনের সমাজ মানসিকতার সুস্পষ্ট প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। তাছাড়া পত্রলেখকের পত্রের প্রতিবাদে সোমপ্রকাশে যে সম্পাদকীয় লেখা হয় সেটা পাঠ করেও জানা যায় যে কত দ্বিধা ও সংশয নিয়ে এবং সামাজিক কুসংস্কার সম্বন্ধে কত সচেতন হয়ে 'সোমপ্রকাশ' স্ত্রী নর্মাল বিদ্যালয়ের পক্ষে সমর্থনসূচক মতামত দিয়েছেন। দেশীয় লোকের কুসংস্কার সম্বন্ধে ইনসপেক্টর উড্রোসাহেব এত ভীত ছিলেন যে, 'বামাবোধিনী পত্রিকার' সম্পাদকীয়তে এ সম্পর্কে লেখা হয বেথুন" সাহেবের বালিকা বিদ্যালয়ের বাটির এক পার্শ্বে ঐ বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিবার জন্য আবশ্যক বিষয়গুলিও প্রস্তুত হইযাছে, এবং শুনাও যাইতেছে, ঐ ভাবী স্ত্রী বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়িকার জন্য প্রতিমাসে টাকাও গৃহীত হইতেছে। এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, তবে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে না কেন ? উত্তরটি কৌতুককর — স্ত্রীলোক শকট চালক (গাড়োয়ান) এবং স্ত্রীলোক সহিস - যতদিন পাওয়া না যাইবে ততদিন বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হইবে না এইটি সাহেবের উত্তর। এখন দেখা যাউক কি হয়।

এদেশে স্ত্রীলোকেরা 'ত এখনও এতদূর বিদ্যাবতী হয় নাই, এবং এত স্বাধীনতাও পায় নাই যে, শকট চালনা কার্য করিতে সক্ষম হইবে। সাহেব এবার বিলাত গিয়াছেন, এই সুযোগে যদি তিনি স্বদেশ হইতে দুই-তিনটি স্ত্রী-গাড়োয়ান এবং সহিস আনেন তাহা হইলে স্ত্রী বিদ্যালয়ের সংস্থাপন আশা হইতে পারে। বিলাতীয় স্ত্রীলোক ভিন্ন এ

মহৎ কার্যে ব্রতী হওয়া কাহারও সাধ্য নহে। আমরা সাহেবকে বিশেষরূপে অনুরোধ করি তিনি যেন এদেশে প্রত্যাবর্তন সময়ে ২/৩টি বিবি সহিস ও বিবি গাড়োয়ান লইয়া আসেন।" এই পরিহাসের মধ্যে দিয়ে কিন্তু সমস্যাটির গুরুত্বই প্রকাশ পেয়েছে, অর্থাৎ 'দেশাচারের' সমস্যা- যা, সবরকম সংস্কার কার্যের সামনে পর্বতের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে অবরোধের সৃষ্টি করেছিল। উঁচু সমাজের সম্ভ্রমবোধ সেদিন আষ্টে-পৃষ্ঠে পর্দাপ্রথার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। সমাজের উপরের স্তরে যত ওঠা যায়, ততই সেই অবরোধ প্রথা কঠোর থেকে কঠোরতর হয়, কিন্তু সমাজের নিচের দিকে সেই অবরোধের কঠোর বন্ধন আর থাকে না, কারণ সেখানে জীবিকা ও শ্রমের প্রশ্নটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন - আজও মানুষের জীবনে সবচেয়ে যা বড় সত্য। বিদ্যাসাগর তাঁর সংস্কার কার্যে দুদিক থেকে বাধা পেয়েছিলেন। কেউ তাঁর সংস্কার কার্যে অনিচ্ছুক হয়ে বাধা দিয়েছেন, কেউ বা সংস্কার বিষয়ে ইচ্ছুক থেকেও শুধুমাত্র সংশয়কে অতিক্রম করতে পারেননি বলে বাধা দেন।

সেদিনের বিদেশী প্রশাসক নিজেদের অধীনস্ত উপনিবেশের প্রজাবৃন্দের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়ুক, কিংবা সামাজিক সংস্কার সাধিত হোক তা চাননি। কারণ সেটা তাঁদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পরিপন্থী হতে পারে - এই আশঙ্কায় সেদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাঁরা সাহায্য করতে চাননি --- এ ব্যাপারে। আবার সেদিন সমাজের উপরতলার অনেক মানুষও তাঁকে সমর্থন না করে বাধা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা সংস্কার চেয়েছিলেন, তবে সংশয়কে অতিক্রম করতে পারেননি। এইসব সংশয়াচ্ছন্ন মানুষের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর। সংশয়াচ্ছন্ন ছিলেন বলেই সংস্কারমূলক বিভিন্ন কাজে তাঁর মধ্যে স্ববিরোধিতা দেখা যেত। একদিকে তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "তাঁহার চেষ্টা ও যত্নে এদেশে প্রথম স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন হয়।" অথচ আধুনিক পন্থায় মেয়েদের শিক্ষাদানের বিরোধিতা করেছেন তিনি। এরকম সংশয়াচ্ছন্ন স্ববিরোধী মনোভাবাপন্ন মানুষের কাছ থেকেই বিশেষভাবে বিদ্যাসাগর তাঁর সংস্কার কর্মে বাধা পেয়েছিলেন। স্ত্রী শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শ্রী বিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ গ্রন্থে বলেছেন, বিদ্যাসাগরের শিক্ষা চিন্তার মধ্যে কিছু কিছু স্ববিরোধিতা এবং শ্রেণীবদ্ধতা ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ মিস কার্পেন্টার প্রস্তাবিত স্ত্রী নর্মাল বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ তুলে ঘোষ মহাশয় বলেছেন — "বিদ্যাসাগরের স্ত্রী নর্মাল বিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধিতার যুক্তি সমর্থন করা যায় না। কারণ হিন্দু সমাজের কুসংস্কারের যুক্তি সমর্থন করলে, বিধবা বিবাহ আন্দোলনের পক্ষেও তাঁর কোন যুক্তিগ্রাহ্য বিবেচিত হবে না। এ প্রসঙ্গে বলতে গেলে সেই ঔচিত্য বোধের কথাই এসে পড়ে, যে ঔচিত্য বোধ প্রকৃত সংস্কারক মাত্রেরই থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সেই ঔচিত্যবোধের কারণেই যে কাজে সাফল্যের কোন সম্ভাবনা নেই বলে তিনি বুঝেছেন, সেই কাজে অকারণ পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করতে চাননি। বিধবা বিবাহের ক্ষেত্রে দেশের মানুষের মন তেমনভাবে জাগেনি বলে বুঝেছিলেন বলেই তিনি শুধু শাস্ত্রীয় বাদ-বিতণ্ডার

মধ্যে আন্দোলনকে সীমিত না রেখে প্রত্যক্ষ সামাজিক ক্রিয়াশীল স্তরে সেই আন্দোলনকে নিয়ে আসার জন্য বিধবা বিবাহকে আইন সম্মত করার চেষ্টা করেছিলেন এবং তাতে সফলও হয়েছিলেন। (তবে আইন প্রণয়ন করেও দেশাচারকে যে তৎক্ষণাৎ অবলুপ্ত করা যাবে না এটাও তিনি পরে বুঝেছিলেন) কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও অবশ্য স্বীকার্য যে সেই সময় যদি স্ত্রী শিক্ষাকে আইনের সাহায্যে বাধ্যতামূলক করার মতো অনুকূল রাজকীয় ব্যবস্থা থাকতো তাহলে অবশ্যই বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই আইন প্রণয়ন করার জন্য সরকারকে সম্মত করানোর প্রচেষ্টা চালাতেন। এদেশে শিক্ষা যে সময় ছিল একটা ঐচ্ছিক বিষয়, সেখানে দেশাচারের প্রতিকূলতা যত প্রবল আকারে দেখা দিতে পারে তত আর কিছুতে নয়। কারো কন্যা সন্তান যদি নিরক্ষর হয় তাহলে তার অভিভাবকের মনে (দেশের অধিকাংশ অভিভাবকই যেখানে নিজেরাই অশিক্ষিত — অর্ধশিক্ষিত) যে দুঃখবোধ আর একাদশীর দিন নির্জলা উপবাস ক্লিষ্ট শুকনোমুখে বসে থাকা বিধবা বালিকা কন্যার অভিভাবকের যে মর্মবেদনা — এ দুটো নিশ্চয়ই সমপর্যায়ে পড়ে না। দেশাচারকে সেদিন অতিক্রম করা হয়তো যায়নি, কিন্তু মনে মনে নিশ্চয়ই অধিকাংশ মানুষই চেয়েছিলেন বালিকা বিধবার দুঃখের অবসান হোক। তা না হলে আজকের আধুনিক সমাজ সেই দেশাচারকে প্রায় অবলুপ্ত করে দিত না। বিধবা বিবাহ এখন আর কোন সমস্যাই নয়, হয়তো সম্বন্ধ করা বিবাহের ক্ষেত্রে এখনও কিছু ইতস্ততভাব রয়েছে, তবে একাদশী-উপবাস-একাহার-জলস্পর্শ না করা-ইত্যাদি দেশাচারগুলি প্রায় অবলুপ্তই হয়ে গেছে বলা চলে। সমাজ মানসিকতার পরিবর্তন বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন, এবং সেজন্য প্রচেষ্টাও করেছিলেন। তাই নর্মাল স্কুল স্থাপনের বিরোধিতা করলেও, স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার প্রচেষ্টায় তাঁর শিথিলতা আসেনি কখনোই। শিক্ষা বিস্তার, শিক্ষা সংস্কার ও সমাজ সংস্কার প্রায় একই সঙ্গে তিনি শুরু করেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন শিক্ষা সংস্কার তখনই সার্থকতা লাভ করে যখন তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমাজও অগ্রসর হয়।

অনেকে বলেন বিদ্যাসাগর মহাশয় সে যুগের সাংস্কৃতিক কক্ষপথের মধ্যে থেকে তাঁর সংস্কার প্রয়াস চালিয়েছিলেন, সুতরাং তাঁর চিন্তায় ও কর্মে সীমাবদ্ধতা থাকতেই পারে। অভিযোগটা হয়তো মিথ্যা নয়, তবে তার কারণও ছিল। সেই সময়ে বাংলাদেশের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মহলের হাতেই ছিল সমাজ রথের রাশ, এবং সেই সব পরিবারের সন্তানরাই অধিক সংখ্যায় আধুনিক শিক্ষাগ্রহণ করে ধর্মান্তরিত হয়ে যাচ্ছিল, ফলে অন্তঃপুরের মধ্যে বিজাতীয় আধুনিক শিক্ষার অনুপ্রবেশ ঘটুক-এটা তাঁরা কিছুতেই চাইছিলেন না। অথচ এই উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সচেতন করতে না পারলে প্রগতির পথে সমাজের রথও চলতে পারবে না।

সেজন্যই শাস্ত্রীয় যুক্তি বিচার বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সংস্কারের পথে অগ্রসর হতে হয়েছে। যুগমানসিকতাকে অস্বীকার করলে সংস্কার কাজ ব্যাহত হতে পারে, অভীষ্ট লক্ষ্যে হয়তো পৌঁছানো যাবে না, তাঁর প্রয়াস সফল

হবে না — এই আশঙ্কা করেই হয়তো একটা শাস্ত্রীয় সাংস্কৃতিক কক্ষপথে থেকে তাঁকে সংস্কার আন্দোলন পরিচালিত করতে হয়েছে।

বিদ্যাসাগর ছিলেন কর্মবীর। মনের মতো কাজ পেলে সমস্ত মন প্রাণ তিনি সেই কাজে সমর্পণ করে দিতেন এবং তার জন্য অক্লান্ত দৈহিক পরিশ্রম করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। (বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা (আদর্শ বিদ্যালয়) বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বিধবা বিবাহ, বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক সংস্কারমূলক আন্দোলন, সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠনের সংগ্রাম প্রভৃতিতে তিনি যে অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন তা অতুলনীয়)। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের সামগ্রিক কর্মধারার পূর্ণাঙ্গ চিত্রটির দিকে যদি ভাল করে তাকানো যায় তাহলে দেখা যাবে যে, তিনি তাঁর জীবনের কোন কাজই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া কিংবা সে সম্পর্কে কোন ভাবনা চিন্তা না করে কখনোই করেননি। ঝোঁকের মাথায় কাজ করা ছিল তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। সুতরাং পরিকল্পনাগত ত্রুটির জন্য তাঁর স্ত্রী — শিক্ষা বিস্তারের কাজে অসম্পূর্ণতা ছিল বলে মনে হয় না। প্রতিটি সংস্কারমূলক কাজে অবতীর্ণ হওয়ার আগে তিনি কত চিন্তা ভাবনা পরিকল্পনা করে অগ্রসর হতেন তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে তাঁর বিভিন্ন লেখায়, বিভিন্ন সরকারী চিঠিপত্রে ও দলিলে। প্রথমে ধরা যাক তাঁর বিধবা বিবাহ প্রবর্তন প্রচেষ্টার বিষয়টি। এই সামাজিক সংস্কার কার্যটি বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি যে কত নিপুণভাবে সুপরিকল্পিত পথে অগ্রসর হয়েছিলেন তা সহজেই বোঝা যায় এ বিষয়ে তাঁর কর্মপ্রণালী অনুসরণ করলেই। বিধবা বিবাহ প্রবর্তন বিষয়ে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার অনেক আগে থেকেই রামমোহনের "আত্মীয় সভা'য় বৈঠকে, ডিরোজিওর 'আকাদেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সভায় বাল্য বৈধব্য, বহু বিবাহ-সতীদাহ ইত্যাদি সামাজিক সমস্যা নিয়ে নিয়মিত আলোচনা হতো। ১৮৩০-এর গোড়ার দিকে ইয়ং বেঙ্গল দলও এই জাতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজকে তীব্রভাবে আক্রমণ করতে থাকে। ফলে ভারতীয় 'ল কমিশন' বাল বিধবাদের পুনর্বিবাহের বিষয়টিকে বিশেষভাবে বিচার বিবেচনা করে আইন প্রণয়নে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হন। ল' কমিশনের সেক্রেটারি জে পি গ্রান্ট ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সদর আদালতের বিচারকদের এই বিষয়ে মতামত জানতে চেয়ে চিঠি লেখেন। কলকাতার, এলাহাবাদের এবং ফোর্ট সেন্ট জর্জের সদর আদালতের রেজিস্ট্রারগণ বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে স্বীকার করেও দেশাচারকে লঙ্ঘন করে আইন প্রণয়নের পক্ষপাতী নন বলে অভিমত দেন। যুগ যুগ ধরে দৃঢ়মূল হয়ে থাকা লোকাচারকে আইনের দ্বারা বিলুপ্ত করা বিচক্ষণের কাজ নয় বলে তাঁরা মনে করেছেন। ইংরাজ আইনজ্ঞদের মতামত এটাই প্রমাণ করে যে, এদেশের সামাজিক কুপ্রথাকে জোর করে দূর করার পক্ষপাতী তাঁরা ছিলেন না। কারণ তাঁরা তো ব্রিটিশ শাসকদেরই লোক। ১৭৭৬ শকাব্দের ফাল্গুন মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় "বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা" এই নামে ঈশ্বরচন্দ্র একটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে এই নামে তাঁর প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, এবং এই বছর অক্টোবর মাসে তিনি বিধবা

বিবাহ আইন পাসের জন্য ভারত সরকারের কাছে আবেদনপত্র পাঠান। কিন্তু শম্ভুচন্দ্রের বিদ্যাসাগর জীবন চরিত থেকে জানা যায় বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের প্রায় দশ বছর আগেই সমাজে বিচ্ছিন্নভাবে বিধবা বিবাহের প্রত্যক্ষ চেষ্টা পর্যন্ত করা হয়েছে, যদিও তা বাস্তবায়িত হয়নি। শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন "তাঁর বিধবা বিবাহ আন্দোলনের প্রায় দশ বছর আগে কলকাতার বহুবাজার অঞ্চলের নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন বিষয়ী লোক দলবদ্ধ হয়ে একটি বিধবা বিবাহ দেওয়াব জন্য উদ্যোগী হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পটলডাঙা নিবাসী শ্যামচরণ দাস কর্মকার তাঁর বাল বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দেওয়ার জন্য পণ্ডিতদের কাছ থেকে একটি ব্যবস্থা পত্র সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন। এই ব্যবস্থা পত্রে কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, রামতনু তর্ক সিদ্ধান্ত, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, ঠাকুরদাস চূড়ামণি প্রমুখ তখনকার বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিতেরা স্বাক্ষর করেছিলেন। পরে এই পণ্ডিতরাই বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করেছিলেন।" অর্থাৎ বাদানুবাদের স্তর থেকে আন্দোলন ক্রমে প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টার স্তরে পৌঁছনোর উপক্রম হয়েছিল। এই বিচ্ছিন্ন-বিশৃঙ্খল আন্দোলনের ধারাকে পরিকল্পিত সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করার জন্য একজন সুপরিচালকের প্রয়োজন ছিল। ঐতিহাসিক পরিবেশে সমাজের সমষ্টি চেতনাকে এইভাবে যাঁরা যুগনির্দেশিত পথে পরিচালিত করেন, তাঁদেরই বলা হয় যুগ প্রবর্তক সমাজ সংস্কারক। সুতরাং বিদ্যাসাগরকে আমরা অবশ্যই সমাজ সংস্কারক, বিধবা বিবাহের প্রবর্তক বলতে পারি। আর এই যুগ প্রবর্তক বিদ্যাসাগর তাঁর প্রতিটি সংস্কার মূলক কাজই সুপরিকল্পিতভাবেই করেছেন। বিধবা বিবাহকে সমাজ স্বীকৃত করার জন্য তিনি শুধু যুক্তি ও বুদ্ধির ওপর নির্ভর করেননি। কারণ তিনি জানতেন শুধু যুক্তি বুদ্ধির উপর নির্ভর করে বিধবা বিবাহ সঙ্গত কি অসঙ্গত তা প্রমাণ করার চেষ্টা করলে সাধারণ জনমানসে তার কোন প্রভাব বিস্তার করবে না। তাই এদেশের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র মন্থন করে উপযুক্ত শাস্ত্রবচনের সন্ধান করেছিলেন তিনি। তাঁর বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা পুস্তিকাব প্রথমেই তিনি লেখেন : "..... যদি যুক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া ইহাকে কর্তব্য কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে এতদ্দেশীয় লোকেরা কখনোই ইহাকে কর্তব্য কর্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্তব্য কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই এতদ্দেশীয় লোকেরা কর্তব্য কর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন। এরূপ বিষয়ে এদেশে শাস্ত্রই সর্বপ্রধান প্রমাণ এবং শাস্ত্রসম্মত কর্মই কর্তব্য কর্ম। অতএব বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম এই বিষয়ের মীমাংসা করাই আগে আবশ্যক।" অর্থাৎ বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত সমাজ সংস্কারের প্রথম ধাপেই তিনি সমাজ মানসিকতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হয়েই কাজের পরিকল্পনা করেছিলেন। আবার শাস্ত্র বচনের এইসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সাধারণ মানুষের মধ্যে ততখানি সাড়া তুলবে না যতখানি তুলবে পণ্ডিতদের মধ্যে — এটা বিদ্যাসাগর জানতেন। তাই সেকথা তিনি বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তিকায় লিখেছিলেন, "প্রথমত অনেকেই আমার লিখিত প্রস্তাব

পাঠ করিয়া, প্রস্তাবিত বিষয় শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। পরে কয়েকটি আপত্তি দর্শন করিয়াই, ঐ বিষয়কে একবারেই নিতান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়াও স্থির করিয়াছেন।"

সমাজ মানসিকতা লক্ষ্য করে তিনি এও লিখেছেন, "এ দেশে উপহাস ও কটূক্তি যে ধর্মশাস্ত্র বিচারের এক প্রধান অঙ্গ ইহার পূর্বে আমি অবগত ছিলাম না।" শুধু শাস্ত্রবচন নয়, যুক্তিনির্ভর মানবিক আবেদন করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি তাঁর সমাজ সংস্কারের কাজে। দ্বিতীয় পুস্তিকার শেষে তাই দেশবাসীর কাছে বিধবা বিবাহের জন্য কাতর মানবিক আবেদনই রেখেছিলেন, "হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ। আব কতকাল তোমরা মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকিবে? ... তোমাদের পূণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার দোষে ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে। ... যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই,সদাসৎ বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সেদেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে। হা অবলাগণ। তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।" আবার শাস্ত্রীয় বাদানুবাদের মধ্যে সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনকে গণ্ডিবদ্ধ করে রাখলে যে শেষপর্যন্ত তার কোন মূল্য থাকে না তা বিদ্যাসাগর জানতেন, তাই শাস্ত্রীয় আলোচনার স্তর থেকে বিষয়টিকে প্রত্যক্ষ সামাজিক ক্রিয়াশীল স্তরে নিয়ে এসেছিলেন। সেজন্য প্রয়োজন ছিল বিধবা বিবাহকে বিধিসম্মত করা, কারণ শাস্ত্রসম্মত বলে প্রমাণিত হলেও সমাজ ও রাষ্ট্রীয় আইনের সমর্থন না পেলে তা কোনদিনই কার্যকরী যে হবে না তা তিনি বুঝেছিলেন। সুতরাং বিধবা বিবাহকে রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় আনার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই একদিকে যখন শাস্ত্রীয় যুক্তি-বিচার-বুদ্ধি এবং মানবিক আবেদন সহ বিধবা বিবাহের জন্য প্রচার-আন্দোলন ইত্যাদি চালাচ্ছিলেন, অন্যদিকে তখন বিধবা বিবাহ আইন পাসের জন্য একটি আবেদনপত্র রচনা করে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানও শুরু করেছিলেন। আজ থেকে শতাধিক বছর আগে বিদ্যাসাগর আজকের আধুনিক গণতান্ত্রিক সংগ্রামের এক সুপ্রচলিত কৌশলকে অবলম্বন করেই তাঁর বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে জোরদার করে তুলেছিলেন। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের প্রায় এক হাজার মানুষের স্বাক্ষর সহ সেই আবেদনপত্র ভারত সরকারের কাছে প্রেরণ করেন। তারপর বিধবা বিবাহ আইন পাস হবার পর তা কার্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য তিনি উদ্যোগ নিলেন। কারণ তিনি জানতেন প্রয়োগ না করলে আইনের সার্থকতা থাকে না। তাই ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাস হবার পর ঐ বছরেই ডিসেম্বর মাসের সাত তারিখে প্রথম বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা করেন, এবং বিধিসম্মত প্রথম বিধবা বিবাহের পাত্র ছিলেন শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং পাত্রী ছিলেন ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের বিধবা কন্যা কালীমতী দেবী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত সমস্ত কাজের আগাগোড়াই তিনি সম্পন্ন করেছিলেন অত্যন্ত সুচারুরূপে, কোথাও ঝোঁকের মাথায় অবিবেচকের

মতো কোন কাজই তিনি করেননি। আন্দোলনের সূত্রপাত থেকে দেশবাসীকে বিষয়টি সম্পর্কে সম্যকরূপে অবহিত করা থেকে শুরু করে একে একে পণ্ডিতবর্গের সঙ্গে শাস্ত্রীয় যুক্তি বিচার অবলম্বনে বিতর্ক, মানবিক আবেদনের সাহায্যে জনমানসিকতা পরিবর্তনের চেষ্টা, জনমত গঠন, আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা এবং আইন প্রণয়নে সরকারকে সম্মত করানোর জন্য গণস্বাক্ষর সংগ্রহ-অভিযান, আইনকে বাস্তবকার্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ - সব কিছু ধাপে ধাপে করেছেন তিনি, কোথাও পরিকল্পনাগত কোন ত্রুটিই নজরে পড়ে না।

শিক্ষা সংস্কার কার্যের মধ্যে ও তাঁর এই সুপরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ২৬টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত তিনি 'Notes on the Sanskrit College' নামে শিক্ষা সংক্রান্ত যে খসড়াটি রচনা করেন, তার মধ্যে বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শের সমগ্র রূপটি অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর শিক্ষাদর্শের মূল বক্তব্য ছিল বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার সত্যকার আদর্শ সমন্বয় বলতে যা বোঝায়, বিদ্যাসাগর তাই চেয়েছিলেন। এই আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে তিনি চেয়েছিলেন। বাংলা শিক্ষার বিস্তার সম্পর্কে বিদ্যাসাগর তাঁর যে সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছোটলাট হ্যালিডের কাছে পেশ করেছিলেন, তাকে আদর্শ করেই হ্যালিডে বাংলাদেশে মডেল স্কুল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং বিদ্যাসাগরের ওপরই তার ভার দেওয়া হয়। বিদ্যাসাগর এই কাজের জন্য গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে মডেল বিদ্যালয় — এর স্থান নির্বাচন করেন এবং হ্যালিডের কাছে পাঠানো রিপোর্টে অবিলম্বে বিদ্যালয়গুলি খোলার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। বাংলা শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজ শুরু করার তিন বছর পরে তিনি তাঁর রিপোর্টে লেখেন, "It was now about 3 years since our operations commenced and the Model Vernacular schools have been established. During this short peroid, the progress of the Institutions has really been very satisfactory. The pupils have gone through all the vernacular books suited to such Institutions and may be said to have acquired a thorough knowledge of the language and to have made respectable progress in several branches of useful studies."

স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও তিনি সুপরিকল্পিত পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে সমাজ সংস্কারের সঙ্গে শিক্ষার উন্নতি ও অগ্রগতি অবিচ্ছেদ্য রূপে জড়িত। সেজন্য তাঁর সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা সংস্কাবের কাজ প্রায় পাশাপাশিই চলেছিল।

সমাজ দেহের দুই স্তম্ভ নাবী ও পুরুষ। এই দুটি স্তম্ভের একটিকে অবহেলিত উপেক্ষিত করে রাখলে পুরো সমাজ দেহটাই পঙ্গু হয়ে যাবে - এ বোধ সেদিনের জনমানসে ছিল না। সেই বোধোদয়ের চেষ্টা করেছিলেন রামমোহন - ইয়ংবেঙ্গল দল ও বিদ্যাসাগর। নারী মুক্তির পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর নারীকে তার আপন অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন সমাজের সার্বিক উন্নতির কথা চিন্তা করেই। সুতরাং

নারীকে সেদিনের সার্বিক অবনমনের অতলান্ত অন্ধকার থেকে উন্নয়নের জন্য তিনি নারী সমাজে শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করেছিলেন। ১৮৫০ সালের আগস্ট মাসে সর্বশুভকরী পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'বাল্য বিবাহের দোষ' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ঐ বছরেরই ডিসেম্বর মাসে বেথুন বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হন। সম্পাদক হয়েই সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের আনা-নেওয়ার জন্য যে গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেই গাড়ির গায়ে 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ' — এই শাস্ত্র বচনটি খোদাই করে দেন। উদ্দেশ্য- শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতির সাহায্যে সাধারণ জনমানসে স্ত্রী শিক্ষার প্রতি অনুকূল মনোভাব সৃষ্টির প্রচেষ্টা। তারপর ১৮৫৬ সালে বিদ্যালয়ের নতুন ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৬২ সালে এই বিদ্যালয় সম্পর্কে বাংলা সরকারকে তিনি যে রিপোর্ট পাঠান, সেই রিপোর্ট থেকে জানা যায় কত নিপুণভাবে তিনি বিদ্যালযটিকে পরিচালনা করেছিলেন। তাঁরই পরিকল্পনার গুণে বিদ্যালয়টির ছাত্রী সংখ্যা দিন দিন বেড়েছে, বিদ্যালয়টির শ্রীবৃদ্ধিও ঘটেছে। তারপর সরকারী আনুকূল্য পাওয়ার প্রথম সুযোগেই ১৮৫৭ সালের মে মাস থেকে ১৮৫৮ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত এই সাতমাসে ঝড়ের গতিতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে গেছেন। বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করে প্রথমেই তিনি বেছে নেন গ্রামবাংলাকে। শহুরে ডামাডোলের বাইরে নিভৃত গ্রামবাংলার কুমারী মৃত্তিকায় তিনি "স্ত্রী শিক্ষা" বিস্তারের বীজ বপন করেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন-নানা মুনির কর্মক্ষেত্র শহরে সংস্কারমূলক যে কাজই করার চেষ্টা হোক না কেন, তা সহজে মসৃণভাবে হওয়া সম্ভব নয়। উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত পণ্ডিতজনের বাস শহরে। লর্ড কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে শহর কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে 'বাবু কালচার' তৈরি হয়েছিল তা বাংলার মাটির নিজস্ব সংস্কৃতি নয়। অর্থ কৌলিন্যের জোরে এই শহরে 'বাবু' সম্প্রদায় শহুরে কলকাতার আবহাওয়া দূষিত করে তুলেছিল। সমাজের উপরতলার আসন অধিকার করে বসে সমাজের মাথার উপর ছড়ি ঘুরিয়ে নিজেদের মতামত প্রতিষ্ঠা করতো। নিজেরা বিলাস-ব্যসন আর উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে যত গা ভাসিয়েছিল-অন্তঃপুরের অবরোধ প্রথাও তত কঠোর করে তুলেছিল। নারী সমাজের উন্নতি বিধানের জন্য- নারী মুক্তির জন্য যখনই কোন চেষ্টা হয়েছে বিশেষ করে এরাই প্রধান বিরোধীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাছাড়া বিদ্বজ্জনেরা কখনোই বিনা বাক্য ব্যয়ে অন্যের মতামত মেনে নিতে পারেন না। সুতরাং এই পরিবেশে যিনি যখনই কোন সংস্কারমূলক আন্দোলনের চেষ্টা করেছেন-সে আন্দোলন হয় প্রতিহত করার চেষ্টা হয়েছে নয়তো পণ্ডিতজনেরা সে সম্পর্কে নিজেদের মতামত জাহির করে আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য পণ্ড করেছেন। আর বিদ্যাসাগরের মতো স্বাধীনচেতা অজেয় পৌরুষের অধিকারী ব্যক্তিত্বের পক্ষে অন্যের পছন্দমত বা অন্যের মতামত শুনে কাজ করাও সম্ভব ছিল না। সেজন্যই হয়তো স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর মূল প্রেরণা ছিল গ্রামবাংলার কুমারী মৃত্তিকা। বাংলাদেশের অবহেলিত পল্লী অঞ্চলে যেখানে শহরের পণ্ডিতজন ও 'বাবু'দের

পদার্পণ সচরাচর ঘটে না, সেই পল্লীগ্রামেই তিনি স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার কল্পে আপন এলাকায় বালিকা বিদ্যালয়গুলি স্থাপন করেছিলেন, এবং এই এখানেই তাঁর স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার পরিকল্পনার অনন্য কৃতিত্ব। তাঁর প্রচেষ্টার তাৎক্ষণিক সাফল্য হয়তো তিনি লাভ করেননি, তবে সেজন্য তাঁর পরিকল্পনা দায়ী ছিল না। দায়ী ছিল তদানীন্তন বিদেশী ঔপনিবেশিকতাবাদী শাসক সম্প্রদায় এবং তাঁর স্বদেশবাসীরা। বিদ্যাসাগরের ট্র্যাজেডি হলো তাঁর সমকালীন সমগ্র শিক্ষিত সমাজ বিদ্যাসাগরের মতো গ্রামবাংলাকে নিয়ে ভাবতে পারেননি। সেজন্যই তাঁর সংস্কার আন্দোলনের পথে তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ একাকী। যদিও একথা স্বীকার করতে হবে বিদ্যাসাগরের সমকালীন বহু মানুষ দেশী বিদেশী নির্বিশেষে অনেকেই তাঁর অনুরাগী ছিলেন শুধু নয়, তিনি তাঁর সমকালের কাছ থেকে যে শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন তার তুলনা খুব বেশি নেই। রাজা মহারাজা থেকে শুরু করে বিদ্বান পণ্ডিত, আধুনিক ইংরাজীয়ানায় অভ্যস্ত যুবগোষ্ঠী সকলেই তাঁর বিভিন্ন সংস্কারমূলক আন্দোলনের জন্য তাঁকে অভিনন্দিত করেছেন কিন্তু ঐ পর্যন্তই — সক্রিয় সাহায্য করতে তাঁরা বড় একটা কেউ এগিয়ে আসেননি। গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষ বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে বলে তাঁর জয়গান গেয়েছেন। একক শক্তিতে, একক নেতৃত্বে একক পরিচালনায় একটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন অচল জাতিকে আধুনিকতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে সজীব ও সচল করে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। বিদ্যাসাগরের সমগ্র কর্মজীবন ঠিকমত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তা একটা সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা অনুসারে অগ্রসর হয়েছে। প্রথমে নিজে কঠোর ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন, তারপর শিক্ষা গুরুরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়ে অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এই দেশে শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। তারপর এক-একটি সামাজিক কুপ্রথা বা কুসংস্কার বেছে নিয়ে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রথমে জনমত গঠন করেছেন, তারপর আন্দোলনে নেমেছেন এবং তা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। সে কাজের তিনিই সংগঠক-পরিচালক এবং সংগ্রামের অগ্রবর্তী যাত্রী। সংগ্রামের স্ট্র্যাটেজিতেও বিদ্যাসাগরের নীতি সুস্পষ্ট। সংগ্রামে যারা সঙ্গে আছে তারা বন্ধু, যারা নেই তারা বিরোধী পক্ষের, অতএব তাঁরা যাতে লড়াইয়ে বিঘ্ন ঘটাতে না পারে, সেজন্য কঠোর সমালোচনায় তাদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তারানাথ তর্ক বাচস্পতির নাম উল্লেখ করা যায়। বিধবা বিবাহ আন্দোলনে তারানাথ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু বহু বিবাহ নিরোধ আন্দোলনে তিনি বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে গেলেন। বিদ্যাসাগরও তখন তাঁর বিরুদ্ধে কলম ধরতে দ্বিধা করলেন না। সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে দ্রুতলয়ে একের পর এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করাটা হয়তো আপাত দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনার ত্রুটি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু স্বভাব অনুযায়ী বিদ্যাসাগর সব কাজ দ্রুতলয়েই সম্পন্ন করতে অভ্যস্ত ছিলেন। ঢিমেতালে রয়ে বসে কাজ করা ছিল তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ, কোন কাজ পরে করা হবে বলে ফেলে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। তাই কবে সরকারী সাহায্য আসবে সেই প্রত্যাশায় বসে না থেকে একের পর

এক বালিকা বিদ্যালয়গুলি তিনি স্থাপন করেছিলেন। এটাকে নিশ্চয়ই তাঁর পরিকল্পনার ত্রুটি বলা যায় না। সরকারী সাহায্য না পাওয়াতে বিদ্যাসাগব হতোদ্যম হয়ে পড়েননি। 'নারী শিক্ষা ভাণ্ডার' স্থাপন করে তাঁর অনুরাগী সমকালের মানুষজনের কাছে আবেদন করেন স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখার এবং তাতে কিছু পরিমাণে সফলও হয়েছিলেন। কারণ নারীর উন্নতি বিধান ছিল বিদ্যাসাগরের জীবনের প্রধান ধ্যান — সমস্ত সামাজিক সংস্কার প্রয়াসের কেন্দ্রবিন্দু।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন ফিমেল স্কুলের অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হন। তখন থেকেই বলতে গেলে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। সরকারী আমলাতন্ত্রের ঢিমেতালে কাজের সঙ্গে তাঁর স্বভাবগত মিল ছিল না। সুতরাং নিজের উদ্যোগেই তিনি স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের জন্য কালবিলম্ব না করে কাজে নেমে পড়েছিলেন। কাজেই এটাকে নিশ্চয়ই তাঁর কাজের প্রয়োগগত ত্রুটি বলা যায় না। তিনি বুঝেছিলেন স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার না হলে সমাজ প্রগতি সম্ভব নয়। নারী মুক্তির প্রথম কথাই হলো স্ত্রী শিক্ষা, কারণ শিক্ষাই আনে সচেতনতা। সুতরাং স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার সাধনের জন্য তাঁর প্রযাস সময়োপযোগীই হযেছিল সন্দেহ নেই। আবার স্ত্রী নর্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তাঁর মনোভাব এবং সিদ্ধান্তকেও সময়োচিতই বলতে হবে নিঃসন্দেহে। তার প্রমাণ রয়েছে তৎপরবত. বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়। স্ত্রী নর্মাল বিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধিতা করে তিনি যা বলেছিলেন, পরবর্তীকালের ঘটনায় তা বর্ণে বর্ণে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

১৮৮০ সালের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা লিখেছেন, "... কিন্তু আমরা বঙ্গীয় স্ত্রীলোকদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ধারিনী হওয়া বঙ্গদেশের বিশেষ মঙ্গলের ও উন্নতির চিহ্ন বিবেচনা করি না। ... বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে কোনক্রমেই উন্নতি কর ও শুভফলপ্রদ নহে। স্ত্রী ও পুরুষজাতির প্রকৃতির বিভিন্নতা নিমিত্ত দুইযের পক্ষে একপ্রকার শিক্ষার উপযোগিতা অসম্ভব। ... বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বুদ্ধি প্রধান শিক্ষা, হৃদয় প্রধান শিক্ষা নহে ; অতএব ঐ প্রকার শিক্ষা স্ত্রী জাতির পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা নহে।" ১৮৮১ সালে সোমপ্রকাশ লিখছে, "স্ত্রী শিক্ষার কয়েকটি প্রতিবন্ধক (১) বাল্যবিবাহ। ... অনেকে বলেন বঙ্গদেশের স্ত্রীগণের সুশিক্ষা হইতেছে। ... অন্য অন্য ইউরোপীয়েরাও সময়ে সময়ে এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া বঙ্গদেশের প্রশংসা করেন। কিন্তু আমাদিগের এটি ভৌতিক কাণ্ড বলিয়া বোধ হয়"। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে ১৮৬৭ সালে এ সম্পর্কে বিদ্যাসাগর যা বলেছিলেন তার প্রায় ১৪/১৫ বছর পরে ১৮৮০-১৮৮১ সালেও তত্ত্ববোধিনী নারী পুরুষের একই প্রকার শিক্ষার উপযোগিতাকে অস্বীকার করে দুঃখপ্রকাশ করছেন : 'সোমপ্রকাশে'র লেখা থেকে প্রকাশ পাচ্ছে স্ত্রী শিক্ষার অন্যতম প্রতিবন্ধক বাল্যবিবাহের কুসংস্কার তখনও সমাজে প্রবলভাবেই রয়েছে, এবং স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতি সম্বন্ধে আলোচনাকে জনরব ও ভৌতিক কাণ্ড বলে অভিহিত করেছেন। বিদ্যাসাগরের সমাজবোধ যে কত গভীর ছিল এগুলো তারই প্রমাণ। সমাজ সংস্কারের সঙ্গে যে শিক্ষার উন্নতি ও অগ্রগতি

অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত তা বুঝেছিলেন বলেই হয়তো তিনি শিক্ষা সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সংস্কারেরও চেষ্টা করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিকে পল্লীবাংলায় স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা যেমন করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের কর্ণধার রূপে শহর কলকাতার বাঙালী সমাজের ভদ্র শ্রেণীর বালিকাদের মধ্যে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের চেষ্টাও করেছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে বলতে গেলে তাঁরই প্রচেষ্টায় বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের ক্রমশ শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং কলকাতা শহরের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মহলে ঐ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রভাব বিশেষভাবে পড়তে থাকে।

১৮৭৬ সালের ২৫নভেম্বর দেরাদুন নেটিভ ক্রিশ্চিয়ান মহিলা আবাসিক বিদ্যালয়ের সুপারিনটেনডেন্ট রেভাঃ ডেভিড হেরন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবেদন করেন যেন, তাঁর একটি ছাত্রীকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়া হয়। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেওয়ার নিয়ম ছিল না। ইতিপূর্বে ১৮৭৫ সালের ২৬ জুন একটি মিটিং এ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযের মিটিং) বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম বিধি সম্বন্ধে বলা হয়েছিল যে, "that the question of the admission of females to the university examination in Calcutta was an abstract question; no female had applied, or was expected to apply for examination."

কিন্তু ঐ আবেদনপত্রের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় একটি বেসরকারী পরীক্ষার ব্যবস্থা করে দেরাদুন বিদ্যালয়ের ছাত্রী চন্দ্রমুখী বসুকে 'এন্ট্রান্সের' সমপর্যায়ে' উন্নীত বলে ঘোষণা করেন। ঐ সময় বেথুন স্কুল থেকে কাদম্বিনী বসুও এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

প্রগতিশীল ব্রাহ্ম নেতারা (মনমোহন ঘোষ, ব্রজকিশোর বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ) তৎকালীন বিচারপতি ফিয়ারের পত্নী শ্রীমতী ফিএয়ার এবং শিক্ষাব্রতী ইংরাজ মহিলা মিস অ্যাক্রয়েতের সহযোগিতায় 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' নামে মেয়েদের উচ্চমানের শিক্ষার জন্য একটি স্কুল খোলেন, এবং পরবর্তীকালে সেটি বেথুন স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। কাদম্বিনী ছিলেন ঐ 'বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রী।' বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বেথুন স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে বেথুন স্কুলের ছাত্রী বলেই বিবেচিত হলেন এবং বেথুন স্কুল থেকেই এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে পাস করেন। তখনই বেথুন স্কুলে কলেজের ক্লাশ শুরু করার কথা ভাবা হয় এবং বেথুন স্কুলে কলেজ বিভাগ খোলা হয় ১৮৭৯ সালে। এরপর চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী বসু (গঙ্গোপাধ্যায়) বেথুন কলেজ থেকে বি এ পরীক্ষা পাস করে শুধু ভারত বা এশিয়া মহাদেশ নয় সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম মহিলা স্নাতক হওয়ার সম্মান লাভ করেন। কারণ তখনও ইংলন্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মেয়েদের প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হয়নি!

(এরপর কাদম্বিনী গাঙ্গুলি (বসু) চিকিৎসা বিদ্যাতেও প্রথম মহিলা স্নাতক হন।

প্রাকটিক্যাল-এ কম নম্বর পাওয়ার জন্য তিনি এম বি উপাধি পাননি, তার পরিবর্তে তাঁকে জি বি এম সি ডিগ্রি দেওয়া হয় এবং চিকিৎসকের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তারপর তিনি বিদেশ থেকে এল আর সি পি এল আর সি এস এবং এল এফ পি সি ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। ভারতে তিনিই প্রথম বিদেশের উপাধিধারিনী মহিলা চিকিৎসক।)

এ সম্পর্কে ডি পি আইকে লেখা বাংলা সরকারের সেক্রেটারি একটি চিঠিতে বলেন,

I am directed to acknowledge the receipt of your letter No. 462 dated 29th January, 1879, bringing to notice the fact that Miss Kadambini Bose, Pupil of the Bethune School in Calcutta, has successfully passed the entrance examination of the Calcutta University in the 2nd division, failing to attain a place in the 1st Division by one mark only. This is the first occasion on which a young native lady has pased any university examination (A, Mackenzine, secretary to the Govt. of Bengal, in his letter no. 97, dated 3 February, 1879, to the D.P.I.

ইতিপূর্বে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের syndicate সিদ্ধান্ত নেন :

1) That the time has arrived when steps should be taken for the admission of women to the university examination in Arts.

2) That the syndicate be requested, in consultation with the Faculty of Arts, to frame such regulations for the admission of women to examination by the University..."

সরকারী ঔদাসীন্য, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের চেষ্টায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তাৎক্ষণিক সাফল্যলাভ হয়তো পুরোপুরি হয়নি, তবুও আংশিকভাবে যে তিনি এ বিষয়ে সাফল্যলাভ করে ছিলেন সে কথা বলা যায়। দক্ষিণবঙ্গের বিদ্যালয় সমূহের বিশেষ পরিদর্শকরূপে কাজ করার সময়ে তাঁর এলাকাভুক্ত অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে তিনি পল্লী বাংলার সুদূর প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের মনে স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে চেতনা জাগাতে যে সক্ষম হয়েছিলেন সে প্রমাণ আমরা পাই ১৮৫৭-৫৮ সালে ডি পি আইকে লেখা তাঁর রিপোর্টে এবং স্যার ব্রাটল্ ফ্রিয়ারকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে। রিপোর্টে তিনি লিখেছেন :

"... The total number of girls attending the schools amounts to 1348 ... I am happy to be able to state that I have not only made the people sympathize in the good cause, but that they have came forward with alacrity and sent their daughters to the new schools. If it were not for the untoward circumstance which I shall mention hereafter, I am confident that I would have been able to establish similar shcools in almost every village in the

Districts under me... Thus a change may be said to have come over the spirit of the times, and this may be reckoned as a new era in the history of education in Bengal."

সে সময়ে প্রকাশিত 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার জনৈক পত্রলেখক লিখেছেন "... ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্ত্রী শিক্ষার একজন প্রধান উদ্যোগী। বঙ্গদেশে তাঁহার ন্যায় কেহই এই বিষয়ে অধিক কাজ করিতে পারেন না। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও তাঁর 'আত্মচরিতে' এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয় বেথুনের পৃষ্ঠপোষক হইয়া দেশে স্ত্রী শিক্ষা প্রচলন কার্যে আপনার দেহমন প্রাণ সমর্পণ করেন।" ১৮৭১-৭২ সালের জেনারেল রিপোর্ট অন পাব্লিক ইন্সট্রাকশনে আর এল মার্টিন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে "The great advocate of female education" বলে অভিনন্দিত করেন। সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে তাঁর সমকাল স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের অন্যতম প্রধান উদ্যোগী বলে যেভাবে দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন তার মধ্যেই নিহিত আছে এ বিষয়ে তাঁর পরম সাফল্যের প্রমাণ। দক্ষিণবঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বালিকা বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেগুলির মধ্যে কয়েকটিকে তিনি বাঁচিয়ে রাখতে যে পেরেছিলেন তার প্রমাণ আমরা পাই 'হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে তৎকালীন ডি পি আই রিপোর্ট থেকেও জানা যায় যে ঠিক ঐ সময় (১৮৫৮ খ্রী:) সরকারী সাহায্য বিদ্যালয়গুলির জন্য মঞ্জুর করা না হলেও পরবর্তীকালে (১৮৬২ খ্রী:) খুব সামান্য পরিমাণে হলেও সরকারী অনুদান দেওয়া হয়েছিল। যে বিদ্যালয়গুলিকে বিদ্যাসাগর টিকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন এবং যেগুলির জন্য পরবর্তীকালে সরকারী অনুদান পেয়েছিলেন সেগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত বিদ্যালয়গুলির বিষয় সরকারী রিপোর্ট থেকে জানা যায় :

১। হিন্দু ফিমেল স্কুল - গোবিন্দপুর-জেলা হুগলী (স্থাপিত ১ নভেম্বর, ১৮৫৮)

২। হিন্দু ফিমেল স্কুল - কুরান- থানা- ঘাটাল, জেলা হুগলী (স্থাপিত ১ জানুয়ারি, ১৮৬১)

৩। — ঐ — বীরসিংহ — থানা ঘাটাল, জেলা-হুগলী (স্থাপিত ১ এপ্রিল, ১৮৫৮)

৪। — ঐ — উদয়রাজপুর-থানা গোঘাট-জেলা হুগলী (স্থাপিত ২ মার্চ, ১৮৫৮)

৫। — ঐ — রিষড়া থানা - শ্রীরামপুর জেলা হুগলী (স্থাপিত ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯)

৬। — ঐ — রসুলপুর-থানা গাঙ্গুরিয়া, জেলা বর্ধমান (স্থাপিত ২৬ এপ্রিল, ১৮৫৮)

৭। — ঐ — উদয়গঞ্জ - থানা ঘাটাল-জেলা হুগলী (স্থাপিত ১ আগস্ট ১৮৬১)

গোবিন্দপুর স্কুলের জন্য ১৪টাকা, কুরানের স্কুলের জন্য ১৪ টাকা, বীরসিংহের স্কুলের জন্য ১২ টাকা, উদয়রাজপুরের স্কুলের জন্য ১২ টা, রসুলপুরের স্কুলের জন্য ১০ টাকা, রিষড়ার স্কুলের জন্য ১২ টাকা, উদয়গঞ্জের স্কুলের জন্য ১৪ টাকা করে মাসিক সাহায্য সরকার থেকে মঞ্জুর করা হয়। বিদ্যালয়গুলিতে প্রথম শ্রেণী থেকে

চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদানের ব্যবস্থা ছিল এবং লিখন, পঠন ও গণিত শিক্ষা দেওয়া হত। পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে ছিল বোধোদয়, ধারাপাত, কথামালা, বর্ণপরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ চারুপাঠ ও ঋজুপাঠ। স্কুলের বাড়ি ছিল গ্রামবাসীদের সম্পত্তি। রসুলপুর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ১৮৬২ সালে ছিল ২৬ জন এবং উদয়গঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৩৯ জন। সুতরাং অনুমান করা হয়তো ভুল হবে না যে, দক্ষিণবঙ্গের বালিকা বিদ্যালয়গুলির (যেগুলি বিদ্যাসাগর স্থাপন করেছিলেন) মধ্যে অন্তত সাতটি বালিকা বিদ্যালয়কে তিনি সেই সময়ের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে ভালভাবেই বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। ১৮৫৭ সালের নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ সালের মে পর্যন্ত সময়ে তিনি যে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সেগুলির মধ্যে বীরসিংহ (১ এপ্রিল ১৮৫৮), উদয়রাজপুর (২ মার্চ ১৮৫৮) এবং রসুলপুর (২৬ এপ্রিল ১৮৫৮) এই তিনটি বালিকা বিদ্যালয় পূর্বোক্ত ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এবং বাকি ৪টি (গোবিন্দপুর, কুরান, রিষড়া, উদয়গঞ্জ) বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন ১৮৫৮ সালের মে মাসের পর থেকে ১৮৬১ সালের মধ্যে।

সুতরাং একজন মানুষের মধ্যে কতখানি আন্তরিকতা ও জেদ থাকলে তবে সেই প্রতিকূল সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত এবং সরকারী মনোভাব সত্ত্বেও এভাবে একসঙ্গে একাধিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সেগুলিকে লালন করে তোলা সম্ভব তার দৃষ্টান্ত একমাত্র যে বিদ্যাসাগরই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শুধু তো বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করাই নয়, একই সঙ্গে ছেলেদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, মডেল স্কুল, নর্মাল স্কুল স্থাপন - বিধবা বিবাহ-বহু বিবাহ নিরোধ আন্দোলন, হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফান্ড প্রতিষ্ঠা এবং এছাড়া আরও নানাবিধ সমাজ হিতকর ব্যাপারে নিজেকে তিনি নিয়োজিত রেখেছিলেন। তারই মধ্যে সরকারের সাহায্য প্রথম দিকে না পেয়েও বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় নিরলস পরিশ্রম করে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন এবং তাতে যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন সে বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে একটা বিদ্যালয় শুধু প্রতিষ্ঠা করে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা যে কত কষ্ট সাধ্য তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। তার উপব তাঁর অমর কীর্তি মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন-এর কথা তো আজ সর্বজনবিদিত।

স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর যখন তাঁর কাজ শুরু করেন, তার আগে থেকেই এ বিষয়ে যে কিছু কিছু কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল সে সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা জেনেছি। তবে সেগুলি ছিল সবই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলোকে একক বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাই বলা চলে। সমষ্টিগতভাবে যেখানে এই প্রচেষ্টা হয়েছে সেখানে দেখা গেছে সেই প্রচেষ্টার পিছনে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের মধ্যে দিয়ে স্ত্রী জাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনার উদ্দেশ্য যতখানি ছিল, তারচেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে ছিল ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ধর্মীয় প্রচারের উদ্দেশ্য— সে খ্রীষ্টধর্মই হোক বা ব্রাহ্মধর্মই হোক কিংবা সনাতন রক্ষণশীল হিন্দুধর্মই হোক। সুতরাং এক্ষেত্রে সেগুলিকে সীমাবদ্ধ প্রচেষ্টাই বলতে হবে, এবং এই কারণেই

সেই সব প্রচেষ্টার প্রভাব সাধারণ জনমানসে বিশেষ পড়েনি বলেই মনে হয়।

ধর্মনিরপেক্ষভাবে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের প্রথম প্রচেষ্টা দেখা যায় সম্ভবত বেথুন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের মধ্যে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিন প্রারম্ভিক ভাষণেই বেথুন সাহেব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন বিদ্যালয়টিতে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থাই অনুসরণ করা হবে। বিদ্যাসাগর প্রথম থেকেই এই বিদ্যালয়টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বেথুন সাহেব তখন সরকারী শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এ প্রসঙ্গে একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য। সেই সময় অর্থাৎ স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের জন্য নানা আন্দোলন যখন চলছিল, তখন উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সরকারী দপ্তরে সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু শিক্ষা সংসদ সেই আবেদনে কর্ণপাত করেননি। সেটা হলো ১৮৪৫ সালের কথা। চারবছর পরে ১৮৪৯ সালে এ বিষয়ে আবার তাঁরা সরকারী শিক্ষা সংসদে আবেদন করেন। এই আবেদনে বলা হয় "... Many respectable people of this neighnourhood concur with us in thinking that if an experimental school for the education of female children should be established here under the patronage of Govt. it may be successful, eventually leading to the establishment of others all over the country ... the cost of the building will be about 2000 Rupees, which shall be equally borne by the Govt. and ourselves. এই প্রস্তাবে শিক্ষা সংসদ সম্মত হননি। উত্তরে তাঁরা জানান যে সরকারী সাহায্য না পেয়ে স্বাধীনভাবে কোন বালিকা বিদ্যালয় কিভাবে চলে তা অন্তত কিছুদিন না দেখে তাঁরা কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারবেন না। বেথুন ছিলেন সেই সময়ে সরকারী শিক্ষা সংসদের সভাপতি। এই ঘটনার অনতিকাল পরেই যে বেথুন সাহেব কলকাতা শহরে তাঁর বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের মধ্যে দিয়ে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্ত্রী শিক্ষার ইতিহাসে অন্যতম প্রধান একজন উদ্যোগী পুরুষ হিসাবে অমর হয়ে রইলেন, সেই বেথুন সাহেব উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কেন সহযোগিতা করলেন না তা বোঝা যায় না।

যাইহোক শিক্ষাক্ষেত্রে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের বিষয়ে যখন একক বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চলেছে, কলকাতায় বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বিদ্যাসাগর তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছেন, সেই সময় ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন হতে থাকে। উডের দলিল প্রকাশিত হওয়ার পর স্ত্রী শিক্ষার বিষয়ে সরকারী পোষকতার প্রত্যক্ষ নির্দেশ আসে। বিদ্যাসাগর তখন স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাগুলির একটি সুসংগঠিত সঙ্ঘবদ্ধ রূপ দিতে অগ্রসর হলেন। সরকারী সমর্থনের আশ্বাস পেয়ে অত্যন্ত স্বল্পকালের মধ্যে বাংলার গ্রামাঞ্চলের নিজ এলাকাভুক্ত স্থানে অনেক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। দেশের প্রশাসন ক্ষমতা যদি শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে সহায়তা দান করতে আগ্রহী হয় তাহলে সুনির্দিষ্ট এবং সুপরিকল্পিতভাবে তা প্রয়োগ করাও সম্ভবপর হয় সহজেই। এতকাল পর্যন্ত সরকারের দিক থেকে উৎসাহ কিংবা সাহায্যদান কোন কিছুই ছিল না, সুতরাং একক বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাগুলি

বিশেষ সফলতা পায়নি। শিক্ষার প্রসার করতে গেলে দরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের। অধিক সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্থায়ীভাবে চালাতে গেলে স্থায়ী সরকারী সাহায্য ও অতি অবশ্যই দরকার। কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে সম্ভব নয় একসঙ্গে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ করা। আপামর নারী সমাজের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হলে একটি দুটি বিদ্যালয় স্থাপন করলে চলবে না, দরকার অধিক সংখ্যায় বিদ্যালয় স্থাপন করা। বিদ্যাসাগর সেটাই চেয়েছিলেন এবং সেজন্যই একসঙ্গে অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় তিনি স্থাপন করে ফেলেন সরকারী আশ্বাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। নিজ এলাকাভুক্ত অঞ্চলে স্থাপন করেছিলেন, কারণ তাহলে খুব বেশি একটা বাধা আসবে না, প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখতে পারা যাবে, আর যেহেতু নিজের এলাকা, অতএব নিজের পরিকল্পনা মতো কাজ করতে পারবেন, মনে হয় এসব ভেবেই নিজ এলাকায় বিদ্যালয়গুলি স্থাপন করেছিলেন। আরও একটা বড় কারণ ছিল বোধহয়, নিজের এলাকায় যত সহজে কাজ করতে পারবেন অন্যের এলাকায় তত সহজে হয়তো পারবেন না। তাছাড়া শিক্ষা বিভাগের অনুমোদন লাভের ব্যাপারেও বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসাবে নিজ এলাকায় স্বপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির অনুমোদন পাওয়া ইত্যাদি সুবিধাগুলি সহজে পাওয়া যেতে পারে — এসব ভাবনা চিন্তা ও নিশ্চয়ই তিনি করেছিলেন।

একই সঙ্গে অতগুলি বিদ্যালয় স্থাপনের ফলে স্থানীয় জনমানসে স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে নিশ্চয়ই একটা সাড়া জেগেছিল, অন্তত জাগা স্বাভাবিক ছিল। হুগলীতে ২০টি, বর্ধমানে ১১টি, মেদিনীপুরে ৩টি এবং নদীয়ায় ১টি, যেখানে কোন বিদ্যালয়ই ছিল না সেখানে একসঙ্গে, এতগুলি বিদ্যালয় স্থাপন যে সাধারণ জনমানসে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল সেকথা সহজেই অনুমেয়। স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই প্রচেষ্টার প্রভাবেই মনে হয় অনতিবিলম্বে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পর পর বেশ কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় বেসরকারী উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল। কেশব সেন স্থাপন করেন বর্তমান ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন (১৮৭১)। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে শিবনাথ শাস্ত্রী স্থাপন করেন ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ঃ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'মাতাজি তপস্বিনী' গঙ্গাবাই প্রতিষ্ঠা করেন আদি মহাকালী পাঠশালা, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভগিনী নিবেদিতা স্থাপন করেন 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়।' আরও আগে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে শিবনাথ শাস্ত্রীর নিজ গ্রাম মজিলপুরে 'ডাক্তার প্রিয়নাথ রায়চৌধুরীর যত্নে ও ব্রাহ্মদিগের সাহায্যে এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচেষ্টা যে কিছু পরিমাণেও সফলতা লাভ করেছিল এগুলি তারই নিদর্শন। বস্তুত নবজাগরণের ফলে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর চিন্তা জগতে যে পরিবর্তনমুখী চেতনার সঞ্চার হয়েছিল সেটা অস্বীকার করা যায় না। সমাজ প্রগতির জন্য যে নারী শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন সে বোধের উন্মেষ তখন কিছু কিছু মানুষের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল। সে যুগের সাহিত্যও এ বিষয়ে বোধহয় একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল, আর এক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের

অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুত বিদ্যাসাগরের জন্যই তা সম্ভব হয়েছিল। কারণ বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম বাংলা 'সাহিত্যের' ভাষাকে সৃষ্টি করেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় : "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলায় সাহিত্য ভাষার সিংহদ্বার উদঘাটন করেছিলেন।' ... বাংলায় এই ভাষাই দ্বিধাবিহীন মূর্তিতে প্রথম পরিস্ফুট হয়েছে বিদ্যাসাগরের লেখনিতে : তার সত্তায় শৈশব-যৌবনের দ্বন্দ্ব ঘুচে গিয়েছিল। ... বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। ... তিনি বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজগতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন। ... যিনি এই সেনার রচনা কর্তা, যুদ্ধ জয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।" বিদ্যাসাগর ছিলেন সংস্কারক, আর সংস্কারকের মনের ভাব মানুষকে বোঝানোর জন্য সহজবোধ্য ভাষার আশ্রয় দরকার। তাই তিনি বাংলাভাষাকে গতিদান করার জন্য, তাকে সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য অনেক চিন্তা ভাবনা অনুশীলন করেন এবং তাতে সিদ্ধিও লাভ করেন। আবার ভাষানুশীলনের জন্য, ভাষা বোঝার জন্য শিক্ষার দরকার। সুতরাং শিক্ষা বিস্তারে নেতৃত্ব তো তাঁকে দিতেই হবে এবং দিলেনও। তাঁর সমগ্র জীবনই তো শিক্ষকতার জীবন। ১৮৪২-এ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ দিয়ে যে জীবনের শুরু হয়েছিল ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর কিছুদিন আগে পর্যন্ত সেই শিক্ষকতা আর শিক্ষা বিস্তার কার্যের মধ্যে দিয়েই তা অতিবাহিত হয়েছিল। বাংলাভাষাকে সাহিত্যিক মর্যাদা দেওয়ার পূর্ণ কৃতিত্ব বিদ্যাসাগরের। "সাহিত্য স্রষ্টা বিদ্যাসাগর কালের উপর চিরজয়ী। সন্দেহমাত্র নেই, বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথ-বাঙালী লেখক মাত্রেই তাঁর অনুগামী।" বঙ্কিম উপন্যাস পাঠ করে, রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়ে বাংলার মানুষের মনে সংস্কারমুক্ত চিন্তাধারার উন্মেষ হয়েছে। 'বঙ্গদর্শন' বাংলার ঘরে ঘরে তখন সমাদৃত পত্রিকা। বাঙালীর মন জেগেছে - বাঙালীর অন্তঃপুরে চেতনা এসেছে - মধ্যবিত্ত বাঙালী সাধারণীরা মনে মনে নিজেদের আয়েষা, ভ্রমর, সূর্যমুখী, তিলোত্তমা, চঞ্চলকুমারী, নির্মলকুমারী বলে ভাবতে শুরু করেছে : রোহিনী কুন্দনন্দিনীর জন্য সহানুভূতি-সমবেদনা বোধ করেছে, আর নিজেদের নির্যাতিত অপমানিত জীবনদর্পণে দেবী চৌধুরাণীকে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করেছে। ফলে সমাজ মানসিকতায় পরিবর্তন অনিবার্যভাবেই এসেছে, আর সেই পরিবর্তনের মধ্যেই নিহিত আছে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সফলতা।

নির্দেশিকা

১। দ্রষ্টব্য : Challenge of Education (a perspective) — Ministry of Education Govt. of India, Page-14.

২। সমাজের দুর্বল অংশের সাক্ষরতা ও শিক্ষার সমস্যা - অধ্যাপক জ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৪৫, ১৪৯, ১৫৮, ১৫৯।

৩। দ্রষ্টব্য : বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ-বিনয় ঘোষ, পৃঃ ২৭৭।

৪। যশোধারা বাগচী — অধ্যাপিকা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সাক্ষাৎকার — শুভ্রা

রায়, 'সানন্দা' ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৮৮।

৫। সাহিত্যে বঙ্গমহিলা- ব্রজেন্দ্রনাথ (বেথুন বিদ্যালয় শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ) পৃঃ - ২০২-২০৫

৬। দ্রষ্টব্য : মেয়েদের একাল-সেকাল- প্রবোধকুমার সান্যাল (আনন্দবাজার পত্রিকা, সুবর্ণ জয়ন্তী বার্ষিক সংখ্যা-১৩৭৮)

৭। দ্রষ্টব্য : গত পঞ্চাশ বছরে কলকাতার মেয়েরা — গৌরী আইয়ুব (আনন্দবাজার পত্রিকা, সুবর্ণ জয়ন্তী, বার্ষিক সংখ্যা-১৩৭৮)

৮। (ক) দ্রষ্টব্য : ছেলেবেলা -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ১০

৮। (খ) দ্রষ্টব্য : মেয়েদের একাল-সেকাল-প্রবোধকুমার সান্যাল (আনন্দবাজার পত্রিকা, সুবর্ণ জয়ন্তী বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৭৮)

৯। (ক) দ্রষ্টব্য : সতী : স্বপন বসু, পৃঃ ১২৫ (Minute by Lord William Bentink, 8.11.1829, Boulgee's/Bentink P. 101 হতে উদ্ধৃত) নারী মুক্তি আন্দোলনে রামমোহনের ভূমিকা — ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৪৭

৯। (খ) দ্রষ্টব্য : বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (২য় খণ্ড) পৃঃ ৫৬৯-৫৭০ (সাক্ষরতা প্রকাশন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি)

১০। দ্রষ্টব্য : বিদ্যাসাগর চরিত - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ১৮-১৯

১১। Women's Education in Eastern India-Jogesh C. Bagal, Page-10.

১২। বামাবোধিনী পত্রিকা-ভাদ্র-আশ্বিন ১৩০৬ (৩৭ বর্ষ) ৪১৬-১৭ সংখ্যা, ৬ষ্ঠ কল্প, ৪র্থ ভাগ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৌজন্যে)

১৩। দ্রষ্টব্য : আত্মচরিত - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ২য় পরিচ্ছেদ, ১৪শ অনুচ্ছেদ

১৪। বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ — গোপাল হালদার লিখিত ভূমিকার কিছু অংশের সারসংক্ষেপ।

১৫। দ্রষ্টব্য : বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ-বিনয় ঘোষ পৃঃ ২৩১

১৬। দ্রষ্টব্য : বিদ্যাসাগরের পত্রাবলী-বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেন্টার প্রকাশিত, পৃঃ ৪২-৪৩

১৭। দ্রষ্টব্য : ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা-অধ্যাপক জ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৭৬

১৮। Education consultation, April, 1872, No. A 54-58 (বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৬৬-৬৭ থেকে উদ্ধৃত)

১৯। দ্রষ্টব্যঃ সোমপ্রকাশ ৩ পৌষ ১২৭৩- স্ত্রী নর্মাল বিদ্যালয় (চিঠি) - বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৌজন্যে

২০। সোমপ্রকাশ (সম্পাদকীয় - বিষয় - স্ত্রী নর্মাল বিদ্যালয়) - ৫ ফাল্গুন ১২৭৫, ১৪শ সংখ্যা (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৌজন্যে)

২১। দ্রষ্টব্য : বামাবোধিনী পত্রিকা-আশ্বিন-১২৭৬

২২। দ্রষ্টব্য : জীবনী সন্দর্ভ-শ্রী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (সমাজ রক্ষক রাধাকান্ত

দেব) পৃ: ১৫৩

২৩। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ-বিনয় ঘোষ-পৃ: ৪৪১, ২৩৮

২৪। বিদ্যাসাগর জীবন চরিত-শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পৃ: ১০৮, ১০৯ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ)

২৫। দ্রষ্টব্য: বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (২য় খণ্ড)-পৃ: ২২

২৬। দ্রষ্টব্য : ঐ (ঐ) পৃ:-৩৬

২৭। দ্রষ্টব্য : বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (২য় খণ্ড) পৃ: ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫

২৮। Report of Pundit Ishwar Chandra Sharma, special Inspector of shcools, South Bengal for 1857-1858 (Report on public Instruction in Bengal 1857-1858) (উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাঠাগারের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

২৯। শিবনাথ রচনা সংগ্রহ - রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ-পৃ: ৩৬৮

৩০। প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর - যোগনাথ মুখোপাধ্যায়, পৃ: ১৮

৩১। সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র — তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা - বিনয় ঘোষ

৩২। সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র-বিনয় ঘোষ-সোমপ্রকাশ ২০ পৌষ, ১২৮৭ (স্ত্রী শিক্ষার কয়েকটি প্রতিবন্ধকতা)

৩৩। Early History of Bethune College-Arbinda Guha (Bethune College Centenary Volume-Page-1)

৩৪। (ক) বেথুন কলেজ শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ-(কাদম্বিনী বসু-নলিনী দাস) পৃ: ২

৩৪। (খ) বেথুন কলেজ শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ (কাদম্বিনী বসু-নলিনী দাস) পৃ: ৩

৩৫। Early History of Bethune College-Arbinda Guha (Bethune College Centenary Volume) Page-9

৩৬। ঐ Page E 4

৩৭। Report on Public Instruction in Bengal 1857-1858 (Report of Pandit Ishwar Chandra Sharma, Special Inspector of Schools, South Bengal for 1857-58) (উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাঠাগারের সৌজন্যে)

৩৮। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ — শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ: ৩৬৭

৩৯। (ক) Unpublished Letters of Vidyasagar-Edited by Arabinda Guha Page : 39 (Gen. Report on Public Instruction in Bengal for 1871-1872, Appendix A.P. 59)

৩৯। (খ) Proceedings of the Lieutenant Governor of Bengal, Edn. Dept., July 1862, Nos, (15) & (16), (17) & (18).

Proceedings of the Lieutenant governor of Bengal, Edn. Dept. July 1862 Nos. (5) & (6) Proceedings of the Lieutenant Govetnor of Bengal, Edn. Dept. June, 1862 Nos. (141) & (142).Proceedings of the Lieutenant governor of Bengal Edn. Dept. July, 1862 Nos. (3) & (4); 36 & 37 (7) & (8).

৪০। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ-বিনয় ঘোষ, পৃঃ ২১৬
৪১। আত্মচরিত - শিবনাথ শাস্ত্রী,পৃঃ ৪০
৪২। বিদ্যাসাগর চরিত-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৮, ১২
৪৩। বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (৩য় খণ্ড) ভূমিকা-গোপাল হালদার, পৃঃ ২৩

তৎকালীন অপরাপর চিন্তার পটভূমিতে বিদ্যাসাগর-চিন্তার সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

বাংলাদেশে নারী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিশেষ ভূমিকা নিয়ে এ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হ'ল তাতে একটা বিষয় স্পষ্টই প্রতীয়মান যে, নারী শিক্ষার উন্নতিকল্পে তাঁর যে সংগ্রাম--তা তাঁর বৃহত্তর শিক্ষানীতি বা শিক্ষা সংস্কার তথা সমাজ সংস্কার আন্দোলনেরই একটা বিশেষ অংশ। সুতরাং সেই বিশেষ অংশটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনার শেষে স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজস্ব শিক্ষানীতি বা শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত সাধারণ আলোচনা প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়েব শিক্ষানীতির মূল কথা হ'ল—সংস্কৃতের জ্ঞান ভাণ্ডার অর্থাৎ ঐতিহ্যপূর্ণ প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান ভাণ্ডার ও ইংরাজীর জ্ঞান ভাণ্ডার অর্থাৎ আধুনিক ইউরোপীয় জ্ঞান ভাণ্ডারের সম্মিলিত সম্পদে শিক্ষার্থীদের সমৃদ্ধ করতে হবে, যাতে তারা বিশেষভাবে ভারতীয় ভাষাগুলিকে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতার দানে পরিপুষ্ট করে তুলতে পারে। ১৮৪৬ সালে সংস্কৃত কলেজের সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর নিজস্ব যে পরিকল্পনার খসড়া রচনা করেন তার মধ্যেই নিহিত আছে তাঁর সেই শিক্ষাদর্শ-শিক্ষাপদ্ধতি। তাঁর সেই আদর্শ হলো আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতার দান সযত্নে আহরণ; শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি হ'ল-মাতৃভাষায় সেই দান পরিবেশন এবং তার প্রধান উপায় হ'ল সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষার মিলিত সম্পদে শিক্ষার্থীদের শক্তি সম্পুষ্ট করা। পুনরুল্লেখ সত্ত্বেও উদ্ধৃতি বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি,"— ....ছাত্রেরা যদি ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত হয়, তাহলে একমাত্র তারাই সুসমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের সুদক্ষ ও শক্তিশালী রচয়িতা হ'তে পারবে।"

"... গণিত শাস্ত্রের লীলাবতী ও বীজগণিত পড়ে সময় নষ্ট না করে পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুরূপ গণিত পাঠ প্রবর্তন প্রয়োজন; ভারতীয় দর্শন পাঠের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শন পাঠও অবশ্যই করতে হবে; বাস্তবের সঙ্গে যাঁর বিরোধ তেমন দর্শন পাঠের কোনই সার্থকতা নেই। ...বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, এ সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নেই। ... সংস্কৃতে অনন্যোপায় হয়ে যখন এগুলি শেখাতেই হবে, তখন এদের প্রভাব কাটিয়ে তুলতে প্রতিষেধক রূপে ইংরাজীতে ছাত্রদের যথার্থ দর্শন পড়ানো দরকার।"

বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য ছিল জাতীয় জীবনকে আধুনিক *শিক্ষা-দীক্ষায় আধুনিক*

সভ্যতায় সমুন্নত করে তোলা। কিন্তু সে সময়ের (এমনকি এখনও) অধিকাংশ বাঙালী 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিগত তথা গোষ্ঠীগত মান ও সুযোগ-সবিধা বৃদ্ধির জন্য ইংরাজী শিক্ষা। মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বসাধারণের মধ্যে যর্থাথ শিক্ষা ছড়িয়ে পড়লে চাকরির বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি পাবে—তাই চাকরিজীবী বাঙালী ভদ্রলোক শ্রেণী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সেই প্রয়াসকে উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করতে পারেননি। বাংলা শিক্ষা না হলেও ভদ্রলোকের আপত্তি নেই, জনশিক্ষা বাড়লেই বরং বাঙালী ভদ্রলোকের বিপদ বাড়তে পারে। এজন্যই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জনশিক্ষা বিস্তারের সেই প্রয়াস প্রায় নিষ্ফল হয়ে যায়। বিদ্যাসাগর যখন তাঁর শিক্ষানীতি বা শিক্ষা পরিকল্পনার খসড়া রচনা করছিলেন তার অনেক আগে মেকলের 'মিনিট' প্রকাশিত হয়ে গেছে, এবং লর্ড বেন্টিঙ্ক সেই 'মিনিট' কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। ঐ মিনিটে মেকলে সাহেব প্রাচ্য বিদ্যাকে একেবারে নস্যাৎ করে দিয়ে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। ভারতীয়দের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে তাদের মাতৃভাষার পরিবর্তে ইংরাজী ভাষাকে ব্যবহারের নির্দেশ দেন তিনি। মেকলের মতে ইউরোপের একটি পাঠাগারের যে কোন আলমারির একটি মাত্র তাকে আধুনিক ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে কয়খানি পুস্তকের স্থান হয় তা সমগ্র ভারতীয় ও আরবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহিত্যের তুলনায় উৎকৃষ্টতর। তিনি মনে করতেন নব্বইটি প্রজন্ম ধরে সঞ্চিত পৃথিবীর সব ঐশ্বর্য্য একমাত্র ইংরাজী ভাষার মধ্যেই বর্তমান আছে। (যদিও মেকলে নিজে সংস্কৃত বা আরবী ভাষা জানতেন না, তবুও তিনি অনায়াসেই এই ধরনের সদম্ভ উক্তি করেছিলেন প্রাচ্য বিদ্যা সম্পর্কে)। তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন—ইংরাজীর তুলনায় সবদিক থেকে অযোগ্য ভারতীয় ভাষাগুলির প্রসার ঘটানো উচিত নয়, সেই অর্থে উন্নত মানের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-ইতিহাস-ভূগোল বিষয়ের প্রসার ঘটিয়ে অবিলম্বে প্রাচ্য বিদ্যার হাস্যকর ও অতিরঞ্জিত বিষয়গুলির প্রসার বন্ধ করা উচিত। মেকলে জোরের সঙ্গে প্রস্তাব দেন—ভারতে শিক্ষার নীতি হওয়া উচিত ইংরাজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার এবং প্রাচ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অবিলম্বে বন্ধ করে দিয়ে তার অনুদানগুলি ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত।

১৮৭৮ সালে 'বঙ্গদর্শনে' সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লোক শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ করেন। বঙ্কিম চন্দ্র বলেন, বাঙালী জাতির সর্বাত্মক উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক হলো লোক শিক্ষার অভাব। তাঁর মতে এদেশে 'শিক্ষিত-অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না'। স্পষ্টই বোঝা যায় বঙ্কিমচন্দ্র এখানে 'শিক্ষিত' বলতে ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিকেই বুঝিয়েছেন। সেই সময় ইংরাজী শিক্ষা দেশের মানুষের মধ্যে যে বুদ্ধিগত' শ্রেণী বৈষম্যের সৃষ্টি করেছিল, দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ এবং শিক্ষিত (ইংরাজী শিক্ষায়) মুষ্টিমেয়ের মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল তার প্রতি কটাক্ষ করেই সাহিত্য সম্রাট উপরোক্ত মন্তব্য করে

বলেছেন,"(ইংরাজী) শিক্ষিত ব্যক্তি আপনস্বার্থ চিন্তায় ব্যস্ত, সাধারণ জনগণের ভাবনা ভাবার সময় তার নেই। ...সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙ্গালার সর্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।"—বঙ্কিমের এই মন্তব্যে মনে হয় ভারতীয় শিক্ষা ক্ষেত্রে মেকলে তথা লর্ড বেন্টিঙ্ক প্রবর্তিত "চুঁইয়ে নামা"-র নীতিকেই তিনি সমর্থন করেছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে আধুনিক প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রসারের কথা তিনি বলেননি।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা সম্পর্কিত উল্লিখিত মন্তব্যের অনেক আগেই ১৮৫৩ সালে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন... "জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার —এই এখন আমাদের প্রধান প্রযোজন... সুবিস্তৃত ও সুব্যবস্থিত বাংলা শিক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয় ; কেননা মাত্র তার সাহায্যেই জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব।" হ্যালিডের সাথে পরামর্শ করে বিদ্যাসাগর হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে বেশ কিছু মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সব স্কুলে পাঠ্য বিষয় হবে ভূগোল, ইতিহাস, জীবন বৃত্তান্ত, জ্যামিতি, পাটিগণিত, প্রকৃতি বিজ্ঞান, নীতি বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, শরীর তত্ত্ব এবং প্রারম্ভিক লেখা, পড়া ও গণিত। শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। প্রতিটি স্কুলে একজন হেড পণ্ডিত এবং দু'জন সহকারী পণ্ডিতের অধীনে ৩য় শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণীর স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। শিক্ষক তৈরির জন্য একটি নর্মাল স্কুল ও প্রতিষ্ঠা করা হয়। দু'জন বিদ্যালয় পরিদর্শকও নিয়োগ করার কথা তিনি বলেন। বছরে দুই কিস্তিতে ৬০ জন করে শিক্ষক তৈরির জন্য ১৮৫৫ সনে এই নর্মাল স্কুল স্থাপন করা হয়। নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন অক্ষয় কুমার দত্ত।

মাতৃভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে বিদ্যাসাগর বলেছেন, "... প্রথম কথা কহিতে শিক্ষা স্ব জাতীয় লোকের নিকট হয়। এ নিমিত্ত প্রথম শিক্ষিত ভাষাকে জাতীয় ভাষা বলে। সকলেরই স্পষ্টরূপে কথা বলিতে চেষ্টা করা উচিত। তাহা হইলে সকলে অনায়াসে বুঝিতে পারে। ... ইংরেজরা এক্ষণে আমাদের দেশের রাজা। সুতরাং ইংরাজী আমাদের রাজভাষা। এ নিমিত্ত সকলে আগ্রহ পূর্বক ইংরাজী শিখে। কিন্তু জাতি ভাষা না শিখিয়া পরের ভাষা শেখা কোনও মতে উচিত নহে"। সুতরাং বিদ্যাসাগরের মতে (১) জাতি ভাষা সর্বপ্রথম শিক্ষা করা উচিত। (২) স্পষ্ট করে কথা বলা উচিত। জাতি ভাষা শেখা এবং স্পষ্ট উচ্চারণ অনুশীলনের উপর গুরুত্ব দিয়েই তিনি 'বর্ণপরিচয়' লিখলেন (এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা' বাঙালীর ভাষা ও সংস্কৃতির ভগীরথ শিরোনামে করা হয়েছে।) বিদ্যাসাগর যে শিক্ষা ক্ষেত্রে "চুঁইয়ে নামা'র নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না—তিনি যে নতুন দিগন্তের যাত্রী ছিলেন উপরোক্ত উদ্ধৃতি ও আলোচনার মধ্যে দিয়েই তার আভাস পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমরাও বলতে পারি "স্বদেশের পরিচ্ছদ গ্রহণ করে তিনি বিদেশের বিদ্যাকে আতিথ্যে বরণ করতে পেরেছিলেন এইটেই বড রমনীয় ছিল।"

১৮৫৭ সালে ডি পি আই কে লেখা একটি পত্রে বিদ্যাসাগর সরকার প্রতিষ্ঠিত 'বাংলা' স্কুল সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছেন".... Labour in this country is so

cheap that the earnings of the working classes are scarcely sufficient for their maintenance. They cannot, therefore, be expected to incur extra charges for the education of their children. If those classes are to be educated, the education must be imparted to them gratis so long as their condition is not bettered, otherwise, it is not reasonable to expect that those classes will reap any material advantage under the systen inforce in the Vernacular schools."

১৯শ শতকের ১৮৫৯-৬০ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোথাও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়নি—এমনকি ইংল্যান্ডেও না--যে ইংল্যান্ড ধনে—মানে তখন বুর্জোযা সভ্যতার শীর্ষ স্থানীয় ছিল। ভারতে বা বাংলাদেশে ঐ সময় সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তাব তোলা একেবারেই অসম্ভব ছিল, কারণ ভারত তখন বিদেশী শক্তির অধীনস্থ একটা উপনিবেশ মাত্র। এখনও এই একবিংশ শতকের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়েও স্বাধীন ভারতে আজ প্রায় শতকরা ৭০ জন মানুষ নিরক্ষর, —আর বিদ্যাসাগর কোন অবাস্তব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতেন না, তবু তা সত্ত্বেও তিনি সরকারের কাছে অবৈতনিক শিক্ষার প্রস্তাব যে দিয়েছিলেন--সে সময় এটাইতো তাঁর বৈপ্লবিক মানসিকতার পরিচয়, এখানেই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর পূর্বসূরি ও সমকালীনদের তফাৎ, এখানেই তিনি অনন্য।

বিদ্যাসাগরের পরবর্তী কালে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে (১৯০৩-৪) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর এক শিক্ষামূলক ভাষণে (যা পরবর্তীকালে 'The Education Problem in India. এবং " A Few thoughts on Education" নামে পুস্তককারে প্রকাশিত হয়) বিদ্যাসাগরের শিক্ষা চিন্তা শিক্ষানীতিরই প্রতিধ্বনি করেন। স্যার গুরুদাসও বলেন

" The Educational problem in India presents many peculiarities not to be met with in any other country. Thus, Indian students have to aquire knowladge through the medium of a different foreign language, and this not only overtaxes their energies, but also cramps their thoughts." তিনি আরও বলেন— "শিশুর শিক্ষা মাতৃভাষার হওয়া আবশ্যক। মাতৃভাষার বাচনিক শিক্ষা দ্বারা শিক্ষার্থীর শব্দসম্বল ও বহু বিষয়ক জ্ঞান সঞ্চিত হইলে তাহাকে নানা শব্দ ও বিষয় বিশিষ্ট পুস্তক পড়িতে ও লিখিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। শিক্ষকের মনে রাখা উচিত যে উচ্চারিত শব্দের বর্ণ বিশ্লেষণে এবং লিখনে অভ্যস্ত বলিয়া আমাদের পক্ষে উহা সহজ হইলেও শিশুর পক্ষে উহা তত সহজ নহে। যথা সম্ভব শিক্ষার্থীকে জাতীয় ভাষায় শিক্ষা দিতে হইবে। তাহা হইলে শিক্ষার্থী অল্পায়াসে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি আয়ত্ত করিতে পারিবে। বিজাতীয় ভাষায় শিখিবার শ্রম ও বুঝিবার অসুবিধা তাহাকে ভোগ করিতে হইবে না। শিক্ষারম্ভের পূর্বেই শিশু জাতীয় ভাষা আয়ত্ত করে এবং কতকগুলি জাতীয় সংস্কারে দীক্ষিত হয়। সেই সংস্কারগুলির

উৎকৃষ্ট অংশ বদ্ধমূল ও বিকশিত করিবার জন্য জাতীয় ভাষার শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে নিঃসন্দেহে শীঘ্র সুফল পাওয়া যাইবে।

কিন্তু তজ্জন্য বিজাতীয় ভাষা শিক্ষায় অবহেলা এবং বিজাতীয় সাহিত্য-দর্শনের উচ্চ আদর্শের প্রতি অনাস্থা কখনোই সঙ্গত হইতে পারে না। বিজাতীয় ভাষায় অনেক সদ্‌গুণ ও উচ্চাদর্শের কথা আছে। শিক্ষার উচ্চস্তরে শিক্ষার্থীকে বিজাতীয় ভাষায় শিক্ষিত ও বিজাতীয় উচ্চাদর্শ যথোচিত রূপে অনুকরণে প্রবৃত্ত করা উচিত। জাতীয় ভাব ও স্বদেশানুরাগ উচ্চ সদ্‌গুণ এবং তদ্বারা পৃথিবীর প্রভূত হিত সাধন হইয়াছে, কিন্তু জাতীয় ভাষা ও স্বদেশপ্রীতি অন্যদেশে ও অন্যজাতির প্রতি বিদ্বেষে পরিণত হওয়া কদাচ কল্যাণকর হইতে পারে না।"

হ্যালহেড সাহেব বাংলা ব্যাকরণ লিখেছিলেন, কেরী সাহেবও লিখেছিলেন ব্যাকরণ, রামমোহনও লিখেছিলেন গৌড়ীয় ব্যাকরণ। কিন্তু ভাষার শুদ্ধতা রক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর লিখেছেন সংস্কৃতাশ্রিত ব্যাকরণ। অথচ বাংলাকে আপামর জনসাধারণের ভাষা কবার উদ্দেশ্যে তিনি সংস্কৃত থেকে বাংলাকে স্বতন্ত্র করার চেষ্টা করেছেন। এজন্যই 'ঝাঁকামুটে', 'ভোঁদর', 'যাঁতিকল', প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু 'ঞ' এবং 'ঢ়' দিয়ে কোন শব্দ সৃষ্টি করেননি। পরবর্তী কালে স্যার গুরুদাসও বলেছেন।"
"....

The words which the boy should be exercised in forming, and which should find a place at this stage in the Alphabetical Primer, must be only those that are already known to him,and all new words must be carefully excluded.... To be taught to make with their component letter words already known to him. is to the boy a source of pleasure, some what similar to that of recognising an old friend in a new guise.

সুতরাং কি সমাজ সংস্কারেব ক্ষেত্র, কি শিক্ষা সংস্কার শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অনন্য প্রতিভা, (যা তাঁকে যুগন্ধর- যুগ পুরুষের মর্যাদায় ভূষিত করেছে।) সর্বত্রই আলোকিত করেছে সমকালে শুধু নয়— পরবর্তীকালেও।

নির্দেশিকা

১। বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (১ম খণ্ড-শিক্ষা) সাক্ষরতা প্রকাশনা. পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি-কলিকাতা-৯ পৃঃ ১৩-১৬।

২। Macaulay's Minute.2nd February, 1835 (Quoted) from History of Education by S. N. Nurullah and J.P.Naik Page-60-62

৩। বঙ্গদর্শন-লোকশিক্ষা-বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, অগ্রহায়ণ, ১২৮৫, বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ-পৃঃ ৪৮৭, ৪৮৮-৪৯০, সাক্ষরতা প্রকাশন, পশ্চিমবঙ্গ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, কলিকাতা-৯।

৪। ঐ

৫। বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (১ম খণ্ড-শিক্ষা) পৃ: ১৬-১৯ সাক্ষরতা প্রকাশনা, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি-কলিকাতা-৯

৬। আধুনিক ভারতে শিক্ষা বির্বতন-অধ্যাপক জ্যোতি প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়-পৃঃ ৯৬, শিক্ষা প্রকাশনী, কলকাতা-৪৭।

৭। -ঐ- পৃঃ ৯৭

৮। Report on public Instrucation-1857-1858 from. The Asst. Inspector of school, South Bengal,to W Gordon young Esqs. Director of public instruction, Fort Willum 14th April,1857 (Archive W. B.)

৯। A few thought on Education-Sir Gooroodas BanerJee 1st Edition-1904, 57 Harrison Road calcutta.

১০। বঙ্গগৌরব স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়— শ্রী শরৎ কুমার রায় -পৃঃ ৫৫-৫৮ (গুরুদাসের শিক্ষানীতি)

১১। আধুনিক ভারতে শিক্ষা বির্বতন-অধ্যাপক জ্যোতি প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়-পৃঃ ৯৮, শিক্ষা প্রকাশনী, কলিকাতা-৪৭

১২। A few thought on Education -Sir Gooroodas BanerJee 2nd Idition-1910, 54 College St, Calcutta.

উপসংহার

বাংলাদেশের নারী সমাজের মধ্যে শিক্ষার বিকাশ ঘটানোর জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অবদান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আলোচ্য বিষয়ের পটভূমি, সমস্যার সূত্রপাত, নারীশিক্ষার বিস্তারের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংগ্রামের পদ্ধতি, এই বিষয়ে তাঁর মহৎ কীর্তি এবং পরিশেষে এ বিষয়ে তাঁর অবদানের মূল্যায়ণ সম্পর্কে যা আলোচনা করা হল, বর্তমান অধ্যায়ে সেগুলিরই সংক্ষেপে পুনরালোচনা করা হচ্ছে।

কারণ বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান কতখানি সে সম্পর্কে আলোচনার শেষে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ বিবরণের প্রয়োজন, যাতে করে এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার একটা সুস্পষ্ট ধারণা করে নেওয়া সহজতর হয়ে ওঠে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক ভারতীয় মহিলা সমাজের অগ্রগতি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত নটরাজনের উক্তির সমালোচনা করে বলা হয়েছে, ভারত তথা বাংলাদেশের নারী জাতির অধিকাংশই এখনও পর্যন্ত নিরক্ষতার অন্ধকারের মধ্যে বাস করছে। যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক মহিলা শিক্ষিতা হয়েছেন তাদের মধ্যেও অধিকাংশেরই শিক্ষার মাধ্যমে আশানুরূপ আত্মোন্নতি ঘটেনি। আজও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, 'সতীহত্যা, বধূ নির্যাতন, পণের দায়ে বধূহত্যা, অভিভাবকদের পণের দায় থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কুমারী কন্যাদের আত্মহনন, ডাইনি সন্দেহে হত্যা এবং পথে ঘাটে নির্জনে অন্ধকার অথবা প্রকাশ্য দিবালোকে নারী লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটে চলেছে। মধ্যযুগীয়

মানসিকতার রেশ নারী—পুরুষ—শিক্ষিত—অশিক্ষিত নির্বিশেষে আজও ভারত তথা বাংলার মানুষের মনে রয়ে গেছে। বিশেষ করে মেয়েরা বোধ হয় আজও মধ্যযুগীয় মানসিকতাকে পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বস্তুত একদিকে বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে আধুনিক যুগ মানসের প্রতিফলন এবং তার ফলে যুক্তিবাদের প্রাধান্য, অপর দিকে মধ্যযুগীয় মানসিকতাকে অতিক্রম করতে না পারা, সমাজ জীবনের এই স্ববিরোধিতাকে দূর করতে না পারলে ভারতীয় নারী সমাজের উন্নতি সম্ভবপর নয়, এবং এই স্ববিরোধিতা দূর হতে পারে একমাত্র প্রকৃত শিক্ষার যথাযথ প্রসারে।

বৈদিক যুগের শেষ পর্ব থেকেই ভারতীয় সমাজে নারীর ভূমিকার ক্রমাবনমনের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, এবং এমন একটা সময় আসে যখন নারীর ক্ষেত্রে শিক্ষা লাভের অধিকার শুধু গণিকাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। পুরুষ প্রধান সমাজ ব্যবস্থায় সম্পত্তির উত্তরাধিকার ইত্যাদি নানা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কারণে সমাজে নারীর স্থান ক্রমেই সঙ্কুচিত হতে থাকে। এই সম্পর্কে প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য গ্রন্থে বৈদিক সমাজে নারীর স্থান সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লেখিকা বলেছেন (সুকুমারী ভট্টাচার্য)··· "ব্রহ্মচর্য্য—যা বেদ অধ্যয়নের প্রবেশ দ্বার, তা বহু প্রাচীন যুগেই নারীর পক্ষে নিষিদ্ধ, অতএব শিক্ষালাভের পথ তার রুদ্ধ"···· মধ্যে মধ্যে ব্যতিক্রমের মত কোন কোন নারী শিক্ষার সুযোগ পেতেন। যেমন, বিশ্ববারা, ঘোষা, অপালা, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রমুখ। কিন্তু শাস্ত্রের নজির দেখলে বোঝা যায়, নারীর শিক্ষার অধিকার ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল। তাই শিক্ষিতা নারীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'স্ত্রীয়াঃ : সতী : তাউ যে পুং সঃ আহুঃ— অর্থাৎ নারী হয়েও তারা পুরুষ ····স্ত্রীর প্রধান প্রয়োজন হল সে সন্তানের জননী, এবং তার প্রধান কর্তব্য হলো, পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়া। নিঃসন্তান বধূকে বিবাহের দশ বছর পর ত্যাগ করা যায়, যে স্ত্রী শুধু কন্যাসন্তানের জন্ম দেয় তাকে বারো বছর পরে, মৃত বৎসাকে পনেরো বছর পরে···ত্যাগ করা যায়"। সহমরণ ঘটতে থাকে বিক্ষিপ্তভাবে। সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী নারীর এই অবমূল্যায়নের ধারা অব্যাহত ছিল।

আধুনিক যুগের প্রারম্ভে ভারতে বিদেশী শাসনের সূচনার পর থেকে ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। বিদেশী মিশনারিরা এ দেশে এসে প্রধানত খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা শুরু করেন। সেই সময়ের বাংলাদেশে মেয়েদের মধ্যেও সেই শিক্ষা বিস্তারের জন্য কলকাতা ও তার আশে পাশে প্রতিষ্ঠা করলেন বেশ কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয়। ইতোমধ্যে পশ্চিমের নবজাগরণের বার্তা নিয়ে এলেন রামমোহন রায়। কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেও অধিকাংশ সাধারণ জনমানস মধ্যযুগীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারেনি।

এমনই এক যুগ পরিবেশে এলেন বিদ্যাসাগর। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে দেখে বাঙালী সহজেই তাঁকে আপন করে নিল। শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে চাইলেন আপামর জনসাধারণ দরিদ্র গ্রামবাসী আর

চিরবঞ্চিত নারী জাতির মধ্যে।

শ্রীরামপুর মিশন, রামমোহন রায় এবং ইয়ং বেঙ্গল দলও নারী শিক্ষার সপক্ষে মতামত প্রকাশ এবং সরব প্রচার চালাচ্ছিলেন। রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জণ মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ প্রসিদ্ধ ইয়ংবেঙ্গলের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রক্ষণশীল দলনেতা রাজা রাধাকান্ত দেবও এ বিষয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। অর্থাৎ সেই সময় বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রাচীন ও নবীন এই দুই পন্থার অনুসারীর মধ্যে দ্বন্দ্ব বিবাদ, বিতর্কের সূত্রপাত হয় এবং তৎকালীন পত্র-পত্রিকাগুলিও এই প্রসঙ্গ নিয়ে বিভিন্ন পক্ষ অবলম্বন করে লেখা-লেখি শুরু করে। এই দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ পরিবেশে বিদ্যাসাগর এলেন প্রাচীন-নবীন, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বোধের মধ্যে সমন্বয় সেতুরূপে।

স্ত্রী শিক্ষাকে অন্তঃপুরের গণ্ডি থেকে সাধারণের মধ্যে টেনে এনে সেই শিক্ষাকে একটা সুসংগঠিতরূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন বিদ্যাসাগর। ১৮৫৪ সালের উডের দলিলের সুপারিশের ভিত্তিতে কোম্পানির ডিরেক্টরগণও ভারতে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের সমর্থনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে প্রয়োযজনীয় সাহায্যের নির্দেশ দেন। বাংলার তৎকালীন ছোট লাট হ্যালিডে বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকার দরুন এবং গ্রামে গ্রামে মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করার দরুন যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের ভার অর্পণ করেন। মনের মতো কাজ পেয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর সমস্ত শক্তি এ ব্যাপারে নিয়োজিত করেন।

বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে কর্মরত অবস্থাতেই হয়তো তিনি বাংলার গ্রামাঞ্চলে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের কথা ভেবেছিলেন। তাই সরকারী সাহায্যের আশ্বাস পাওয়া মাত্র ঝড়ের গতিতে নিজ এলাকাভুক্ত অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে ফেলেন। কিন্তু প্রতিশ্রুত সরকারী সাহায্য না পাওয়ায় 'নারী শিক্ষা ভাণ্ডার' স্থাপন করে বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। ১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদানের ব্যবস্থা ছিল ঐ বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে এবং লিখন, পঠন, গণিত শিক্ষা দেওয়া হতো। পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে ছিল বোধোদয়, ধারাপাত, কথামালা, চারুপাঠ, ঋজুপাঠ এবং বর্ণপরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ।

১৯শ শতকের মধ্যভাগে বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষা প্রসার আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন বিদ্যাসাগর। সমকালীন সমাজের গতি প্রকৃতি বুঝে তিনি তাঁর আন্দোলনকে পরিচালনা করে ছিলেন। একদিকে সমাজের সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা যাতে অধিক সংখ্যায় শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী হয়ে ওঠে সেই চেষ্টা যেমন করেছেন (বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালনা), অন্যদিকে তেমনি বিত্তহীন দরিদ্র গ্রামবাসীদের মধ্যে স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে চেতনা জাগাতে পল্লী অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন।

বিদ্যাসাগর পরিচালিত বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার

প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

মানবপ্রেমিক বিদ্যাসাগর তাঁর মানসিকতা ও ব্যক্তিত্ব গঠনের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন নিজের পারিবারিক পরিবেশ ও উত্তরাধিকার থেকে। অন্ধ কুসংস্কার, রক্ষণশীলতা, নারী জাতির লাঞ্ছনা, সংস্কৃত কলেজে ছাত্র থাকাকালীন হিন্দু কলেজের আধুনিকতা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ইত্যাদি বৈপরীত্যময় অভিজ্ঞতা লাভের মধ্যে দিয়েই তিনি তাঁর আন্দোলনের রসদ সংগ্রহ করেছিলেন বলে মনে হয়। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রাচীন ঐতিহ্যবোধের সমন্বয় সাধন করে তিনি স্ত্রী শিক্ষা তথা সামাজিক অন্যান্য সংস্কার সাধনের প্রয়াস করেছিলেন।

তাঁর সিদ্ধি বিষয়ে আলোচনার প্রথমেই শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষের উল্লেখ করে বলা যায় যে, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের সুদূর অভ্যন্তরে পর্যন্ত শিক্ষার আলোকবর্তিকা বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন যিনি, তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পল্লীবাংলায় যে সমস্ত বালিকা বিদ্যালয় তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেগুলি সম্পর্কে সরকারী শিক্ষাদপ্তরে সন্তোষজনক রির্পোট পেশ করে তিনি আশাব্যঞ্জক মন্তব্য করেন যে, সব কিছু যদি ঠিক ঠাক চলে তাহলে বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূত্রপাত হতে চলেছে। উত্তরকালে তাঁর সে আশা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক আর্থ সামাজিক নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সমাজে আজ নারীর অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বিদ্যাসাগর স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেই মহৎ উদ্দেশ্যের সিদ্ধিলাভ হয়ত ঘটেছিল তাঁর শেষ জীবনে, যেদিন প্রথম বাঙালী মহিলা চন্দ্রমুখী বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হন। আনন্দের আতিশয্যে অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি চন্দ্রমুখী বসুকে ব্যক্তিগত অভিনন্দনসহ একটি পত্র লিখে এবং তৎসহ এক প্রস্থ শেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী উপহার পাঠিয়ে ছিলেন ; এ বিষয়ে হয়তো তাঁর প্রত্যক্ষ কৃতিত্ব ছিল না। কিন্তু তাঁর পরোক্ষ কৃতিত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে ১৮৬৯ সালের পর থেকে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও আমৃত্যু ঐ বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ ছিল। বিদ্যালয়ের ভাল মন্দ সব ব্যাপারেই তিনি তাঁর পরামর্শ দিয়ে গেছেন আজীবন। স্বয়ং চন্দ্রমুখী বসুই স্ত্রী শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের ঋণ স্বীকার করেছেন। ১৮৯১ সালের ৮-ই আগস্ট বেথুন কলেজে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে মহিলাদের যে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে সভানেত্রীর ভাষণে অধ্যক্ষা (বেথুন কলেজের) চন্দ্রমুখী বসু বলেন, ...” সমগ্র বঙ্গ দেশ তাঁহার নিকট ঋণী। কিন্তু স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারে, ‘বাল বিধবার পুনর্বিবাহের বিধি প্রণয়ন করিয়া বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি কদাচারের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম কবিয়া তিনি বঙ্গ তথা ভারত রমণীকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা আমাদের সর্ব প্রধান হিতাকাঙ্ক্ষী ও হিতকারী হৃদয়বান সুহৃদের স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি” ... ঐ

সভাতেই শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দে প্রস্তাব করেছিলেন যে বেথুন কলেজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন স্মৃতি চিহ্ন রাখার জন্য অর্থসংগ্রহ করা হোক, এবং সভায় উপস্থিত মহিলাবৃন্দ ঐ প্রস্তাব সমর্থন করেন। অতঃপর কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (বসু) বেথুন কলেজই যে বিদ্যাসাগরের স্মৃতি চিহ্ন স্থাপনের সর্বোপযুক্ত স্থান, সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলেন—" বঙ্গরমণীগণ কোথাও যদি তাঁহার স্মৃতি চিহ্ন স্থাপনের বাসনা করেন, তবে সে এই স্থান। যে বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য তিনি জীবনের বিংশতিবর্ষ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, যিনি এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা বেথুনের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া তাঁহার সকল কার্যে সহায়তা করিয়াছিলেন, আমাব একান্ত ইচ্ছা যে, বেথুনের এই সুন্দর চিত্রের দক্ষিণ পার্শ্বে পরলোকগত মহাত্মার একখানি ছবি সন্নিবেশিত হউক, অথবা মহাত্মা বেথুনের প্রস্তর মূর্তির পার্শ্বে তাঁহার আর একটি প্রস্তর মূর্তি স্থাপিত হউক। যে প্রকার স্মৃতি চিহ্নই হউক না কেন, আমার একান্ত ইচ্ছা তাহা এই বেথুন কলেজে যেন সংস্থাপিত হয়।" (বামাবোধিনী—ভাদ্র ১২৯৮, সেপ্টেম্বর ১৮৯১, ৩২০ সংখ্যা ৪র্থ কল্প ৫ম ভাগ)।

সুতরাং বেথুন বিদ্যালযের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যোগ যে কত গভীর ছিল উল্লিখিত বিবরণই তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের ফলে সর্ব প্রকার সামাজিক ও মানসিক কুসংস্কার থেকে তারা নিজেদের মুক্ত করতে পেরেছে কিনা, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও ব্যক্তি স্বাধীনতার চেতনাকে বাস্তবে রূপায়িত করে গার্হস্থ্য জীবনে শুধু ভার্যা ও সন্তান ধারণের যন্ত্রের ভূমিকা থেকে অন্যতর অবস্থার সৃষ্টি করতে পেরেছে কিনা, পূর্বতন সামাজিক অবস্থা থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য নারীর মধ্যে সংগ্রাম মুখীনতা, আত্ম প্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রত্যয় বোধ জেগেছে কিনা, সে সম্পর্কে আদ্যন্ত আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সামগ্রিক বিচারে হয়তো মনে হতে পারে যে শিক্ষার প্রসার ঘটলেও মহিলাদের মধ্যে সার্বিকভাবে কুসংস্কার মুক্ত মানসিকতার প্রকাশ আজও দেখা যায়নি।

কুসংস্কারের মতো নারীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ বা ব্যক্তি স্বাধীনতার চেতনা সমাজের সর্বস্তরে সমানভাবে প্রতিফলিত যে হয়নি তার প্রমাণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের সর্বাপেক্ষা সৎকর্ম বিধবা বিবাহের আইন ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিধিবদ্ধ হয়ে গেলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তার সামাজিক সচলতা আজও হয়নি, এবং এর জন্য পরোক্ষভাবে মেয়েরাও দায়ী। এখানে ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে পুরুষের একাধিক বিবাহ কোথাও প্রকাশ্যে, কোথাও বা গোপনে সংঘটিত হচ্ছে। বঞ্চিতা বা উপেক্ষিতা স্ত্রী স্বামীর এই বিবাহকে সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিষ্ঠা হারাবার ভয়ে কিংবা অর্থকরী কারণে নীরবে মেনে নিয়ে একটা পারস্পরিক আপস করে নিচ্ছেন। যে সব মহিলা এই ধরনের বিবাহিত পুরুষকে বিবাহ করে সমাজে পুরুষের একাধিক বিবাহ প্রথাকে অব্যাহত রেখেছেন, তাদের মধ্যে অনেকেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই তা করেছেন। কোথাও বা পুরুষটি গোপনে দ্বিতীয় বিবাহ করার পর লোক জানাজানি হয়, কিন্তু সেক্ষেত্রেও খুব অল্পসংখ্যক মেয়েই প্রতিরোধ গড়তে এগিয়ে আসেন। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার এও

দেখা যায় যে, হিন্দু আইনে এক স্ত্রী বর্তমানে পুনর্বিবাহ সম্ভব নয় বলে ধর্মান্তর গ্রহণ করেও পুরুষ তার একাধিক বিবাহ বাসনা চরিতার্থ করছে এবং এই ধর্মান্তর গ্রহণ করে বিবাহের ফলে বিবাহার্থিনী মহিলাটিও জানতে পারেন তাঁকে বিবাহেচ্ছুক পুরুষটি বিবাহিত এবং স্ত্রী বর্তমান। তা সত্ত্বেও এই বিবাহ সংগঠিত হয় এবং পুরুষের একাধিক বিবাহ বিরোধী সামাজিক আন্দোলনকে যেন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েই এই প্রথা আজও সমাজের বুকে কম বেশি অব্যাহত আছে।

এই অবস্থারই পরিপ্রেক্ষিতে গার্হস্থ্য জীবন ক্ষেত্রেও নারীর জন্য প্রাচীন কাল হতে নির্ধারিত স্থানের পরিবর্তন কতখানি হয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে যে, সমাজের উচ্চ, মধ্য ও নিম্নবিত্তস্তরে কম বেশি এই পরিবর্তন এসেছে। সমাজের সর্বত্র শিক্ষার প্রসার এখনও হয়নি। শিক্ষাহীন অর্থনৈতিক স্বাধীনতাহীন মেয়েদের বৃহৎ একটা অংশ যে আজও মধ্যযুগীয় অন্ধকারের মধ্যেই জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য। আবার যেখানে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে সেখানেও যে সর্বত্র অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে তাও জোর দিয়ে বলা যায় না। তবে সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে ধীরে ধীরে হলেও চেতনা জাগছে, এবং এজন্য বিজ্ঞানের অগ্রগতি, সামাজিক অগ্রগতি এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন এবং সেই সঙ্গে বিলম্বিত লয়ে হলেও শিক্ষার প্রসারকে অস্বীকার করা যায় না। মেয়েদের সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন ধীর গতিতে হলেও ঘটে চলেছে, এবং এই সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনের পিছনে নারীর সংগ্রামী চেতনার উন্মেষে স্বাধীনতা আন্দোলনেরও প্রভাব রয়েছে। তবে নারীর চিন্তা জগতে সেই উনিশ শতক থেকেই সংগ্রামী মানসিকতার বিকাশ দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। পরবর্তীকালের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতির কারণে সে চেতনা আরও পরিবর্ধিত হয়েছে। শুধু নারী হওয়ার জন্য এখন আর তাকে কোন কিছু থেকে বঞ্চিত হতে হয় না। পুরুষের সমান স্বীকৃতিই সে আজ পেয়েছে—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে সেই স্বীকৃতির বাস্তব প্রয়োগ এখনও সর্বক্ষেত্রে ঘটে না। ২য় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীটার রাষ্ট্রীয় আর্থ সামাজিক মানচিত্রটাই পালটে গেছে। সারা বিশ্বে আজ নারীমুক্তি আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠেছে। এমনই একটি দেশ ফিলিপাইনস। সেখানে ১৯৭০ সাল থেকে শুরু হয়ে গেছে সেখানকার নারীদের আপন অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন। গড়ে উঠেছে বিভিন্ন মহিলা সংগঠন। 'মাকিবাকা' এমনই একটি মহিলা সংগঠন। এই সংগঠন দেশজোড়া গণআন্দোলনের সঙ্গে নারীমুক্তি আন্দোলনকে মিশিয়ে দিয়েছে। যৌথ নারী মঞ্চ গড়ে তুলেছে "গেব্রিয়ালা" নামে আর একটি নারী সংগঠন। নারীর মানবিক—রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার জন্য বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার জন্য গঠিত হয়েছে জাপান, নেদারল্যান্ডস, জার্মানি, আমেরিকা, ফিলিপাইনসের আইনজীবীদের নিয়ে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল, যে ট্রাইব্যুনালের বিচারপতি হলেন একজন ভারতীয়। কানাডার নারীবাদী নেত্রী কেটী বলেন, "..... আমরা সম্মানীয় সেই যুগে পৌঁছে গেছি যখন তৃতীয় বিশ্বের নারীবাদী

আন্দোলন ঘনিষ্ঠভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত।" কেটী আশাপ্রকাশ করেন, "কয়েক বছরের মধ্যে নারীদের দাবিগুলি কেন্দ্রীয় দাবি হিসাবে পরিগণিত হবে এবং তখনই চেনা যাবে তৃতীয় বিশ্বের সামাজিক উৎপীড়নগুলির একটি কেন্দ্রীয় রূপ হ'ল নারীর উপর পুরুষের উৎপীড়ন (Gender oppression)।" ১৯০৮ সালে নিউইয়র্কে নারী দর্জি-শ্রমিকরা নারীদের ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলনে নামে। সেই বীরত্বপূর্ণ আন্দোলনকে স্মরণে রেখে ১৯১০ সালে কোপেনহেগেনে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলন প্রতিবছর ঐ দিনটি পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। মুক্তিসংগ্রামের সপক্ষে ৮ই মার্চ এক বিশেষ দিন বলে উদ্‌যাপিত হয়। বিশ্বের আন্তর্জাতিক নারী মুক্তির অন্দোলনকে সংগঠিত করার অঙ্গীকার নিয়ে এই দিবসটি এক বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে উদ্‌যাপিত হয়।

আমদের দেশেও নারী মুক্তি আন্দোলন এক নতুন মাত্রা নিয়ে হাজির হয়েছে, সামাজিক শোষণ, অত্যাচার, ধর্মীয় উন্মাদনা, পশ্চাৎপদতা, অর্থনৈতিক সঙ্কট, সামন্ততান্ত্রিক বিধিনিষেধের বেড়াজাল আর ক্ষয়িষ্ণু ধনতান্ত্রিক অপসংস্কৃতির জোয়ার থেকে আত্মরক্ষার জন্য, নারীর সমানাধিকারের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাংলা তথা ভারতের নারী সমাজ আজ প্রস্তুতির শপথ নিচ্ছে। ১৯৮৯ সাল নারীর সমানাধিকার ঘোষণার শতবর্ষ পূর্তির বছর। যুগ-পুরুষ, নারী মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আরব্ধ কাজের উত্তরাধিকার আজকের নারী সমাজই লাভ করেছে।

সুতরাং শিক্ষার প্রসারের ফলে নারীর মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রত্যয় বোধ কতখানি জেগেছে তা বিচার করতে গেলে বলা যায় যে, সামগ্রিকভাবে না হলেও নারীর মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রত্যয়বোধ অবশ্যই এসেছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যু হয় ১৮৯১ সালের আগস্ট মাসে। ১৮৯২ সালের মে মাসে 'বামাবোধিনী' পত্রিকার ৩২৮ সংখ্যায় "বঙ্গদেশে স্ত্রী শিক্ষা" শীর্ষক একটি সংবাদ প্রচারিত হয়। সেই সংবাদে বলা হয়েছে—"সরকারী শিক্ষা বিবরণী অনুসারে দেখা যায়, এ বৎসর দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২২৩৮ এবং ছাত্রী সংখ্যা ৭৮,৮৬৫ দাঁড়াইয়াছে। ··· শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর একটি আনন্দকর সমাচার দিয়েছেন যে, গত ১০ বৎসরের মধ্যে শিক্ষার্থী বালকের সংখ্যা দেড়গুণ, কিন্তু বালিকার সংখ্যা প্রায় ৩ গুণ বাড়িয়াছে। পূর্ব বৎসর অপেক্ষা বর্তমান বর্ষে ৮৫ টি স্কুল ও ৫০২ টি ছাত্রী অধিক হইয়াছে। বালিকাদিগের জন্য কলেজ ১টি, উচ্চ বিদ্যালয় ৫টি ও মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ৩টি হইয়াছে। ··· চট্টগ্রামে প্রায় ১০০ স্কুল ও সহস্রাধিক ছাত্রী বাড়িয়াছে। ··· এতদ্‌ভিন্ন বোর্ডের পরীক্ষায় নানা শ্রেণীতে ৪৪টি ছাত্রী বৃত্তিলাভে কৃতকার্য হইয়াছে। জেনানা এজেন্সি ছাড়া আরও কয়েকটি সভা সমিতির উল্লেখ রিপোর্টে আছে যেগুলি স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির সহায়তা করিয়াছেন, সেগুলি হল—উত্তরপাড়া হিতকারী সভা, মধ্য বাঙলা সম্মিলনী, যশোদা খুলনা সম্মিলনী, টাকী হিতকারী সভা, ফরিদপুর সুহৃদ সভা। ··· জুনিয়র ও সিনিয়র ছাত্রী

বৃত্তি পরীক্ষার ব্যবস্থাও এই সভাগুলি করিয়াছে। ... ডুমরাওন ও ছোটনাগপুরের মহারাজা স্ত্রী শিক্ষার পরিপোষক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে অনেক রায়বাহাদুর, রাজা মহারাজা হইয়াছেন তাঁহারা এ হিতকর কার্যে মনোযোগী হন না কেন ? ... চিকিৎসাবিদ্যাতেও স্ত্রী লোকেরা পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতেছেন। মেডিকেল কলেজ ও কাম্বেল মেডিকেল স্কুল হইতে মোট ১৫ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং কেহ কেহ বিশেষ প্রশংসাও লাভ করিয়াছেন। ইহারা ডাক্তার হইয়া বেশ ১০ টাকা উপার্জন করিতেছেন। স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির এ একটি নতুন দ্বার উদঘাটিত হইয়াছে। স্ত্রী চিকিৎসকের যথেষ্ট অভাব আছে, আমরা আশা করি ক্রমশ চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার্থিনীর সংখ্যাও অধিক হইতে থাকিবে। তারপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর আটবছর পরে ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত বামাবোধিনী পত্রিকার আর একটি সংবাদে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার সম্পর্কে বলা হয়েছিল—"আজি সমগ্র বঙ্গদেশে বালিকাদের জন্য প্রবেশিকা বিদ্যালয় ৭, মধ্য বাঙলা বিদ্যালয় ২২, উচ্চ প্রাইমারি ১৭০, নিম্ন প্রাইমারি ২৬১৮, ছাত্রী সংখ্যা ৫৮,৮০৭। বাঙালীর স্ত্রীলোকের সংখ্যা (কুচবিহার-ছোটনাগপুরও কুমিল্লা ব্যতীত) ৩,৬৭,৩০,৯৪৮। সর্বনিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার গণনা করিলে বঙ্গদেশে-১,০৪,৮১৫ টি বালিকা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে। অন্তঃপর স্ত্রী শিক্ষা সম্মিলনী অল্প উপকার করিতেছে না। ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ২৮,৬৯,০৫,৪৫৬, তম্মধ্যে বর্ণজ্ঞান বিশিষ্টের সংখ্যা ১,২০,৭১,২৪৯, ইহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৫,৪১,৬২৮। স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে পুরুষ শিক্ষাব ন্যায় তেমন আয়োজন নাই। অথচ বঙ্গদেশে শিক্ষিতা অন্তঃপুরিকাগণের সংখ্যা ব্যতীত এক লক্ষ বালিকা শিক্ষালাভ করিতেছে, ইহা বাঙলার পক্ষে অল্প আনন্দের বিষয় নহে। বঙ্গ মহিলাগণের মধ্যে পাঁচটি এম এ ও আঠারোটি বি এ আছেন, ইহা গর্বের বিষয় মনে করিলে ভরসা করি আমরা অপরাধী হইব না।"

সংখ্যাগত হিসাবে কিছু গরমিল থাকলেও বামাবোধিনী'তে প্রকাশিত স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার সম্পর্কিত বিবরণী দুটি পাঠ করে দেখতে পাচ্ছি বঙ্গদেশে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার দ্রুতলয়ে না হলেও সেই সময়ের তুলনায় যথেষ্টই হয়েছে, এবং এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অবদানও যে যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে এবিষয়েও সন্দেহ করার কারণ নেই। কারণ বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের কাজে তিনি যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন সে বিষয়ে আমরা সকলেই অবগত। প্রত্যক্ষ না হলেও বিদ্যাসাগরের পরোক্ষ ভূমিকার কাছে আমাদের মাথা নোয়াতেই হবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমকালীন যাঁরা ছিলেন তাঁরাও যেমন তা স্বীকার করেছিলেন, তাঁর পরবর্তীকালও তা স্বীকার করেছেন। বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষা প্রসার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়ে 'সোমপ্রকাশ পত্রিকায়' ১৮৬৬ সালে জনৈক পত্র লেখক লিখেছিলেন,"ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্ত্রী শিক্ষার একজন প্রধান উদ্যোগী, বঙ্গদেশে তাঁহার ন্যায় কেহই এবিষয়ে অধিকতর কাজ করিতে পারেন না" ডি পি আই রিপোর্ট (১৮৭১-৭২) R L Martin বিদ্যাসাগর মহাশয়কে "The Great advocate of Female

education"—বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। সুতরাং তাঁর মৃত্যুর পর অনতিকালের মধ্যে বাংলাদেশের স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের পরিমাণগত যে চিত্রটি 'বামাবোধিনী' উপস্থাপিত করেছেন—সেই চিত্রটি রচনার প্রধান শিল্পী যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর,—বাংলাদেশে নারী শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসই তার সাক্ষী।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিশেষ তথ্য এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি। গত ১৯-২-৮৯ তারিখে বীরসিংহ গ্রামে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গিয়ে সেখানে বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দির দর্শন করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আরও মহোত্তর ধারণা নিয়ে ফিরেছি। সেখানে নিজের পৈতৃক গৃহ-সংলগ্ন জমিতে তিনি যে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন (ভগবতী বিদ্যালয়-১৮৯০) সেই বিদ্যালয়ের একটি ঘরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি বইয়ের আলমারি সযত্নে রক্ষিত আছে। আনুমানিক শতাধিক বই ঐ আলমারিতে আছে। সোনার জলে নামাঙ্কিত সযত্নে বাঁধানো বইগুলোর মধ্যে জীর্ণ দশাপ্রাপ্ত "রাঘব পাণ্ডবীয়ম" বইটিও আছে যেটা তিনি সব সময়ই ব্যবহার করতেন বলে উল্লেখ করা আছে (বইটির মলাটে সাঁটা এক টুকরো কাগজে লেখা আছে) আর আছে শেক্সপীয়র, স্কট, বাযবন, কীটসের সমগ্র রচনা সংগ্রহ, আছে বিদেশী ঐতিহাসিকদের লেখা ইতিহাসের একাধিক বই ভূগোলের বই, কিছু রসায়নের বইও দেখেছি। আজীবন শিক্ষক বিদ্যাসাগরের এসব সংগ্রহ দেখে আশ্চর্য হওয়ার কথা নয় ; কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় যখন দেখি ঐ সংগ্রহের মধ্যে ইংরাজীতে অনূদিত সযত্নে বাঁধানো সমগ্র কোরান শরিফও শোভা পাচ্ছে। সংস্কৃতজ্ঞ গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পল্লীগ্রামস্থ গৃহের অভ্যন্তরে সংস্কৃত গ্রন্থের সঙ্গে ইসলাম ধর্মগ্রন্থও সমাদরে রাখা আছে। কতখানি সংগ্রামী, সংস্কারমুক্ত এবং বিপ্লবী মানসিকতার অধিকারী হলে সেদিনের সমাজে এ ঘটনা সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়। সংস্কারক বিদ্যাসাগরের মানসিকতা যে কতখানি সংস্কার মুক্ত ছিল—চিন্তা ও কাজের মধ্যে কতখানি সামঞ্জস্য ছিল—সোনার জলে নামাঙ্কিত সেই কোরান শরিফটাই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সত্যই তিনি "দেশাচারের নিতান্ত দাস ছিলেন না, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত" যা উচিত বা আবশ্যক মনে করতেন, তা করতেন, "লোকের বা আত্মীয়-কুটুমের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হয়েন না।" শুধু প্রাচ্য—পাশ্চাত্য নয়, মনে হয় পৃথিবীর সব সভ্যতারই সমন্বয় সেতুরূপে তিনি সেদিনের জাতপাতগত সঙ্কীর্ণতা জীর্ণ-সংস্কারদীর্ণ সঙ্কীর্ণ বাঙালী সমাজে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তিনি তাঁর যুগের থেকে অনেক বেশি অগ্রসর ছিলেন। জজ দ্বারকা মিত্রের এজলাসে এক ভ্রষ্টানারীর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মামলায় বিদ্যাসাগরের মতামত চাওয়া হয়। প্রচলিত হিন্দু আইনে নারী ভ্রষ্টা হলে স্বামীর সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। বিদ্যাসাগর জানতে চাইলেন স্বামীর সম্পত্তি পাওয়ার আগে সে ভ্রষ্টা হয়েছে কিনা। তাঁকে জানানো হয় তার অনেক আগে থেকেই রমণীটি তাঁর স্বামীর সম্পত্তি ভোগ করছেন। তখন বিদ্যাসাগর তাঁর মত দিলেন,"সম্পত্তির অধিকার একবার কোন বিধবা নারী যদি লাভ করে, পরবর্তীকালে সে ভ্রষ্টা হয়েছে, এই অজুহাতে সে

অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা যায় না।" তাঁর সেই বৈপ্লবিক মতামতে সেদিনের হিন্দুসমাজে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

বিদ্যাসাগরের সংস্কারমুক্ত উদার মানসিকতা ও বৈপ্লবিক কর্মধারা বাংলাদেশে এমন প্রভাব ফেলেছিল যে, যে কোন সংস্কারমুক্ত দুঃসাহসিক কাজ বা উক্তি কিংবদন্তী মত বিদ্যাসাগরের নামেই যুক্ত করে দেওয়া হত। সেই সময়ের কলকাতা শহরের প্রসিদ্ধ বারাঙ্গনা হীরা বলুবুলের সন্তানকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করা নিয়ে সমাজে যে ঝড় উঠেছিল, সে সম্পর্কে বিদ্যাসাগরকে প্রশ্ন করা হলে বিদ্যাসাগর নাকি বলেছিলেন, "মা বারাঙ্গনা হলে সন্তানের অপরাধ কোথায়? সে কেন শিক্ষালাভে বঞ্চিত হবে?" বিদ্যাসাগরের এই উক্তির কোন প্রামাণিক তথ্য নেই, শুধুই মুখে মুখে শোনা, সত্যকার ভিত্তি কিছু আছে কিনা এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের উপরোক্ত মন্তব্য সত্য না হলেও এ ধরনের মন্তব্য করার মতো মানসিক দৃঢ়তা এবং উদারতা যে তাঁর ছিল—এসম্পর্কে মতদ্বৈধ থাকতে পারে না। এই হলেন বিদ্যাসাগর—সর্বসংস্কারমুক্ত, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগর। "একদিকে স্বার্থপরতা, জড়তা, মূর্খতা ও ভণ্ডামি—অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে বিধবাদিগের উপর সমাজের অত্যাচার, পুরুষের হৃদয় শূন্যতা, নির্জীব জাতির নিশ্চলতা— অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর: একদিকে শত শত বৎসরের কুসংস্কার ও কুরীতির বল, উপধর্মের উৎপীড়ন, অপ্রকৃত হিন্দুধর্মের গণ্ডমূর্খ ও স্বার্থপর ভট্টাচার্যদিগের মত, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে নির্জীব, নিশ্চল, তেজোহীন বঙ্গসমাজ, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।" বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের এই ঐতিহাসিক উক্তির আর কোন বিকল্প হতে পারে না বলে মনে হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথায় বিদ্যাসাগর ছিলেন সত্যই "আমাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বাঙালী যাঁর মধ্যে ভারতীয় ঋষির প্রজ্ঞা, ইংরাজের কর্মশক্তি এবং বাঙালী মায়ের হৃদয়ের প্রতিফলন ঘটেছিল।"

নির্দেশিকা

১। প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য—সুকুমারী ভট্টাচার্য, ৩১,৩৪।

২। Proceedings of the Lieutenent Governor of Bengal education department,July 1862,no7&8,3&4.

৩। ফিলিপিনসের নারী আন্দোলন—মহুয়া হালদার, অজন্তা সরকার—'প্রতিবিধান' দ্বিমাসিক মহিলা পত্রিকা, ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-১৯৮৮।

৪। বামাবোধিনী পত্রিকা—কার্তিক-অগ্রায়ণ ১৩০৬ (১৮৯৯) ৬ষ্ঠ কল্প, ৪র্থ ভাগ, ৩৭ বর্ষ ৪১৮-১৯ সংখ্যা (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৌজন্যে)।

৫। সোমপ্রকাশ পত্রিকা, ৩ পৌষ ১২৭৩ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৌজন্যে)।

৬। Unpublished letters of Vidyasagar-edited by Arabinda Guha-page : 39 (Introduction).

বাঙালীর ভাষা ও সংস্কৃতির ভগীরথ

বিদ্যাসাগর-জীবন প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর কর্মে — তাঁর রচনায়।

তাঁর রচিত শিশু পাঠ্য 'বর্ণ পরিচয়' পুস্তক থেকে শুধু বাংলা বর্ণের পরিচয়ই পাওয়া যায় না, সেই সঙ্গে রচয়িতার চারিত্রিক বর্ণেরও পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের চারিত্রিক রূপ প্রতিবিম্বিত হয় তার কর্মের মধ্যে। বৃহৎ কর্মের মধ্যেই যে মানুষের মহত্ব সব সময়ে ধরা পড়ে তা নয়, বরং ক্ষুদ্র কর্মেই মানুষের স্বাভাবিক চিত্ত প্রকৃতি সত্যরূপে প্রকাশ পায়। বর্ণ পরিচয় একটি ক্ষুদ্র পুস্তক। আর তার মধ্যেই বিদ্যাসাগরের চরিত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়েছে। বইটির বিজ্ঞাপনের মধ্যেই বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারার স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠেছে। সেখানে তিনি বলেছেন, "বর্ণ পরিচয়ের প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। বহুকাল অবধি বর্ণমালা ষোল স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জন, এই পঞ্চাশ অক্ষরে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বাংলা ভাষায় দীর্ঘ ঋ-কার ও দীর্ঘ ঌ-কার এর প্রয়োগ নাই, এই নিমিত্ত ঐ দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে অনুস্বার ও বিসর্গ স্বরবর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এজন্য ঐ দুই বর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। ...... ক ও ষ মিলিয়া ক্ষ হয়, সুতরাং উহা সংযুক্ত বর্ণ, এ জন্য অসংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের গণনা স্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে।" এই পংক্তিগুলির মধ্যে বিদ্যাসাগরের মনন স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ সুস্পষ্ট। বাংলা বর্ণমালার এই সংস্কার সাধন ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ....'ক্ষ' যে আসলে একটি যুক্তবর্ণ এ কথা স্বীকার করেও রামমোহন চিরাগত প্রথার অনুসরণে 'ক্ষ' কে অযুক্ত ব্যঞ্জনের তালিকায় স্থান দিয়েছেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কারও তাঁর 'শিশু শিক্ষা" পুস্তকে 'অনুস্বার' - 'বিসর্গ'কে স্বর এবং 'ক্ষ' কে অযুক্ত ব্যঞ্জন বলে গণ্য করেছেন। এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরই প্রথম স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিলেন। চিরাগত প্রথাকে স্বাধীন চিন্তার ও যুক্তি-বুদ্ধির কষ্টি পাথরে যাচাই করে নেওয়ার মানসিকতাই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কত ছোট ছোট বিষয়েও তিনি কত চিন্তাভাবনা করেছেন — তা জানা যায় এসম্পর্কে তাঁর উক্তি থেকে, "প্রায় সর্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, বালকেরা অ-আ-এই দুই বর্ণকে স্বরের অ, স্বরের আ বলিয়া থাকে। যাহাতে তাহারা সে রূপ না বলিয়া, কেবল অ, আ — এইরূপ বলে, তদ্রুপ উপদেশ দেওয়া আবশ্যক।

যে সকল শব্দের অন্ত্য বর্ণে আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ এই সকল স্বর বর্ণের যোগ নাই উহাদের অধিকাংশ হলন্ত কতকগুলি অকারান্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা, হলন্ত — গজ, ঘট, জল, পথ ইত্যাদি : অকারান্ত — ছোট, বড়, ভাল ঘৃত ইত্যাদি। কিন্তু অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, এই বৈলক্ষণ্যের অনুসরণ না করিয়া,

তাদৃশ শব্দমাত্রেই অকারান্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে। বর্ণ যোজনার উদাহরণ স্থলে যে সকল শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে যেগুলি অকারান্ত উচ্চারিত হয়, উহাদের পার্শ্বদেশে * এইরূপ চিহ্ন যোজিত হইয়াছে। যে সকল শব্দের পার্শ্বদেশে তদ্রূপ চিহ্ন নাই, উহারা হলন্ত উচ্চারিত হইবে।" এখানে লক্ষণীয় এই যে, বর্ণ ও শব্দের দৃষ্ট রূপের চেয়ে তার উচ্চারিত রূপের প্রতি তাঁর মনোযোগ বেশি বই কম ছিল না। শিশু শিক্ষার প্রতি তাঁর গভীর সতর্কতা ও শিশুচিত্তের প্রতি তাঁর মমতা কত গভীর ছিল তার প্রমাণ রয়েছে বর্ণ পরিচয় ২য় ভাগের বিজ্ঞাপনে। তিনি লিখেছেন "বালকদিগের সংযুক্ত বর্ণপরিচয় এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সংযুক্ত বর্ণের উদাহরণ স্থলে যে সকল শব্দ আছে, শিক্ষক মহাশয়েরা বালকদিগকে উহাদের বর্ণ বিভাগ মাত্র শিখাইবেন, অর্থ শিখাইবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবেন না। বর্ণ বিভাগের সঙ্গে, অর্থ শিখাইতে গেলে গুরু শিষ্য উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ কষ্ট হইবেক, এবং শিক্ষা বিষয়েও আনুষঙ্গিক অনেক দোষ ঘটিবেক। ক্রমাগত শব্দের উচ্চারণ ও বর্ণ বিভাগের শিক্ষা করিতে গেলে অতিশয় নীরস বোধ হইবেক ও বিরক্তি জন্মিবেক। এ জন্য মধ্যে মধ্যে এক একটি পাঠ দেওয়া গিয়াছে। অল্প বয়স্ক বালকদিগের সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয় এরূপ বিষয় লইয়া, ঐ সকল পাঠ অতি সরল ভাষায় সঙ্কলিত হইয়াছে। শিক্ষক মহাশয়েরা উহাদের অর্থ ও তাৎপর্য ছাত্রদিগকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবেন।" বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সময় একথা বর্ণ পরিচয়ের বিজ্ঞাপনে লিখছেন সে সময় "Child Psychology" এবং Child Centric Education — এর কথা বাংলাদেশের কোন মানুষ চিন্তাও করতে পারতেন না। সুতরাং এ থেকেই বোঝা যায় বিদ্যাসাগর তাঁর যুগ থেকে কতখানি এগিয়ে ছিলেন, "বহমান কাল গঙ্গার সঙ্গে তাঁর জীবন ধারার কতখানি মিল ছিল ; এই জন্যই তিনি ছিলেন আধুনিক।"

"বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন, দেশটাকে ধোঁয়ার রাজ্য, স্বপ্নের রাজ্য, কল্পনার রাজ্য থেকে তুলে এনে মাটির পৃথিবীতে বাস্তব জগতে দাঁড় করাতে। তাই তিনি অপার্থিব পৌরাণিক কাহিনীর ছায়াও মাড়াননি। এমনকি অনেকটা ঐ কারণে তাঁর 'আখ্যান মঞ্জরী'তে ভারতীয়দের কথাও নেই। অনেকের কাছে হয়তো এটা বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে। কিন্তু তখন যে প্রাণের দায় — স্বপ্ন দেখার কল্পনাকে প্রশ্রয় দেওয়ার সময় নয়। শিক্ষার্থীদের খেলায় গল্পে-চিত্রে-গানে শিক্ষিত করে তোলা যেমন সত্যকারের শিক্ষা পদ্ধতি, মনের পূর্ণ বিকাশই হল শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য, সেদিন তেমনি সত্য ছিল বিদ্যাসাগরের এই বোধ — ধোঁয়ার রাজ্য থেকে জীবনের রাজ্যে দেশকে আনতে হবে, আজও সে প্রয়োজন যে আমাদের শেষ হয়নি — তা সকলেই জানে।"

"কেবল মনোরঞ্জনের নিমিত্ত শিশুগণের উন্মেষোন্মুখ চিত্তে কোন প্রকার কুসংস্কার সঞ্চারিত করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। এ নিমিত্ত হংসীর স্বর্ণ ডিম্ব প্রসব, শৃগাল ও সারসের পরস্পর পরিহাস - নিমন্ত্রণ, ··· পুরস্কার লোভে বক কর্তৃক বৃকের কণ্ঠবিদ্ধ অস্থিকাণ্ড বহিষ্করণ, ধূর্ত শৃগালের কপট স্তবে মুগ্ধ হইয়া কাকের স্বীয় মধুর সুরের পরিচয় দান প্রভৃতি অসম্বন্ধ অবাস্তবিক বিষয় সকল প্রস্তাবিত না করিয়া

সুসম্বন্ধ নীতি গর্ভ আখ্যান সকল সম্বন্ধ করা গেল।" শিশুদের উন্মেষোন্মুখ মনকে সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও দুর্নীতিহীন জাগতিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানে পুষ্ট করা ও তাদের কাছে চারিত্রিক আদর্শস্থাপন, এই ছিল মদনমোহন ও বিদ্যাসাগর উভয়েরই লক্ষ্য। শুধু জ্ঞান দান নয়, চরিত্রদানও ছিল উভয়ের অভিপ্রেত।

সেযুগে কলকাতার সামাজিক আবহাওয়ায় অশালীনতার প্রকাশ প্রবল ছিল। শিশুমনে প্রথম থেকেই সুস্থ ও শোভন ব্যবহারের নীতি গ্রথিত করা দরকার, একথা নিশ্চয়ই বিদ্যাসাগরের মনে হয়েছিল। তাই পরবর্তী সংস্করণগুলিতে তিনি গোপাল ও রাখালের গল্প জুড়ে দিয়েছেন। নীতি কথাগুলি গল্পের মধ্যে দিয়ে যাতে শিশু মনে গেঁথে যায় সেজন্যই গল্পচ্ছলে নীতিকথাগুলি বলেছেন। বর্ণ পরিচয় ২য় ভাগে শিশুর ভবিষ্যৎ চরিত্র গঠনে তার অভিভাবকদের দায়িত্বও যে যথেষ্ট সে কথাও বলেছেন তিনি ভুবনের মাসির কথা বলতে গিয়ে। শিশুকে ঠিক মত গড়ে তুলতে হলে, তার সুষ্ঠু মানসিক বিকাশ ঘটাতে হলে অর্থাৎ শিশুর সুষ্ঠু ব্যক্তিসত্তা গঠনে শিশুর অভিভাবকদের ভূমিকা যে অনেকখানি, শুধুমাত্র স্নেহ নয় শিশুকে মানুষ করতে হলে যে শাসনও দরকার সামাজিক ভাল মন্দ সম্বন্ধে তাকে ওয়াকিবহাল করা দরকার এ বোধ অধিকাংশ অভিভাবকেরই থাকে না, বিদ্যাসাগর তা জানতেন বলেই তাঁর শিশু পাঠ্য পুস্তকগুলিতে বর্ণ পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে শিশু চিত্তের শোধনের সঙ্গে শিশুকে পড়াতে গিয়ে তার অভিভাবকদেরও চিত্ত-শুদ্ধির ব্যবস্থা রেখেছিলেন। মানব মন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা তাঁর গভীর ছিল এটা তারই প্রমাণ।

এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিদ্যাসাগরকে চিনতে, তাঁকে গভীর ভাবে জানতে গেলে বোধ করি এই কাহিনী সকলেরই জানা দরকার।

অনেকে বলে থাকেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ প্রচেষ্টাও নাকি তেমনভাবে সফল হয়নি। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত শারদীয় 'বারোমাস' পত্রিকায় শ্রীমতী কল্যাণী দত্ত লিখিত একটি ঘটনা এখানে বিবৃত করা হল : শ্রীমতী দত্ত বলেছেন — ১৮৫৬ সালের পর থেকে ১৮৯১ সালে বিদ্যাসাগরের মৃত্যু পর্যন্ত মোট কতগুলি বিধবার বিয়ে তিনি দিয়েছিলেন, কি তাঁদের নাম বা পরিচয় তা সম্ভবত আজও সংগ্রহ করা যায়নি। এরকম দুটি পরিবারের কথা লেখিকার জানা আছে। তার একটি তিনি বিস্মৃত হয়ে গেছেন, তবে অন্যটি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ তিনি দিয়েছেন। এই বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, এই বিধবা বিবাহের ঘটনার মধ্যে দিয়ে দুটি দিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, একটি হলো সেদিনের বালবিধবা নারীর পরবর্তী জীবনের বহু বিশিষ্ট দিক যেমন উন্মোচিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি অন্তত একটি বিধবা বিবাহের ক্ষেত্রে যে বিদ্যাসাগর হিন্দু বিবাহের আচার অনুষ্ঠানের তোয়াক্কা করেননি তার পরিচয় পাওয়া যায়।

যাঁর জীবনের কথা লেখিকা বলেছেন তিনি লেখিকার পিসিমা, নাম শিবমোহিনীদেবী। জন্ম ১৮৫২ সাল। পিতার নাম চণ্ডীচরণ দত্ত মুন্সি। হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে

নিবাস। প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক, তদুপরি উত্তর বিহারে জজিয়তি ও পোস্ট মাস্টারের কাজও করেছিলেন। দশ বছর বয়সে শিবমোহিনীর প্রথম বিবাহ হয়। কিন্তু দু'বছরের মধ্যে বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসেন। সেমিজ ছাড়া এক কাপড়ে থাকা, খালি মেঝেতে শোওয়া, নির্জলা উপবাসে একাদশী করা ইত্যাদি বিধি নিয়মে শিবমোহিনীর জীবন অসহ্য হয়ে ওঠে। এই সময় প্রতিবেশী কন্যা হেমাঙ্গিনীর পিতা সপরিবারে ব্রাহ্ম ধর্ম নেওয়ার জন্য কলকাতায় চলে যাওয়া স্থির করেন। হেমাঙ্গিনী শিবমোহিনীকে তাদের সঙ্গে কলকাতা যাওয়ার পরামর্শ দেন। কলকাতায় তখন বিদ্যাসাগর মশাই বিধবাদের বিয়ে দিচ্ছেন, তাই নিয়ে তুমুল কাণ্ড হচ্ছে — এসব কথা তখন গ্রামেও আলোচনা হতো। প্রতিবেশী পরিবারের সঙ্গে কলকাতায় গঙ্গা স্নানে যাবেন এই কথা পিতাকে বলে শিবমোহিনী বন্ধুর পরিবারের সঙ্গে গোপনে কলকাতায় চলে আসেন। একদিন হেমাঙ্গিনী শিবমোহিনীকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বাড়ির রোয়াকে বসে আছেন, বাজার থেকে ফিরে বিদ্যাসাগর তাঁদের দেখে বলে ওঠেন, "ওরে দেখবে, আজ আবার কারা দুটো মেয়েকে বসিয়ে রেখে চলে গেছে।" হেমাঙ্গিনী বলেন, "বাবা, দুটো নয়, একটা। আর শিবমোহিনী লজ্জায়-ভয়ে কেঁদে ফেললেন। তাদের মুখে সব কথা শুনে বিদ্যাসাগর বললেন, 'দেখ, আমি বিধবাদের বিয়ে দিচ্ছি সত্যি কথা। কিন্তু আমি খুব ব্যস্ত মানুষ। যা দেখছি, ভাল ঘরে বিয়ে করে ঘরসংসার করতে চাইলে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হবে। বাড়িতে না বলে তুমি এসেছ, ফেরার তো কোন পথ নেই, আমার বাড়িতেই থাক। পরে দেখা যাবে।"

১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহ আইন প্রচলিত হওয়ার পরে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে বহু বিধবার বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সেসব বিবাহের পরবর্তী অভিজ্ঞতা বিদ্যাসাগরকে বিব্রত ও বিপন্ন করে। বর্ণ হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধতা খুব কিছু হ্রাস পায়নি। আর বহু অর্থব্যয়ে বিদ্যাসাগর যাঁদের বিবাহ দিতে পেরেছিলেন, তাঁরাও অনেকেই ঠিক নিরাপদ দাম্পত্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত হননি। পাত্ররা অনেক সময় এমন ভয় দেখাতেন যে, বিদ্যাসাগর আরও টাকা না দিলে তাঁরা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করবেন। এমন ঘটনাও বিরল নয় যে একাধিক স্ত্রী বর্তমানে তাদের স্বামী বিদ্যাসাগরকে ঠকিয়ে তাঁর দেওয়া যৌতুক নিয়ে বিধবা বিবাহ করেছেন। কিছুকাল পরে বিদ্যাসাগর শিবমোহিনীকে বলেন, 'দেখ, বিয়ের সময় আমি অনেক টাকা দিই। অনেক ছোকরা তাই নিয়ে বিয়ের পরেই পালিয়ে যায়। তোমার জন্য ছোকরা পাত্তর খুঁজবো না। একটি দোজবরে ভালো পাত্র আছে। তুমি যদি সংসার করতে চাও তাহলে তার সঙ্গেই বিয়ে দিতে ইচ্ছে করি। 'শিবমোহিনী সম্মত হলে বিদ্যাসাগরমশাই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে চণ্ডীচরণ সিংহের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। চণ্ডীচরণ কেশব সেনের ভক্ত এবং একান্ত অনুগত ছিলেন। কোচবিহার বিবাহের ঘটনার (১৮৭৭) পূর্বেই শিবমোহিনীর বিয়ে হয়েছিল। শিবনাথ শাস্ত্রীকে তিনি বহুবার দেখেছেন এবং তাঁর ভক্তও ছিলেন।

বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তনের সময় বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহে হিন্দু মত এবং হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলাকেই সমর্থন জানান। আইনটির বিধি ব্যবস্থায় বিদ্যাসাগরের বক্তব্যই প্রাধান্য পেয়েছিল। আইনটি গঠনের জন্য যে সিলেক্ট কমিটি কাজ করেছিল, তা 'ইয়ং বেঙ্গল' প্রস্তাবিত রেজিস্ট্রি বিবাহের সুযোগ রাখার ব্যাপারটা বর্জন করে। বহু বঞ্চনা-বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা পেরিয়ে বিদ্যাসাগরই আবার সিভিল বিবাহ আইনের এক্তিয়ার কিছুটা বাড়িয়ে হিন্দু বিধবাদের বিবাহের আনুষ্ঠানিক ব্যাপাবটার সরলীকরণ চেয়েছিলেন। (দ্রষ্টব্য : বিদ্যাসাগর চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ২৫৭-২৫৮)

গত শতাব্দীর ৬০/৭০ দশকে কেশব সেনের অনুগামী তরুণ ব্রাহ্মরা বিয়ের ব্যাপারে সবরকম আচার-অনুষ্ঠান বর্জনে আগ্রহী হয়েছিলেন। তেমন কিছু বিবাহও সে সময় সম্ভব হয়। তরুণ ব্রাহ্মদের চাপেই ১৮৭২ সালে সিভিল বিবাহ আইন পাস হয়। শিবমোহিনীর বিবাহের ব্যাপারে বিদ্যাসাগর সেই বিবাহে ওই তরুণ ব্রাহ্মদের পথের অনুসারী ছিলেন। সে বিবাহ হিন্দু মতে হয়নি এবং বিদ্যাসাগর শিবমোহিনীকে সম্প্রদান করেননি। কিন্তু কেশব সেনের অনুগত এই চণ্ডীচরণ সিংহকে বিদ্যাসাগর নিজেই পাত্র হিসাবে নির্বাচন করেন এবং নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিবাহ দেন। বিবাহের সময় কন্যাপ্রতিম 'শিবু' কে মোটা অমৃতি পাকের বালা ও গলায় হার, খাগড়ার সর্বসুন্দরী ঘড়া, কামরাঙা বাটি, মেদিনীপুরের বেলের গড়নের ক্ষীর — খাবার বাটি, যাজ পুরী কাঁসি, নবাসনের থালা, পানের বাটা, ভাল যাঁতি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "দেখ শিবু, আমার ইচ্ছেমত তোমায কিছু জিনিস দিলাম, তুমি যেন ওখানে গিয়ে আমার বাবা এত দিয়েছে, অত দিয়েছে বলে বড়াই করো না।" যদিও মনে হয় ঐ বিবাহ তরুণ ব্রাহ্ম সমর্থিত ব্যবস্থা অনুযায়ী হয়েছিল, তবুও এটাও ঠিক যে সেরকম কোনো বিবাহে ঈশ্বরচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন — তেমন উল্লেখ সম্ভবত তাঁর কোনো জীবনীতে নেই।

গ্রামের এক বাল বিধবার অসহায় করুণ জীবন বিদ্যাসাগরের সস্নেহ সাহায্যে কেমন বদলে ছিল, সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখিকা বলেছেন, চণ্ডীচরণ সিংহের সঙ্গে শিবমোহিনীর বিবাহেব আগে শিবমোহিনী কিছুকাল বিদ্যাসাগরের কাছেই ছিলেন। সংসারের নানা খুঁটিনাটি কাজ তিনি বিদ্যাসাগরের কাছেই শিখেছিলেন, কারণ বিদ্যাসাগর অনেক কাজই নিজের হাতে করতেন। বঁটিতে ফল কেটে মিষ্টি সাজিয়ে এবং যাঁতিতে সুপুরি কেটে টাটকা পান সেজে অতিথিকে খেতে দিতে শিখিয়েছিলেন। খাবারের হাঁড়ির তলায় বিঁড়ে রাখা, সন্দেশের হাঁড়ির মুখে পাতলা নাকড়া বেঁধে ক্ষুরো বসিয়ে জলভরা কাঁসিতে মিষ্টি রাখা — এসব কাজ তিনি শিবমোহিনীকে শিখিয়েছিলেন। খাওয়ার পরেই জল খাবারের রেকাবি মেজে রোয়াক ধুয়ে ঝাঁটা রাখতে হতো। একবার রোয়াক ধুয়ে, ঝাঁটা ফেলে রেখেছিলেন বলে, বিদ্যাসাগরের কাছে তিরস্কৃত হয়েছিলেন। কাঠির ঝাঁটা জল ঝড়া দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখলে নোংরা জমে না — বলেছিলেন বিদ্যাসাগর। সামান্য দড়ি, পুরনো কাগজ,

খাম কিছুই ফেলতেন না তিনি, সব গুছিয়ে রাখতেন। কলম ও দোয়াত দান ঝক ঝক করতো, মহারানী ভিক্টোরিয়ার ছাপ দেওয়া পোস্ট কার্ড, নানা মাপের কাগজ — সব তিনি নিজের হাতে গুছিয়ে রাখতেন। বইয়ের আলমারিতে দোক্তাপাতা আর নিম পাতা দেওয়া থাকতো। নিত্য সেই মানুষটার কাছ থেকে শিবমোহিনী এই ধরনের নানা কাজে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। শিবমোহিনীর কাজে ছিল তাঁর বসার ঘর গুছিয়ে রাখা। বিদ্যাসাগরের দান-ধ্যান করার অভ্যাসটিও তিনি অর্জন করেছিলেন। আদরের 'শিবু' কে তিনি হাতে ধরে পান সাজা শিখিয়েছিলেন। আম কিভাবে রাখলে ঠিক থাকবে তা'ও শিবমোহিনীকে বিদ্যাসাগর শিখিয়েছিলেন। সকল ফল ডালে, আম খাবে পালে" — আম্ররসিক বিদ্যাসাগর এই সব শিক্ষাও দিয়েছিলেন শিবমোহিনীকে।

বিবাহের পরে শিবমোহিনী স্বামীর প্রথম পক্ষের সবক'টি সন্তানকে মাতৃস্নেহে পালন করেছিলেন, এমন কি তাদের সন্তানদেরও তিনি মানুষ করেছিলেন। তিনি নিজে নিঃসন্তান ছিলেন। ডাক্তার সুন্দরী মোহনদাসের কাছে তিনি ধাত্রী বিদ্যা শিখেছিলেন নিপুণভাবে। সুন্দরীমোহন ধাত্রীদের জন্য যে রোজ-নামচা লিখেছিলেন, তার চারটি ঘটনা তাঁকে শিবমোহিনী দিয়েছিলেন। সেকালে ধাত্রীর কাজ নিন্দিত ছিল, কিন্তু শিবমোহিনী নিন্দার পরোয়া করতেন না। খবর পেলেই রোগী কিম্বা প্রসূতির কাছে ছুটে যেতেন। কুমারী কিংবা বিধবা মেয়েদের সন্তান সম্ভাবনা হলে, সেই সন্তান বিনষ্ট করাই তখন সমাজের নিয়ম ছিল। শিবমোহিনী সেই সংবাদ পেলেই ছুটে যেতেন। দুটি অবৈধ সন্তানকে তিনি মানুষ করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেন। চুল বাঁধা, কাপড় পরা, রোগীর শুশ্রুষা ও পথ্য তৈরি করা ইত্যাদি কাজও শিবমোহিনী মেয়েদের শিখিয়েছেন। সেলাইয়ের কাজও প্রচুর করতেন। ঘোড়ায় টানা পালকি ভাড়া করে লেখিকার মাকে ব্রাহ্ম সমাজে শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তৃতা শোনাতে নিয়ে যেতেন। ব্রাহ্ম সমাজের অনেক ব্যক্তিই শিবমোহিনীকে মা বলে ডাকতেন। পাড়াজুড়ে লোকেরা মা বলতো, তাই তাঁর অনেক নাতিও তাঁকে মা সম্বোধন করতো। পরনিন্দা-পরচর্চা তিনি নিজেও করতেন না, অন্যকেও করতে দিতেন না। তিনি বলতেন, "গুজবে বিশ্বাস করবে না, একজন মানুষের মুখে নিন্দে শুনলে, উড়িয়ে দেবে। সব নিজের চোখে দেখা সম্ভব না হলে, যাঁদের কথার ওজন আছে তাঁরা বললে তবেই মানবে। কারো চরিত্র নিয়ে মাথা ঘামিও না, সে কী করেছে সেইটে দেখার চেষ্টা কর। কারও গুপ্ত কথা জাহির করতে নেই।" তাঁর আয়োজিত 'দাস-দাসী ভোজনের' দিনে বাড়ির কাজের লোকদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে বাড়ির ছেলেমেয়েদেরও খেতে হতো, কোনো ভেদাভেদ চলতো না।

প্রশান্ত মহলানবিশের সঙ্গে নির্মল কুমারীর বিবাহে শিবমোহিনী দেবীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৯৩৮ সালে পৌত্র বিমলচন্দ্র সিংহের লক্ষ্ণৌ-এর বাড়িতে ৮৬ বছর বয়সে শিবমোহিনীর দেহান্ত ঘটে।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সর্ব কুসংস্কার মুক্ত ঔদার্যের শিক্ষা একটি পুনর্বিবাহিত বাল বিধবা নারীর ব্যর্থ জীবনকে কি পরিমাণ সার্থক, সুফলপ্রসূ ও সমাজ কল্যাণকর করে গড়ে তুলেছিলেন, তার প্রমাণ হিসাবেই

শিবমোহিনী দেবীর জীবন কাহিনী এখানে বর্ণনা করা হলো। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহায়তা ও শিক্ষা না পেলে হয়তো শিবমোহিনী হারিয়ে যেতেন কোনো অন্ধকারের অতলে, কিংবা পিতৃগৃহে দাসীবৃত্তি করেই জীবন অতিবাহিত করতে হতো তাঁকে, তাঁর ব্যক্তিসত্তার সাধারণ ও অসাধারণ মানবিক গুণগুলি পূর্ণ রূপে বিকশিত হয়ে ওঠার মতো উপযুক্ত পরিবেশ ও সহায়তা না পেয়ে অকালেই শুকিয়ে যেতো : বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সার্থক সফলতা তো এখানেই নিহিত রয়েছে। — এই হলেন বিদ্যাসাগর। তাঁর মৃত্যুতে সেদিন সারা দেশ জুড়ে যে শোকোচ্ছ্বাস উঠেছিল তার বর্ণনা পাওয়া যায় সে সময়কার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরের সংবাদগুলিতে।

১২৯৮-শ্রাবণ-৩১৯ সংখ্যায় 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুতে যে শোক বিহ্বল কবিতা লেখা হয়েছে, সেগুলি পাঠ করলে সেদিনের বিদ্যাসাগর হারা বাংলাদেশের হৃদয় বেদনা অনুভব করা যায়, সেই কবিতাগুলি থেকে দুটি কবিতার কিছু অংশ তুলে দেওয়া হলো ঃ—

১। "স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
যুগ যুগান্তর তপস্যার ফলে
পেয়েছিলে সেই অমূল্য রতন,
সে ধনে বঞ্চিত হইলে জননী,
কে আছে দুখিনী তোমার মতন ?

বীর-মাতা বলি দেও পরিচয়,
ধন্য হও গর্ব্বে ধরি হেনবীর"

২। "শোকাতুরা মা"
"...তুই আঁচলের হীরা
মাথা খোঁড়া বুকচিরা
কাঙালিনী মা'রে ফেলি কার কাছে গেলি...
...খেটে খেটে রাত দিন
শরীর হয়েছে ক্ষীণ,
তাই কি রয়েছে শুয়ে অলস হইয়া।
অভাগী মায়ের লাগি
সারা রাতি জাগি জাগি,
আজ কি এমন তর পড়েছ ঘুমিয়া ?...

নাই সুযশের লোভ,
নাই বিলাসের ক্ষোভ,
তোমার কাহিনী তুমি কিছুই জান না,

শুধু ভাই ভগিনীর মঙ্গল কামনা।

...   .

দুরন্ত বালকগুলো চোখে দিয়ে আছে ধুলো,
তুই যে কি ধন মোর কি বুঝিবে তারা?
কেউ দেয় গালাগালি, কেউ দেয় করতালি
কোন আহম্মক হায় হেসে হয় সারা।

...   .

কভু তো শোন না তুমি পাগলের পাগলামি

...   .

মেয়েগুলো অবিরত, আজিও কাঁদিছে কত?
আজো সেই অত্যাচার, সেই পায়ে ঠেলা,
আজও 'সতীনের ঘর', 'কচি মেয়ে বুড় বর
এই কি তোমার যাদু ঘুমাবাব বেলা?

...   .

তোমারে হইয়ে হাবা, কাঁদে রবি শশী তারা,
কাঁদিছে জগৎ সারা, আমি একা নয়!

...   .

ঈশ্বরে 'ঈশ্বর' দিয়া দিবি নাকি মিশাইয়া,
মরণেরে একবার অমর করাবি!..."

১২৯৮, ভাদ্র ৩২০ সংখ্যায় 'বামাবোধিনী'র সাময়িকী প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে—"বঙ্গের মহাশোক—পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় গত শ্রাবণের জলস্রোতে কাল সমুদ্র গর্ভে নিমগ্ন হইয়াছেন...শোকে দেশময় হাহাকার পড়িয়াছে, সংবাদপত্রে বিলাপ প্রকাশ এবং নানা স্থানে সভাসমিতি হইতেছে...বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্য এমন স্থান নাই, যেখানে তাঁহার স্মরণ সভা হইয়া স্মরণ চিহ্ন স্থাপনের উদ্যোগ না হইতেছে। কবে আমরা এমন অসাধারণগুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে আবার পাইব?"

ঐ সংখ্যাতেই আছে, "...তাঁহার কলিকাতাস্থ লাইব্রেরি ভবনে গত ১৩ই শ্রাবণ মঙ্গলবার রাত্র প্রায় আড়াইটার সময় কলেবর পরিত্যাগ করেন। তাঁহার বয়স ৭১ বৎসর হইয়াছিল, এক পুত্র ও ৪ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

আমাদিগের কোন সহৃদয়া লেখিকা ১৪ই শ্রাবণ বুধবার প্রাতে গঙ্গাস্নানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পবিত্র দেহের দাহকার্য স্বচক্ষে দর্শন করিয়া শোক সন্তপ্ত হৃদয়ের যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল :

"আজি বেলা ৭টার সময় নিমতলার ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া যে হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখিলাম তাহা ভাষায় বলিতে পারি না। দেখিলাম, মানব জগতের এক প্রদীপ্ত সূর্য খসিয়া পড়িয়াছে, ভারতবাসীর প্রধান অহঙ্কার শেষ হইয়াছে, বঙ্গভূমির উচ্চগৌরব ফুরাইয়াছে। দেখিলাম সেই অগতির গতি, অসহায়ের সহায়, অনাথের বন্ধু

আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় এ জনমের মতো আমাদিগকে ফাঁকি দিয়াছেন।··· বাঙালীর জাতি-গৌরব ফুরাইল···বিদ্যাসাগর কাহারও নিজের সম্পত্তি নহে, জল বায়ু চন্দ্র সূর্যের মতো আমাদের বিদ্যাসাগরও সকলের জিনিস। যে মূর্খ, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহারই, যে দরিদ্র, বিদ্যাসাগর তাহারই, যে রমণী সপত্নী যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, বিদ্যাসাগর তাহারই, যে বালিকা বৈধব্য আগুনে পুড়িতেছে, বিদ্যাসাগর তাহারই,···যাহার হৃদয়ে একটুকু ব্যথা আছে, একটুকু অভাব আছে, বিদ্যাসাগর তাহারই, এই হিসাবে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়কে 'আমার' 'আমার' বলিতে পারি। ···তাই সকলেই আমরা আজি পিতৃহীন-বন্ধুহীন হইয়াছি। ···ওই জাহ্নবী বক্ষে ধূ ধূ চিতার আগুনে বাঙালীর, পিরামিড, ভস্মসাৎ হইতেছে, বাঙালীর সর্বনাশ হইতেছে, ওই আগুনে বাঙলার সম্মান, গৌরব, বাঙালীর প্রধান অহঙ্কার, প্রধান গর্ব্ব পুড়িয়া যাইতেছে। যে দেহ পরের জন্য, জগতের জন্য, ধর্মের জন্য, ন্যায়ের জন্য অবিশ্রান্ত—অবিচলিত উৎসাহে এই প্রাচীন বয়সে যুবকের খাটুনি খাটিয়াছে, আজি সেই দেহ—আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক পুণ্যময় দেহ—চিতায় ভস্ম হইতেছে।···আমরা সকলেই বিদ্যাসাগরের নিকটে সহস্র ঋণী, যে বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগখানি পড়িতেছে, সেও বিদ্যাসাগরের নিকটে বিক্রিত—তাঁহারই হাতে গড়া পুতুল।··· আমাদের বিদ্যাসাগর অনেক রকম জানেন, স্বাবলম্বনের বলে গরিবের ছেলে কেমন করে রাজাধিরাজ হইতে পারে তাহা জানেন, পরকে কেমন করিয়া আপনজন করিতে হয় তাহা জানেন, পরের ভিতরে নিজের অস্তিত্ব কেমন করিয়া মিশাইতে হয় তাহা জানেন···কেবল মরিতে জানেন না, বিদ্যাসাগর মৃত্যুঞ্জয়।···যিনি মৃত্যুর শেষ মুহূর্তেও আমাদের মঙ্গলচিন্তা করিয়াছেন, যিনি অসহনীয় অকৃতজ্ঞতা, পৈশাচিক কৃতঘ্নতা অনায়াসে পদদলিত করিয়াছেন, আমাদের সেই বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন না, আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় মৃত্যুঞ্জয় হইয়া আমাদের নিকটে বিরাজ করিতেছেন"···

শ্রী মা।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর অব্যাহিত পরেই বেথুন কলেজে তিন শতাধিক বাঙালি মহিলা তাঁর উদ্দেশ্যে স্মরণসভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন (বামাবোধিনী—ভাদ্র-১২৯৮,৩২০ সংখ্যা)। বঙ্গমহিলা অনুষ্ঠিত বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা কমিটি চাঁদা বাবদ ১৬৭০ টাকা সংগ্রহ করেন, সেই টাকায় বিদ্যাসাগরের নামে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীনির জন্য দু'বছরের একটি বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বাংলাদেশের মহিলা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মহিলার দানে ঐ সংগ্রহ ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।" (দ্রষ্টব্য : বামাবোধিনী শ্রাবণ ১২৯৯, ৩৩১ সংখ্যা)।

"শুধু বাঙালী নারী জাতিই নয়, বহু বিদেশী পুরুষও বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন।" "১৮৯১, ২৭ আগস্ট, কলকাতার টাউন হলে এক বিরাট অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশের তৎকালীন ছোটলাট স্যার চার্লস এলিয়ট। সেই সভার ফলে সেই বিরাট ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ সংস্কৃত

কলেজের প্রথম অধ্যক্ষের এক প্রস্তর মূর্তি কলেজ ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয়।" (দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১০৪)।

আজ থেকে প্রায় শত বছর পূর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুতে সদ্য কাতর দেশবাসীর যে মর্মবেদনা প্রকাশ পেয়েছে উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের রচনা ও স্মরণ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে, সেগুলির মধ্যে প্রিয়তম স্বজন হারানোর বেদনাই যেন প্রতিফলিত হয়েছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেদিনের অবহেলিত বঙ্গবাসীর কত নিকটজন ছিলেন, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না পরবর্তী যুগের মানুষের। প্রিয়জন বিয়োগ ব্যথায় কাতর বঙ্গবাসী আর্তবিলাপের আর মর্মচ্ছেদী হাহাকারের মধ্যে দিয়ে তাঁর যে অমরত্ব ঘোষণা করেছিল--সেই ঘোষণা—সেই ভবিষ্যৎবাণী যে পরবর্তীকালে সত্য প্রমাণিত হয়েছে—বর্তমান আধুনিক প্রজন্মের চিন্তায় ও মননে বিদ্যাসাগরের জীবন্ত উপস্থিতিই তার প্রোজ্জ্বল প্রমাণ।

বাঙালীর স্মৃতিতে বিদ্যাসাগর

বাঙালীর স্মৃতিতে বিদ্যাসাগর আজও বেঁচে আছেন তাঁর "অক্ষয় মনুষ্যত্ব আর অজেয় পৌরুষ" নিয়ে। ১৯শ শতকের বাংলাদেশের আরও বহু মনীষীই তাঁদের প্রতিভায় দেশকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মতো আপামর বাঙালীর মনে এত জীবন্তভাবে আর কেউই বেঁচে নেই বললে অত্যুক্তি করা হয় না। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাঠাগার, ছাত্র আবাসন এবং নাগরিক আবাসনকে তাঁর নামে অলঙ্কৃত করে তাঁকে স্মরণীয় করে রাখা হয়েছে শুধু নয়, বাঙালীর নিত্যকার জীবনে জীবন নিয়ে তাঁর অমরত্বকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্বীকার করে নিয়েছে বাংলাদেশ। মানকুমারী বসুর ভাষায় "সত্যই বিদ্যাসাগর অন্যসব কিছুই জানেন, শুধু মরিতে জানেন না।"

বাঙালী জাতির স্মৃতিপটে তাঁকে অক্ষুন্ন করে রাখার জন্য তাঁর নামাঙ্কিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাঠাগার প্রভৃতি সমধর্মী প্রতিষ্ঠানের তালিকা দেওয়া গেল :

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :

বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয় (মহিলা ও পুরুষ) — কলকাতা
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় — মেদিনীপুর
বিদ্যাসাগর সারস্বত সমাজ — মেদিনীপুর
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ — নবদ্বীপ
শ্যামবাজার বিদ্যাসাগর বিদ্যালয় — কলকাতা
গোরাবাজার ঈশ্বরচন্দ্র ইনস্টিটিউশন
লস্করপুর বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ
মেমারী বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউশন
বিদ্যাসাগর উচ্চ বিদ্যালয
হেরোভাঙ্গা বিদ্যাসাগর বিদ্যামন্দির — ২৪ পরগনা
বাইপাটনা বিদ্যাসাগর হাইস্কুল — মেদিনীপুর
বজবজিয়া ঈশ্বরচন্দ্র শিক্ষানিকেতন — মেদিনীপুর
কেশরম্ভা বিদ্যাসাগর বিদ্যানিকেতন — মেদিনীপুর
বীরসিংহ বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যাপীঠ (বালক বিভাগ) — মেদিনীপুর
শিলিগুড়ি বিদ্যাসাগর বিদ্যালয় — শিলিগুড়ি, দার্জিলিং
মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ (বালিকা বিভাগ)
পশ্চিম করাস্ফি বিদ্যাসাগর উচ্চ বিদ্যালয়

তপসিয়া বিদ্যাসাগর শিক্ষায়তন
রসিকগঞ্জ বিদ্যাসাগর উচ্চ বিদ্যালয়
মুড়িসাহি বিদ্যাসাগর উচ্চ বিদ্যালয়
মাত্তুয়া ঈশ্বরচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়
খুকুরদহ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যালয়
কাইজুরি বিদ্যাসাগর উচ্চ বিদ্যালয়
ঘাটাল বিদ্যাসাগর উচ্চ বিদ্যালয়
চিস্কিগড় ঈশ্বরচন্দ্র ইনস্টিটিউশন
গোঘাট ভগবতী বালিকা বিদ্যালয়
বঁইচি বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ
সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ
ঈশ্বরচন্দ্র পাঠভবন — এন্টালী, কলকাতা
ঝাড়গ্রাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পলিটেকনিক — ঝাড়গ্রাম
বিদ্যাসাগর গ্রামীণ পাঠাগার — ২৪ পরগনা
বিদ্যাসাগর সাধারণ পাঠাগার — ২৪ পরগনা
বিদ্যাসাগর পাঠাগার — ২৪ পরগনা
বানশংকা বিদ্যাসাগর গ্রামীণ গ্রন্থাগার — বীরভূম
বিদ্যাসাগর স্মৃতি পাঠাগার — বীরভূম
বিদ্যাসাগর কলেজ লাইব্রেরী — বীরভূম
বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগার -- বর্ধমান
বিদ্যাসাগর পাঠাগার — বর্ধমান
আমলাসুলি বিদ্যাসাগর পাঠাগার — মেদিনীপুর
ভান্দরিয়া বিদ্যাসাগর পাঠাগার — মেদিনীপুর
চন্দনপুর বিদ্যাসাগর সেবা সমিতি পাঠাগার — মেদিনীপুর
বিদ্যাসাগর পল্লী পাঠাগার — মেদিনীপুর (ভীমেশ্বরী)
বিদ্যাসাগর পাঠাগার — মেদিনীপুর (দনাক)
বোধোদয় পাঠাগার — মেদিনীপুর
বিদ্যাসাগর স্মৃতি পাঠাগার — মেদিনীপুর
বিদ্যাসাগর পল্লী পাঠাগার — মেদিনীপুর (মাধবপুর)
বিদ্যাসাগর পাঠাগার — মেদিনীপুর (ময়না)
বিদ্যাসাগর পাঠাগার — মেদিনীপুর (বাকুরদহ)
বিদ্যাসাগর পাঠাগার — মেদিনীপুর (কুমারচক)
বিদ্যাসাগর পাঠাগার — মেদিনীপুর (পালসিতা)
বিদ্যাসাগর পাঠাগার — মেদিনীপুর (মোহনপুর)
বিদ্যাসাগর স্মৃতি পাঠাগার — মেদিনীপুর (ফর কুসমা)

বিদ্যাসাগর স্পোর্টিং ক্লাব সাধারণ পাঠাগার — মেদিনীপুর
বিদ্যাসাগর কলেজ লাইব্রেরি — নবদ্বীপ
বিদ্যাসাগর কলেজ লাইব্রেরি — কলকাতা
মেদিনীপুর রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক কক্ষটির নামকরণ হয়েছে 'বিদ্যাসাগর কক্ষ'।
বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয় — মেদিনীপুর

তালিকাটি ক্রমবর্ধমান। হয়তো কখনোই এর সমাপ্তি টানা যাবে না, কারণ গত ১৯৮৭ সালেই ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে শিয়াখালা মডেল বেণীমাধব উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়টির একানব্বুইতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই বিদ্যালয়টির ত্রিতলের অলিন্দটিতে 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি ফলক' উৎকীর্ণ করা হয়েছে—বিদ্যালয়টির সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অমর স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য। সুতরাং সহজেই বলা যায়—বহমান কাল গঙ্গার সঙ্গে সমান্তরালভাবেই বয়ে চলেছে বিদ্যাসাগরের জীবনধারা এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে—যুগ থেকে যুগান্তরে।

সহায়ক সরকারী রিপোর্ট পুস্তক-পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকার তালিকা :

ক) মৌলিক তথ্যের উৎস :

১। General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of Bengal Presidency for 1842-1843 (National Archive)

২। Report of Pandit Ishwar Chunder Surma, Special Inspector of Schools, South Bengal for 1857-1858 (Report on Public Instruction in Bengal 1857-1858)
উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাঠাগারের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৩। Proceedings of the Lieulenant Governor of Bengal, Edn. Dept. June, 1862, Nos. 141,142 & July 1862, Nos. 3 & 4; 5 & 6, 7 & 8, 15 & 16, 17 & 18, 36 & 37. (National Archive).

৪। Report on Public Instruction in Bengal for 1862 (National Archive)

৫। Gen. Report on Public Instruction-Bengal 1849-1850 (National Archive)

৬। A Biographical Sketch of the Rev. K. M. Banergea-Ramchandra Ghosh (National Library).

৭। Rajah Radhaknto Deb Bahadur K.C.S.I: Brief account of his life and character-Edited by his son Rajah Rajendra Narayan Deb Bahadur (National Library).

৮। Challenge of Education-a policy perspective-Ministry of Education, Govt. of India-1985.

৯। Iswar Chandra Vidya Sagar-A story of his life and work-Subal Chandra Mitra-Ashis Publishing House, H-12 Rajouri Garden, New Delhi-

110127. 1st Edition 1902, Reprint 1975, Printed in India.

১০। Unpublished letters of Vidyasagar-Edited by Arabında Guha, Sole Distributor-Ananda Publishers Private Limited, Cal-9.

১১। Report of the Secondary Education Commısıon (October, 1952-June,1953) Ministry of Education, New Delhı-1965,

১২। Kothari Commision Report (1964-66)-Mınistry of Education, New Delhi.

১৩। Status of Women ın A synopsis of the Repoıt of the National Commıttee on the status of women (1971-74) ICSSR. The Indıan Councıl of Social Scıence Research, 11 P A Hostel Buildıng, Indraprastha Estate, Rıng Road, New Delhı-1, Allied Publıshers Prıvate Lımıted.

১৪। Our Women-Swami Vivekananda-Advaıta Ashram, 5 Dehi Entally Road, Calcutta-14.

১৫। শিয়াখালা উত্তরবাহিনী পাঠাগারেব গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ।

১৬। 'যুগান্তর পত্রিকা'-১৯৩৯, ১লা মার্চ সংখ্যা।

১৭। সংবাদ প্রভাকর-১৯ চৈত্র ১২৬৪ (৩১ মার্চ ১৮৫৮)—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত।

১৮। বামাবোধিনী পত্রিকা-ভাদ্র-আশ্বিন ১৩০৬, ৪১৬-১৭ সংখ্যা, ১২৭৬ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৌজন্যে।

১৯। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-১৮৮০ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৌজন্যে)।

২০। সোমপ্রকাশ পত্রিকা-১২৭৩ পৌষ, ১২৭৫, ৫ ফাল্গুন ১৪ সংখ্যা, ১২৮৭, ২০ পৌষ, ১২৭২, ১৭ জ্যৈষ্ঠ-২৭ সংখ্যা (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৌজন্যে)।

২১। সংবাদ পত্রে সেকালের কথা-ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত। (১ম ও ২য় খণ্ড) প্রকাশক-শ্রী রামকমল সিংহ, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ৩য় সংস্করণ-শ্রাবণ ১৩৫৬।

২২। Selections from Jnanannesan-complıed by Suresh Chandra Moitra, Prajana. Calcutta-9.

খ। মৌলিক গবেষণামূলক রচনাবলী :

১। অশান্তকাল জিজ্ঞাসু যুবক—সুরেশচন্দ্র মৈত্র, পুঁথিপত্র (প্রাঃ) লিমিটেড, এন্টনী বাগান লেন, কলকাতা-৯
প্রকাশক : এ সাহা, প্রথম সংস্করণ, মার্চ ১৯৮৮।

২। শিবনাথ শাস্ত্রী—স্বাক্ষরতা প্রকাশন, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, প্রকাশক : শ্রীকেশব আড্ড, প্রথম প্রকাশ, ২৫শে আষাঢ়।

৩। আমার জীবন ও সমকাল (১ম পর্ব)—বিপিনচন্দ্র পাল. ভাষান্তর : শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা-১৩। প্রকাশ কাল : সেপ্টেম্বর ১৯৮৫।

৪। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বিনয় ঘোষ (প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রক, ভারত সরকার), এপ্রিল ১৯৭৫।
৫। উত্তর চব্বিশ পরগনার ইতিবৃত্ত—কমল চৌধুরী, মডেল পাবলিশিং হাউস, ২এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : শুভ রথযাত্রা, ২৮ জুন ১৯৮৭, প্রকাশক : জয়দেব ঘোষ।
৬। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ—শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত, এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত ২য় সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৮৩।
৭। কলকাতা দর্পণ—রাধারমণ মিত্র, সুবর্ণরেখা, কলকাতা-৯, ৩য় সংস্করণ, জুন ১৯৮৮, প্রকাশক : ইন্দ্রনাথ মজুমদার।
৮। কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত—বিনয় ঘোষ, বাক্ সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯, প্রকাশক : স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৮২।
৯। কলিকাতার ইতিবৃত্ত—প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, পুস্তক বিপনী, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, ২৪ আগস্ট ১৯৮১।
১০। জীবনী সন্দর্ভ—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় (সমাজরক্ষক রাধাকান্ত দেব) জাতীয় গ্রন্থাগারের সৌজন্যে।
১১। প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য—সুকুমারী ভট্টাচার্য, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯, সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৯৪।
১২। প্যারীচরণ সরকারের জীবনবৃত্ত—নবকৃষ্ণ ঘোষ, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ)।
১৩। বিদ্যাসাগর চরিত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা হতে প্রকাশিত।
পুনর্মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৩৭১, প্রকাশক : শ্রীজগদীশ চন্দ্র ভৌমিক।
১৪। বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)— গোপাল হালদার সম্পাদিত (পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, সাক্ষরতা প্রকাশন), কলকাতা-১২। দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭২ প্রকাশক : শ্রী মুক্তিপদ রায়।
১৫। বিদ্যাসাগর—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দধারা প্রকাশন, কলকাতা-১২ প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৭৬, প্রকাশক : মনোরঞ্জন মজুমদার।
১৬। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ—বিনয় ঘোষ, ওরিয়েন্ট লং ম্যান লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত (চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭২)
প্রথম ওরিয়েন্টাল লং ম্যান সংস্করণ (৩য় খণ্ড একত্রে), ১৯৭৩, ১৯৮৪।
১৭। বঙ্গদেশে ইংরাজী শিক্ষা : বাঙালীর শিক্ষাচিন্তা—সুখময় সেনগুপ্ত, প্রকাশক : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা-১৩ প্রকাশকাল : মার্চ ১৯৮৫।

১৮। বিদ্যাসাগরের নির্বাচিত পত্রাবলী—সন্তোষকুমার অধিকারী সম্পাদিত ও বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেন্টার কর্তৃক প্রকশিত, প্রথম সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৯২।
১৯। বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (কলকাতা ১৩৩৮) (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত)।
২০। বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ (প্রবন্ধ খণ্ড)—সাক্ষরতা প্রকাশন, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ : ২৭ চৈত্র ১৩৭৯
প্রকাশক : শ্রীপ্রণব ঘোষ।
২১। ভারতের জাতীয় আন্দোলন—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থম, বিধান সরণী, কলকাতা-৬, ৩য় সংস্করণ (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত)
১ জানুয়ারি ১৯৬৫।
২২। ভারতের নারী মুক্তি আন্দোলন—ড. হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেন্টার, কলকাতা-২৯
প্রথম প্রকাশ : গ্রন্থমেলা, ২২ ডিসেম্বর ১৯৮৭
২৩। মার্কসীয় দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর—ড. হরিসাধন গোস্বামী, ভারতী বুক স্টল, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৮৮
প্রকাশক : শ্রীঅশোককুমার বারিক।
২৪। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী, সাক্ষরতা প্রকাশন, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, প্রকাশক : কেশব আড়ু, প্রথম প্রকাশ : ২৩ আষাঢ় ১৩৮৩।
২৫। রাজা রামমোহন রচনাবলী—ড. অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-১২
প্রথম প্রকাশ : শুভ নববর্ষ ১৩৮০।
২৬। শিক্ষা সংস্কারে বিদ্যাসাগর ও বর্ণপরিচয়—শ্রীবিনয় ভূষণ রায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা-৬, প্রকাশক : শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য,
প্রথম প্রকাশ : ১৫ আগস্ট ১৯৮১।
২৭। সতী—স্বপন বসু, (সতী প্রথার উদ্ভব, বিকাশ ও বিলোপের ইতিহাস), পুস্তক বিপনী, বেনেটোলা লেন, কলকাতা-৯
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৭৮।
২৮। সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র—বিনয় ঘোষ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সোমপ্রকাশ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার রচনা সংকলন)।
২৯। সেকাল আর একাল—রাজনারায়ণ বসু, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৌজন্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৬
প্রকাশক : শ্রীমদন মোহন কুমার, ৩য় মুদ্রণ : বৈশাখ ১৩৮৩।
৩০। সাহিত্য সাধক চরিত মালা—যোগেশচন্দ্র বাগল (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ)।

৩১। হুগলী জেলার ইতিহাস—সুধীরকুমার মিত্র বিদ্যাবিনোদ
(উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাঠাগারের সৌজন্যে)।
৩২। Barasat Jelay Susamachar Prachar upadesak Patrika (1856)
৩৩। Women's Education in Eastern India-Jogesh Chandra Bagal, with fore word by Dr. Jadunath Sarkar, The
World Press Private Limited, Kolkata-12, Aug. 1956.
৩৪। Renaissance in Bengal : Quests and Confrontations, 1800-1860, Arabinda Podder, (Indian Institute of Advance
Study, Simla, 1979 (First Published, February 1970)
৩৫। Brahmo Reform Movment (some Social & Economic Aspect) Kanailal Chottapadhyay (1858-1883),
Papyrus, 2 Ganendra Mittra Lane, Calcutta-4
First Published : 14 November 1983.
৩৬। A Few Thoughts on Education-Sri Gooroo Das Banerjee, K.T.M.A.D.L. Ph.D.
1st Edition-1904, Thackers Pink and Co., Cotton Press
Printed by Jotish Chandra Ghosh
57 Harrison Road, Calcutta.
২। মৌলিক গবেষণার ভিত্তিতে আলোচনামূলক প্রবন্ধাদি :
১। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-১২
প্রথম সংস্করণ : ১৯৫২।
২। আনন্দবাজার পত্রিকা সুবর্ণ জয়ন্তী বার্ষিক সংখ্যা ১৩৭৮
(ক) বঙ্গ গৌরব স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশরৎকুমার রায়—প্রকাশক : শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ রায় বি এ, ১৬ নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯২১, মেটকাফ প্রিটিং ওয়ার্কস, ৩৪ নং মেছুয়া বাজার স্ট্রিট, কলকাতা।
৩। আধুনিক ভারতে শিক্ষা বিবর্তন—অধ্যাপক জ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
শিক্ষা প্রকাশনী, কলকাতা-৪৭ হতে প্রকাশিত। ২য় সংস্করণ, ১৯৮১।
৪। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—এস কে বোস, ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া
নয়াদিল্লি হতে প্রকাশিত, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৮১।
৫। কলকাতায় বিদ্যাসাগর—রাধারমণ মিত্র (বিচিত্র বিদ্যাগ্রন্থমালা)
জিজ্ঞাসা, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ : ১২ অক্টোবর ১৯৭৭
প্রকাশক : শ্রীশ কুমার কুন্ডু।
৬। গোবরডাঙ্গা পত্রিকা—১০ম বর্ষ, ৪র্থ-৫ম সংখ্যা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭।
৭। ছাপা হরফের হাট—শ্যামল চক্রবর্তী, সাহিত্য সদন, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৭৭
প্রকাশক : সুবোধ বিকাশ দত্ত।

৮। ছেলেবেলার দিনগুলি—পুণ্যলতা চক্রবর্তী, নিউজস্ক্রিপ্ট, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯, প্রকাশক : অশোকানন্দ দাশ, ১৫ আশ্বিন ১৩৬৫।
৯। ছেলেবেলা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা হতে প্রকাশিত পুনর্মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৩৯১।
১০। ঠাকুরবাড়ির অন্দর মহল—চিত্রা দেব, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা-৯, তৃতীয় মুদ্রণ, ২৪ অগ্রহায়ণ ১৩৮৭।
১১। ডিহি কলকাতা ছাড়িয়ে—বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, বর্ণালী, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯, প্রথম মুদ্রণ : মার্চ ১৯৭৬।
১২। নবজাগৃতীর অগ্রদূত বিদ্রোহী বিদ্যাসাগর—ভূপেন পালিত, কারেন্ট বুক এজেন্সী, কলকাতা-২৯, প্রথম প্রকাশক : ১৯৭০।
১৩। 'নির্যাতিতা'—গ্রামের মেয়েদের উপর নৃশংসতার একটি সমীক্ষা—'পীরা' প্রকাশিত।
১৪। নিবাধুই বালিকা বিদ্যালয় শতোত্তর পঞ্চবিংশতি স্মারক গ্রন্থ (১৮৪৮-১৯৭৩) সম্পাদক অজিত বন্দোপাধ্যায় (বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি)
১৫। প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর—যোগনাথ মুখোপাধ্যায়, আলোক চক্র, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯, প্রকাশক : গোপীনাথ মুখোপাধ্যায়।
১৬। বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেন্টার আয়োজিত "বিদ্যাসাগর আলোচনা চক্রে" প্রদত্ত বক্তৃতামালা—বক্তা : ড. হরপ্রসাদ মিত্র, ড. মিলন দত্ত, ড. প্রসিত বায়চৌধুরী, ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৭। ১৯৮৭ সালে কলিকাতা পুস্তক মেলা প্রাঙ্গণে বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেন্টার আয়োজিত 'বিদ্যাসাগর বক্তৃতা মালা'য় প্রদত্ত ভাষণ বক্তা ড· প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, ডাঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপধ্যায়।
১৯। বাবু গৌরবের কলকাতা — বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, বর্ণালী, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, মার্চ, ১৯৭৬
২০। বিদ্যাসাগর স্মরণিকা — ড· হরিপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত, উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, তত্ত্বধায়ক 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশন, কলেজ রো, কলিকাতা-৯, প্রকাশকাল : বৈশাখ ১৩৮১।
২১। বিদ্যাসাগব — সার্ধশত বর্ষপূর্তি স্মারক গ্রন্থ — গোলাম মুরশিদ সম্পাদিত-বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রাঃ লিমিটেড, কলিকাতা-৯ হ'তে প্রকাশিত। প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৭০ প্রথম ভারতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর : ১৯৭১।
২২। বিদ্যাসাগর পত্রিকা — সন্তোষকুমার অধিকারী সম্পাদিত, বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেন্টার, কলিকাতা-২৯ হতে প্রকাশিত।
২৩। 'বারোমাস' পত্রিকা — শারদীয়-১৯৮৮, ১ম বর্ষ প্রথম সংখ্যা।
২৩ ক। বিদ্যাসাগর — বিহারীলাল সরকার (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ)
২৪। ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা — অধ্যাপক জোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়-শিক্ষা প্রকাশনী-কলিকাতা-৪৭, প্রকাশকাল-৮ই মে, ১৯৮১।

২৫। রাধাকান্ত দেব — সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান-সাহিত্য সংসদ (এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে প্রাপ্ত)।
২৬। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগর — ড· সুবোধ চৌধুরী, ভারতী বুক স্টল, প্রকাশক : শ্রীহৃষীকেশ বারিক, ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ : অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৮৯।
২৭। শনিবারের চিঠি — শ্রী সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, পৌষ-১৩৪৬, ডিসেম্বর ১৯৩৯।
২৮। শিয়াখালা বেণীমাধব মডেল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পত্রিকা (৯১ বছর পূর্তি উৎসব) ১৯৮৭ সম্পাদক কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।
২৯। সাহিত্য পত্রিকা — মুহম্মদ আব্দুল হাই সম্পাদিত — বাংলাবিভাগ-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১০ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শীত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৩৭৩)।
৩০। সেনেট হলের স্মৃতি চিত্র — পূর্ণেন্দু পত্রী, অরুণা প্রকাশনী কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ : নববর্ষ ১৩৯৪।
৩১। 'সমকালীন প্রতিবিধান' (দ্বিমাসিক মহিলা পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল, ১৯৮৮)।
৩২। Bethune College Centenary Volume (1879-1979) Published in March 1980 by Dr. DIPTI TRIPATHI, Principal, Bethune College, Calcutta, Printed by Radharaman Nath, Nath Brothers, Calcutta-6.
৩৩। Bethun School & College Centenary Volume (1849-1949) Editor-Kalidas Nag, Asst. editor Lotika Ghosh, Printed by S. N. Guha Roy, at Sree Sarswaty Press Ltd., Calcutta-9.
৩৪। History of Education in India Nurullah and Naik-Published by Macmillan and Co. Limited, Calcutta-London-1964.
৩৫। Hundred years of the University of Calcutta (1897-1956)-A history of the University Issued in Commemoration of the centenary celebrations, (Published Dr. D. Chakraborty, Registarar, U. C.), First Published, June, 1958.
৩৬। The Good old days of Honorable John Company (from 1699-1858) W.H. Carey, Published by Quine Book Company Cal-5 First Published : 1882 New Quins Abridged Edition : 1964.
৩৭। Vidya Sagar, the traditional moderniser-Amalesh Tripathi, Orient Longman, Calcutta. First Edition : 1974.
৩। তৃতীয় পর্যায়ের পুস্তক-পুস্তিকা :
১। আধুনিক মানসিকতা ও বিদ্যাসাগর — সন্তোষকুমার অধিকারী-বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেন্টার, কলিকাতা-২৯ হ'তে প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৯০।
২। ঊনবিংশ শতাব্দীর নারী প্রগতি ও রামমোহন-বিদ্যাসাগর-কনক মুখোপাধ্যায় প্রকাশক-মঞ্জুরী গুপ্ত, "একসাথে"। প্রথম প্রকাশ · ফাল্গুন · ১৩৮৬।
৩। 'এক্ষণ' (সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা, ১৪শ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা শারদীয়া) ১৩৮৭।

৪। করুণাসাগর বিদ্যাসাগর — ইন্দ্র মিত্র আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, কলিকাতা-৯।

৫। কালে কালে কলকাতা — কাজল মিত্র, দীর প্রকাশন, বাগবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৩ প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৮৮।

৬। নারী আন্দোলনের কয়েকটি কথা — কনক মুখোপাধ্যায় প্রকাশক-মঞ্জুরী গুপ্ত "একসাথে"। (পশ্চিমবঙ্গ, গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি-কলিকাতা-১৬) ৩য় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩।

৭। প্রথম প্রতিশ্রুতি — আশাপূর্ণাদেবী-মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৩৭১ ৬ষ্ঠ বিংশতি সংস্করণ-১৩৯৩।

৮। বিদ্যাসাগর স্মৃতি — দিলদার সম্পাদিত-পরিবেশক-বসাক বুক স্টোর, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৭৮।

৯। বিদ্যাসাগর কলেজ শতবর্ষ স্মরনিকা — (১৮৭২-১৯৭২) বিদ্যাসাগর কলেজ শতবর্ষ-স্মারক গ্রন্থ সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা-১৯৭২।

১০। বিদ্যাসাগর শিক্ষানীতি ও বর্ণ পরিচয — বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেন্টার কলিকাতা-২৯ হ'তে প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৮৭, প্রকাশক : হীরক রায়, অনন্য প্রকাশন, কলিকাতা-৭৩।

১১। বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থ — আজহার উদ্দীন খান ও উৎপল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, (বিদ্যাসাগর সারস্বত সমাজ মেদিনীপুর কর্তৃক প্রকাশিত) প্রকাশকাল : আশ্বিন ১৩৮১।

১২। বিদ্যাসাগর পরিক্রমা — ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সন্তোষকুমার অধিকারী সম্পাদিত দঃ কলিকাতা বিদ্যাসাগর সার্ধশত জন্মবার্ষিকী কমিটির পক্ষে শ্রীসত্যব্রত চৌধুরী (সম্পাদক) কর্তৃক প্রকাশিত। বৈশাখ-১৩৭৯।

১৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস — শ্রীভূদেব চৌধুরী, বুকল্যান্ড প্রাঃ লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলি-৬, প্রথম প্রকাশ : শ্রীপঞ্চমী, ১৩৬৬ বাংলা সাল।

১৪। বিদ্যাসাগর — শঙ্খ ঘোষ, সাক্ষরতা প্রকাশন। পঃ বঃ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি প্রকাশিত। প্রথম বধোদয় গ্রন্থ মালা সংস্করণ : ৫ই কার্তিক, ১৩৮৫।

১৫। List of Recognised X-Class schools-West Bengal Board of Secondary Education, Calcutta-700016. Published by N. Sinha, Secy. on behalf of the Executite Committed, West Bengal Board of Secondary Education.